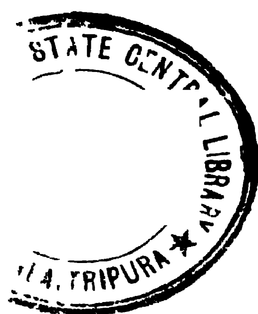
বিংশ শতকের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্পাদনা

প্রবীর ঘোষ





পাত্র'জ পাবলিকেশন

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ
রথযাত্রা, ১৩৬৫

প্রকাশক
শ্রীমানসকুমার পাত্র
পাত্র'জ পাবলিকেশন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর
সোমা প্রকাশন
২এ, কেদার দত্ত লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

ছবি এঁকেছেন প্রবীর ঘোষ
প্রচ্ছদ এঁকেছেন গৌতম রায়

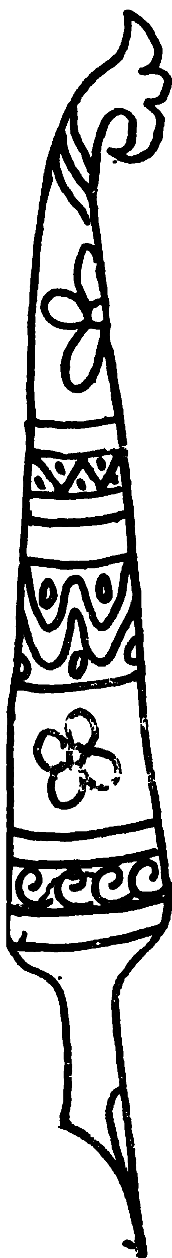
দাম —কুড়ি টাকা

উৎসর্গ

মা ও বাবা

অগ্রজপ্রাতম শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে

বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গে



"একটি শাখাতেই আমরা পৃথিবীর যে কোন উন্নত সাহিত্যের সমকক্ষ। যে কোন একটি প্রধান ভাষার গল্পকে নিয়ে এসে বাংলা গল্পের পাশে দাঁড় করালেই সেটা বোঝা যাবে। কবিতায় সমকক্ষ নই, উপন্যাসে নই। সেখানে হতে পারলে খুশি হবো, কিন্তু যে মুকুট বাংলা সাহিত্যের আছে সেটা ধুলোয় লুটোবে কেন?"

"সাহিত্যের পুরস্কারগুলোর কোন দাম নেই আজকাল—কি রবীন্দ্র পুরস্কার কি অ্যাকাডেমি পুরস্কার, কিভাবে এবং কেন দেওয়া হয় তা তো আমরা সকলেই জানি। কিন্তু সাধারণ পাঠকের উপর এই পুরস্কারের প্রভাব তো আছেই। ভেবে দেখুন, আজ অবধি সত্যিকারের ছোট-গল্পের বইকে একবারও পুরস্কার দেওয়া হয়নি। পরশুরাম? আমরা যে ধরনের ছোটগল্পের কথা বলছি তাঁর লেখা সেই গণ্ডীর বাইরে।"

রমাপদ চৌধুরী

মোহিনী আরো গুটিয়ে যায়। সামান্য একটা পোকার মতো ছোট হতে হতে ঘাসের ভেতর নিজেকে যেন লুকিয়ে ফেলতে চায় মোহিনী।

সোনার কলকজা শব্দ করে। কি ভীষণ শব্দ। যেন হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দেবে ওর। কী ভীষণ উদ্দামে নৃত্য করে চলেছে ঘড়িআলা। কি সর্বনেশে নাচ।

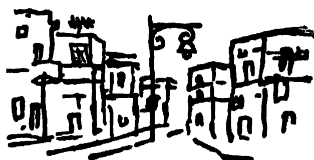
হঠাৎ এক সময় ককিয়ে উঠে মোহিনী। শীতল এক চাপ আঘাতে মুখ থুবড়ে পড়ে। অর্থহীন কতগুলো শব্দ নিয়ে মিছিমিছি কিছুক্ষণ উঠে দাঁড়াতে চায়। অথচ পারে না। হিম শীতল বাতাসের ঘায়ে সব সাধনা ওর জুড়িয়ে যায়।

সোনার ঘড়ি শব্দ করে, টিক্‌টিক্ টিক্‌টিক্ .....

ভোর হলে মাঠঘাট ভেঙে লোক ছুটে আসে চৌমাথায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে [illegible]। দেহটা যেন বরফ। হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা রয়েছে এক মুঠি ঘাস। শুকনো [illegible] উড়তে কয়েকটা গাছের পাতা বুকে [illegible] রয়েছে। [illegible] [illegible] গন্ধে বোধ হয় মিষ্টি একটা আমেজ' লাল পিঁপড়ে কানের পাশ দিয়ে বেয়ে বেয়ে ঠোঁটের কাছে এসে ভিড় জমিয়েছে।

'অথচ কেউই বুঝতে পারল না সেই [illegible]আলারই কাণ্ড এটা। সোনার [illegible] দিয়ে কি [illegible] খেলা চলেছে লোকটা"। কেউ শুনতে [illegible] সেই শব্দ, সেই বুক [illegible] [illegible]।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ



গাজনতলা

চৈত্র-সংক্রান্তির দিন অবেলায় বাবা ন্যাংটেশ্বরের মন্দিরতলায় গাজনের ধুম লেগেছে। মন্দিরের উঁচু বারান্দায় একটার পর একটা কাটা পাঁঠার ধড় আর মুণ্ডু এসে পড়ছে। মন্দিরের ঘুপচি কোটরে বসে দেবতা যা নেবার নিচ্ছেন, মানে স্রেফ ওই মুণ্ডুটা, এবং ধড়টা ছুড়ে ফেলে ঠাকুমশাইয়ের মুখ দিয়ে বলছেন—যা, নিয়ে যা। এরপর ঠাকুমশাই আর তাঁর বাড়ির লোক-গুলোর মুখ দিয়েই তিনি কচমচিয়ে মড়মড়িয়ে মুণ্ডুগুলো খাবেন। ঝোলেঝালে হাপুস হুপুস কাণ্ড। নাকে ও চোখে জল বেরিয়ে যাবে।

আগে পাঁঠা পড়ত বিশ তিরিশটে। আজকাল ছ-সাতটাও পড়ে তো বিরাট ধুম। ঠাকুমশাইয়ের কত্তাবাবার আমলে নাকি শয়ে-শয়ে পড়ত। রক্তে ভেসে যেত গাজনতলা। গাঁশুদ্ধু ছড়িয়ে ছিটিয়েও বাসি থেকে যেত। আজকাল ভক্তি কমেছে নয়, পাঁঠার দাম বড্ড চড়া। ওসমান পাইকার সপ্তায় একদঙ্গল করে সোজা চালান দিচ্ছে টাউনে। টাউনে প্রচুর পয়সা। ঠাকুমশাইয়ের ট্যারা মেয়েটা কঞ্চি হাতে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে। বলল—ও বাবা, চারটে মোটে! আর পড়বে না? সে মুণ্ডু গুনছে আর গুনছে। গুনে—গুনে আনমনা। আর মুণ্ডুগুলো নীল চোখে আকাশ দেখছে। ঘুপটি মন্দিরের চৌকাঠের কাছে বসে ঠাকুমশাই ওসমান পাইকার আর টাউনের নিন্দামন্দ করছেন। শুনছে ভকা বাউরি। তাড়ির নেশায় ঝিমধরা ভাবটা একটু কমে কেটে যাচ্ছে। সন্ধ্যেবেলা মুণ্ডুগুলো ধামায় ভরে তাকেই পৌঁছে দিতে হবে। মজুরি একমুণ্ডু। ভকা সেই আশায় বলছে—সবই আজ্ঞে টাউনে যাচ্ছে। বাবা আর খাবেন কী বলুন?

কাল ছিল হোম। স্রেফ নিরিমিষ আহার। বাবুপাড়া কুড়িয়ে বাড়িয়ে ছটাক সরপচানো ঘি জুটেছিল। যজ্ঞে পুড়ে সবটাই নাকি বাবার পেটে

চলে গেছে। এক কলসী সিদ্ধির সরবতও ছিল। আতপচাল ফলমূলও ছিল অন্ন-বস্ত্র। বাবুবাড়ির মা-লক্ষ্মীরা এসে বাবাকে প্রণাম করে গেছেন। কিন্তু আজ বাবা পুজো খাবেন কুচুনীপাড়ায়। মানে ছোটলোক-টোটলোকদের। তারা বাগ্দীকুড়ুর কুনাই বাউড়ি ডোম মানুষ। মাঠেঘাটে জলাজঙ্গলে জন্তুর মতো চরে ফিরে খায়, আর জন্তুর মতোই রক্তমাংস চেনে। হোমের ছাই রক্তে ভাসিয়ে কাদা করে ফেলল। আজ তাদের দিন। তাদের তাড়ি আর পচুই গিলে টলতে—দুলতে দলে দলে গাজনতলায় এসে জুটেছে। নাচছে কুদছে। ঢাক বাজাচ্ছে তোলমাতোল। তাদের লোকেরাই বরাবর বাবার নিজের লোক। তিনদিনের উপোসে চোখের তলায় গর্ত, মুখের রঙ কালিঝুলি। পরনে লাল কাপড়, মাথায় লাল ফেট্টি, হাতে বেত। তারা এখন ভক্ত সন্ন্যেসী। জলজ্বল করছে দৃষ্টি। চত্বরের হাড়িকাঠ কেন্দ্র করে গোল হয়ে বসে আছে। হাতের বেত শূন্যে তুলে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে হাঁক দিচ্ছে: 'শিবো নামে পুইণ্য করে বোল শিবো বো-ও-ল!' এবং বেতগুলো একসঙ্গে আছড়ে পড়ছে সামনের মাটিতে: 'বো-ও-ল!' সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের বাদ্যি বাজছে দ্বিগুণ চৌগুণ। ন্যংটেশ্বরো দিগম্বরো···ন্যাংটেশ্বরো দিগম্বরো! তার সঙ্গে কাঁসি বাজছে ন্যাং ন্যাং ন্যাংটেশ্বর! খগা জগা দুভাই বায়েনের ঢাকদুটি রঙবেরঙে পালকে সাজানো। ছিটের কাপড়ে প্রযত্নে মুড়েছে কাঠের খোল। সরু কাঠির মতো পাগুলো এগোচ্ছে পিছোচ্ছে। তার মধ্যে হঠাৎ এসে জুটে গেল হেরম্ব চৌকিদার। গায়ে নীল উর্দি, মাথায় নীল পাগুড়ি, কোমরে চওড়া বেলটিতে আঁটা প্রকাণ্ড পেতলের তকমা। তার হাতে লাঠি আছে। এবং এই তার রাজবেশ! কারণ সে এক রাজপ্রতিনিধি, রাজার লোক। তার বউ আমোদিনী বিলে গিয়ে ইজারাদারের গাল শুনে বলেছিল—জানো আমার মরদ আজার নোক? সেই রাজার লোকটির চোখ এখন ভাঙের নেশায় ঢুলু ঢুলু। কোমর দুলিয়ে নাচতে নাচতে বোল শেখাচ্ছে খগাকে: বাজাদিকিনি! ডিগম্বরো·· ডিগ ডিগ ডিগম্বরো! ন্যাং ন্যাং ন্যাটেশ্বরো! খগা বায়েন এক ঠ্যাং পেছনে তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনে। ডিগম্বরো বাজিয়ে হেরম্বকে যেন তাড়া করে। হেরম্ব বলে—এ্যাই বাপ, এ শালা যে টিমের উলগাড়ি। স্টিমরোলার। ওদিকে বুড়ো নিমতলায় তার বউ আমোদিনী বসেছে পা ছড়িয়ে। তাড়ি গিলে হি-হি- করে হাসছে। একরাশ চুল এলিয়ে দিনকে দিচ্ছে অন্ধকার করে। দুলছে। চোখে ঝিলিক তুলছে।

থলথল স্তন পড়েছে বেরিয়ে। পড়ুক না। এই এসে পড়ল তার শরীলে বাবারই এক ভুতিনী। কেশ দুলিয়ে ভয়ের খেলা জুড়ে দেবে গাজনতলায়। আর তার মেয়ের নাম সৈরভী। বাপের বাড়ি এসেছে গাজনের ধুম দেখতে। দুবাটি তালরস খেয়ে তার হৃদয় এখন আর্দ্র। মুখে লাস্য, চোখে রঙ। দূর থেকে মাকে দেখে বাঁকা ঠোঁটে বলে—ঢঙ মাগীর। তারপর এসে ঢোকে ভক্তসন্ন্যেসী আর বলির আসরে। বাবার নাচ দেখে বলে—ও বাবা! তোমার পাগুড়ি কই? পাগুড়ি পায়ের তলায় রক্ত আর হোমের ছাইয়ে মাখামাখি। উদাসীন চৌকিদার একবার শুধু হেটমুণ্ড হয়। পাঁঠার গলা তখন হাড়িকাঠে। রাখু কামার রাঙা চোখে তাকিয়ে দেখে। তার মধ্যে এখন বাবার এক পিশেচ এসে ঢু:কে আছে। সেই পিশেচ তার মুখ দিয়ে বিড়ির সুখটান টেনে নিচ্ছে। তারপর উঠল, রক্তমাখা খাঁড়া মাথার ওপর। নামল। সৈরভী বলে—মরণ। এবং বাঁকা ঠোঁটে হাসে। স্ফীত নাসারন্ধ্র। কুঞ্চিত ভুরু। কেন বলে 'মরণ', কেউ জানে না। নিজেও না।

ওপাশে বাঁজা রুক্ষু চটানে বসেছে ছোট্ট একটা মেলা। দুপুর থেকে সন্ধ্যা কিছুক্ষণের বিকিকিনির আসর। এগাঁ ওগাঁ থেকে এসে জুটেছে আদেখলা মেয়ে-মরদ কাচ্চাবাচ্চার দঙ্গল। এসেছে প্রেমিক-প্রেমিকা, মাতাল এবং ভাঁড়েরা। শেষ বেলার রোদ্দুরে বুড়ো গজানতলা আপনমনে হাসছে। পাঁপর ভাজার গন্ধে ম ম করছে চারদিক। বেলুনবাঁশি বাজছে। তালপাতার চিল চ্যাঁচাচ্ছে ফেরিওলার মাথার ওপর। মোটা বাঁশে সারবন্দী বসিয়ে রেখেছে চিলগুলোকে। আরও কতরকম শব্দ। কতরকম রঙ। বাবা ন্যাংটেশ্বরের কুচুনীপাড়ায় আজ দিনশেষে গাজনের ধুম। পাড়াগাঁর হৃৎপিণ্ডে রক্ত উঠেছে ছলকে।

এ ধুম পাগলা ভোলানাথের। ভূত-ভূতিনী প্রেত-প্রেতিনী ডাক-ডাকিনী তাঁর চেলা। কে কার শরীলে ঢুকে গাজনতলায় এসে জুটে গেছে চেনা কঠিন। সোনাই খেপার মতো নিরিবিলি ছেলেটাও সাধুর মতো হাঁটু মুড়ে আসন করে গাঁজা টানছে সবার সামনে, গাল ফুলিয়ে ববম্ বম্ গালবাদ্যও বাজায়। তার বাবা যুধিষ্ঠিরের ধানভানা ময়দাপেষা কল আছে। কয়লার আড়ত আছে। একটা লরি আছে। আজ সোনাই স্বরূপ দেখাচ্ছে। যুধিষ্ঠিরের ঘরের শিবরাত্রির সলতে। তার হাতে নির্ভীক ছিলিম। শেষ চৈত্রের অবেলায় রহস্যময় নীল ধোঁয়া দিয়ে সোনাই ঈশ্বরের ধূসর দাসখতে

লই করে ফেলল। আর তাকে পাবে না যুধিষ্ঠির।' উদ্বিগ্ন কোনও গাঁও-বুড়ো এ কথা বলেই মিশে গেল ভিড়ে।

আরেক ভিড় আসছে হই-হই করে। তোরাপ গুণিনের সাঙ্গপাঙ্গরা। লাঠির ডগায় মড়ার মাথা। দিনের আলো আবছা হলেই সেই মাথা নাচবে। খিটখিট করে হাসবে। তোরাপ সারা চোতমাস রাতের পর রাত তন্তরমন্তর দিয়ে জাগিয়েছে মুণ্ডুটাকে। কাল থেকে আবার ঘুমিয়ে পড়বে গুণিনের থানে। ঘরের মধ্যে সেই থান। মাটির বেদী লাল কাপড়ে ঢাকা। তার ওপর পেঁচার ঠোঁট, বাদুড়ের নখ, ভালুকের রোঁয়া, একটা কালো চামর। রুদ্রাক্ষ, পাথরের মালা—হেঁদু-মোছলমানের তীর্থস্থান ঘুরে সারাজীবন ধরে সংগ্রহ করে এনেছে তোরাপ। এখন তোরাপের জটচুলের ভিরকুটি দেখে ভয় করে। কপালে দগদগে সিঁদুর ভড়ে মারতে আসে। হাড় জিরজিরে বুকে ঝোলে রুদ্রাক্ষ, পাথরের মালাটা। বাহুতে অষ্টধাতুর বালা। বগলে ঝাকরা চিমটে। দলবল নিয়ে এসে বসে পড়ল বুড়ো নিমের তলায়। লাঠির ডগায় মুণ্ডুটার এখনও ঘুমঘুম ভাব। ম্রিয়মাণ দাঁতগুলো। রোদ্দুর চলে যাক। ঝুঝকো অন্ধকার আসুক না! ওই বিস্ফারিত দাঁত জলজ্বল করে উঠবে গভীরতর উৎসের কী এক আলো। সেই উৎস জীবন মৃত্যুময়।...

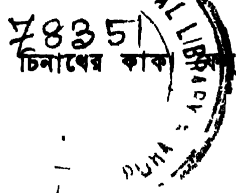
তোরাপের মড়ানাচানোর ক্ষণ গুণছে এবার গাজনতলা। এই অবেলাটা ঘাসফড়িঙের মতো ছটফট করছে আকাশের ঠোঁটে। দণ্ডপল আস্তে-সুস্তে হাঁটছে কি? বাঁজা ডাঙার ওপারে দেবতা পাটে বসতে বড় দেরি করেছেন। ন্যাড়া শিমূলের সিলুট মূর্তি সীতু ডোমের মতো শ্মশানবৈরাগ্যবিষাদগ্রস্ত। ওখানে বিশাল স্তব্ধতা। এখানে তুমুল কোলাহল। ডিগ ডিগ ডিগম্বরো··· কাপড় পরো। ডিগম্বরো বসন পরো। থগামথার ঢাক বাঘের গলার ডাকে। ভক্ত সন্ন্যেসীরা চেঁচিয়ে ওঠে—শিবো নামে পুইণ্য করে বোল্ শিবো বো-ও-ও-ও-ল্। গাজনতলার আকাশের পথে উত্তরের দেশে ফেরার সময় চমক খেয়ে বালিহাঁসের ঝাঁক দিক বদলায়। আমোদিনীর গলায় কোন ভূতিনী এসে সুর ধরে কাঁদে। এলো-কেশের প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার নড়চড়ে। ছাইরক্ত কাদায় মাখামাখি নীল পাগুড়ি উদ্ধার করে হেরম্ব চৌকিদার যায় সোনাই খেপার কাছে ছিলিম টানতে। মন্দিরের বারান্দায় ঠাকুমশাইয়ের ট্যারা মেয়েটা পাঁঠার মুণ্ডু গুণে শেষ করতেই পারে না। আর সৈরভী এখন চলেছে অভিসারে। কলকেফুলের জঙ্গলে বসে আছে তার প্রেমিক কারাধন সদ্গোপ।

ঠোঙায় রসগোল্লা ভরা। রস পড়ছে চুঁইয়ে। শুকনো ঘাস আর হলদে কলকেপাতায় দিনশেষে এখন পিঁপড়েদের মচ্ছব।.........

গাঁয়ের শেষে এই গাজনতলায় চটান। সারাবছর নিঃঝুম পড়ে থাকে এক একর রুক্ষ কাঁকুরে ন্যাড়া মাটি। তার কপালে আবের মতো ভাঙাচোরা খুপচি ওই মন্দির। তার ওপাশে হাজামজা দীঘি। দীঘির পাড়ে তালগাছ, কেয়া, ফণিমনসা কোঙাঝোপ কাঁটামাদারের কয়াখর্বুটে জঙ্গল। মধ্যিখানে গাঁয়ের আতুড়ের নোংরা ফেলার 'ধুলগাড়ি'। হাঁড়িকুড়ি খোলামকুচি ন্যাকড়াকানি কুষকাঠ-পোড়া ছাই ভূতপেরেতের হরেকরকম খাদ্য। মাঝরাতে এসে খেয়ে যায়। অজাতক কাচ্চাবাচ্চারা ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদে। ঠিক শেষ রাতে বিলের দিক থেকে আসে একটা হাওয়া—'বাওর' যার নাম, সেই হাওয়া কয়েৎবেল পেড়ে চুলে গুঁজে তালগাছে ওঠে। শুকনো বাগড়া ধরে টানাটানি করে। তারপর যায় উত্তরপাড়ে একানড়ে চিনাথ বাউড়ির বাড়ি। মস্করা করতেই যায়। খড়ের চাল মচমচিয়ে উঠলেই চিনাথ ঘুম ভেঙে বলে —যা, যা! চঙ করিসনে। তখন 'বাওর'টা চলে যায়। মাণিক ঘোষের বাঁশবনে ঢোকে। শুকনো পাতা ওড়ায় মুঠোমুঠো। তারপর ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে বসে। পুবের আকাশে তখন 'ঝুঝকো তারা'। পশ্চিমে ভাঙা চাঁদের কুচি। ধুলগাড়ির দিকে কান্নাকাটি উঠলে প্রেতিনী বাঁশবন থেকে দৌড়ে যায়। কান্না থামিয়ে মাই দেয়। তখন চিনাথ জেগে আছে।

এই চিনাথের কত্তাবাবা মড়িরাম বাউরির ডাকে দীঘির তলা থেকে ভেসে উঠতেন চড়ককাঠ। চোত-সংক্রান্তির দিন সুমসাম নিঃঝুম ভোরে ভক্তসন্নেসীর দল নিয়ে মড়িরাম দাঁড়াত ঘাটে। চড়ককাঠ ভেসে তরতর করে চলে আসতেন কাছে। সেই 'বিরিঞ্চি'কে তুলে নিয়ে গিয়ে গাজনতলায় বাবার মন্দিরের সামনে পুঁতে দিত ওরা। পুজো-আচ্চা হত। এখনকার চেয়ে হাজারগুণ ধুম লাগত। সন্ধ্যার পর একপ্রহর রাতে সেই কাঠ তুলে আবার দীঘিতে ভাসিয়ে দিত ওরা। তরতর করে ভেসে তলিয়ে যেতেন মধ্যিখানে। আর 'বিরিঞ্চি' আসেন না। আর চড়ক পুজোও হয় না। আজকাল লোকে বলে গাজন "বাণফোড়", ঘূরণচড়ক্কি।... কিংবা পিঠে তক্কার তাকলাগানো মাদুতে কাণ্ডও দেখা যায় না এই গাজনতলায়। এখন সার করেছে শুধু বাবা ন্যাংটেশ্বরকে।

তবে একটা ব্যাপার আছে টিঁকে। চিনাথের কাকা [illegible] বাউরি



গাজনতলা হাসিতে হুলুস্থুলুস করে ফেলত। চিনাথ কত্তাবাবা বাবার সেই গুহ্য ব্যাপারটা পায়নি বটে, কাকারটা পেয়েছে। গাজনের বিকেলে চিনাথ সঙ সাজতে বসে। রঙচঙ মাখে। শণের গোছা হাঁড়ির কালিতে ঘষে দাড়ি বানায়। কতরকম সাজে সে; ছেলেঠ্যাঙানো মাষ্টের, পুলিসের দারোগা, পুজুরী বামুন, ব্যাংকের নেসপেট্টর, এমনকি এসডু সায়েবও সাজতে ছাড়ে না। গত গাজনে সেজেছিল ভোট-কুড়ুনি বাবু। জোরালো 'বক্তিমে' দিয়ে ভিড় বাড়িয়েছিল চিনাথ। সঙাল সাজলে 'তলপেটে' বা চেলা লাগে। চেলারা মিছিলের নোক সেজেছিল। যা দাবি করে, ভোটের বাবু বলে— দোব। লোকে হেসে খুন।

এবার চিনাথ গাজনে কী সঙ দেবে, তাই নিয়ে সারামাস চিন্তাভাবনা করছে। তার ভুঁইক্ষেত নেই। ফসলের মরশুমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাঠে পাহারাদারি কাজটা নেয়। তখন সে 'জাগল'। দিনরাত মাঠে টো টো ঘুরতে হয়। ঘোরাঘুরির সময় তার ভাবুক ভাবটা জমে ভাল। এতোল-বেতোল সব ভাবনা তার। বাঁজা বউ ছিল ঘরে। বিয়োতে পারেনি বলে নাথি মেরেছিল মনের দুঃখে। বউটারও মনে বড্ড বেজেছিল। হেরম্বের ভাগ্নে থাকে টাউনে। তার সঙ্গে চলে গেল। চিনাথ ভাবে, রাগ পড়লেই ফিরে আসবে। আসে না। মাস যায়, বছর যায়। চিনাথের কেশ পাকে। দাঁত নড়ে। নাড়ু ডাক্তার চিমটেয় টেনে তুলে দেন। রক্তারক্তি হয়। আর চিনাথ ভাবে, মেয়েমানুষ তো! বুদ্ধিসুদ্ধি কম। রাগ পড়লেই আসবে। আসে না। চিনাথ সাঙা করতে গিয়ে আবার ভাবে, যদি হঠাৎ এসেই পড়ে—সতীনের চুলোচুলি থামাবে কে? আমি নিরীও লোক। যাকগে বাবা! এবং এই করে মাস, বছর, গাজনতলায় ধুমের পর ধুম, কতগুলো কেটে গেল। পটেশ্বরী বাউরান আর ফিরল না। এখন চিনাথ ভাবে, আসুক না। সেবারে মেরেছিলাম এক নাথি। এবার মারব জোড়ানাথি।

এবং রাগের চোটে শেষঅব্দি চিনাথ করেছে কী, পটেশ্বরী আর হেরম্বের টাউনবাজ ভাগ্নে ষষ্ঠির নামে সঙের গান বেঁধেছে। এমন কী, একখানা সঙও বানিয়েছে। তার মানে জোড়া নাথি। চেলা গোবরা কুনাই বয়সে নবীন, যুবো-পুরুষ। চেহারাও দেখনশোভা। তাকেই সাজাবে পটেশ্বরী। নিজে সাজবে ষষ্ঠীচরণ। বাবুপাড়া থেকে পাতলুন জামা চেয়ে এনেছে। সইদ মনোহারিওলার কাছে দশ পয়সায় একটা হাতঘড়িও কিনে এনেছে।

গত রাতে হঠাৎ গোবরা বলেছিল—ও মামা। এ কি ভাল হচ্ছে?

—ক্যানে? ভালমন্দর কথা ক্যানে?

—নিজের ঘরের খিটকেল নিজেই গাইবে?

—গাইব।

—লোকে বলবে কী মামা?

—লোকে হাসবে। বুঝলি বাপ গোবধন? ·· চিনাথ ঢোলে চাঁটি দিয়ে বলেছিল—নে, ধাগাদিকিনি এবারে। গলা ছেড়ে ধর বাপ! 'বন্ধু লাও বা না লাও মুখ দেখে যাও/পটেশ্বরীর আয়না।'···

কাল নিশুতি রাতে নির্জন দীঘির পাড়ে চিনাথের উঠোনে পটেশ্বরী ও ষষ্ঠীচরণের কেলেঙ্কারির 'ইহারছাল' হয়ে গেছে। তার মানে রিহার্সাল। গোবর্ধন সাজছে। চিনাথ সাজছে। বেলার রঙ আর একটু ফিকে হোক। ওদিকে পাঁঠাবলি শেষ হয়ে যাক। তখন সঙ আর ছড়ার ধুম পড়বে। তোরাপের মড়ার নাচ ও শুরু হবে। এগুলো হচ্ছে গাজনতলার শেষ মজা। লোকে সময় গুনছে মনে মনে। এখানে চিনাথের উঠোনে বাঁশের মাচায় ঢোলের উপর কাঁটামাদারের ছায়া। লম্বা ছায়াটা মাঠফেরা মুনিষের মতো ক্লান্ত হয়ে দীঘির জলে গিয়ে নেমেছে। মাটির কুন্তে তাড়ির ফেনা পড়েছে উপচে। পাতলুন ও শার্ট ঢ্যাঙা চিনাথের শরীরে বেচপ আঁটো হয়ে গেছে। সরু গোঁফটা যাচ্ছে খসে। আবার এঁটে নিচ্ছে পাকুড়ের আঠায়। এনামেলের খুরিতে তাড়ি ঢেলে 'পটেশ্বরী' বলে—ও মিনসে, খাও গো। চিনাথ হাসে। —চুপ্ বে। এখন আমি তোর মামা। মামা বলে ডাক।

তখন সেজে গুজে তৈরী হয়েছে সীতু ডোমের মা। তার সঙ একটাই। কাবুলীওলার। থলথলে মোটাসোটা মেয়ে। চুল পাকন্ত। মাথায় ফেট্টি বেঁধে হাতে লাঠি নিয়ে কাবুলী সেজে ভিড়ে ঢুকবে। 'উপিয়ার' বদল ছুদ চাইবে। লাঠি ঠুকবে। আর তার খাতক সাজার কথা ন্যাড়া ডোমের। রোগা পাঁকাটি চেহারা। কালো কুচকুচে রঙ। খুব লোক হাসাতে পারে। কিন্তু এবার ঝুমন ডোমনীর সঙ্গে তার বউয়ের ঝগড়া হয়েছে। সে সাজছে হনুমান। উপ ঝাঁপ করে উঠোনে খড়ের লেজ নেড়ে দাপাদাপি করছে। তার বউ হাসি চেপে ধমকেছে—এখানে কী? গাজনতলায় জাঁক দেখাও গে না। তাই শুনে গম্ভীর ন্যাড়া বলছে—থাম্ মাগী! পেরাকটিস কচ্ছি।··

আর কুনাইপাড়ায় তখন সুদাং কুনাই হাসপাতালের ডাক্তারবাবু সাজতে

ম্যান্ত। তার সঙ্গে ছড়াও থাকবে। ছড়া বেঁধেছে তিলক কুনাই। ইস্কুলে কেলাস থিরি অব্দি পড়েছিল। গোমুখ্যু নয়। খাতা আছে। পেনের কলম আছে। লিখেছে: 'আ'র যাব না আঁতুড়শালে/রেক্শা ডেইকো নিয়ে যাও গো বহরমপুরের হাসপেটালে!' পরকলিটা শেখাচ্ছে দোহারকিদের। 'ইন্‌জেকশন দেবেন ডাক্তার পেঁচোয় পেলে।।'

এই নয়। আরও আছে। জিভের রসে আঙুল ভিজিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে। তারপর—'ওগো বঁধুয়া, পাশে শুয়ো না দিন বড কঠিন/দেশে এল ফেমিলি পেলানিং।।,...

গাজনতলায় আজ এইসব হাঁড়ি ভ ঙ র ধুম। যার যা মনের কথা আছে, বলে নাও সম্বচ্ছরের মতো। এখন বাবা ন্যাংটেশ্বর তোমা'র সভায়। কাকে পরোয়া?

তাই বলে একেব বে বেপরোয়া হওয়াও যায় না। ছোটলোক-টোটলোক মানুষ সব। র ত পো'হালেই পেটের ধান্দায় বেরুতে হবে। গাঁয়ের সকল লোকদের চটানো বিপদ। সে যদি প রে কেউ তো ওই বোরজে মশাই। বাবুপাড় র বজ্রধর বাঁড়ুজ্যে। নিজেকে বলেন পল্লীকবি। কখনও বলেন চারণকবি। অবশ্য কবিয়ালী করতে কোন আসরে কেউ দেখে'ন কখনও। নিদেন রথয াত্রা বা পুজোপার্বণের দিন ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছাড়া গান। কবিয়ালের ভঙ্গীতে নাচেন। ঢোল বাজায় নবীন বোরেগী। খঞ্জনি বাজায় অক্ষ নাপিত। দোহারকি করে জনাকতক চাষা-ভূষো মানুষ। কিন্তু বোরজে মশাইকেও সারা বছর যেন গাজনতলা'র জন্তে হা-পিত্যেশ করতে হয়। এমন জম্যাট আসর আর থাকতে নেই। রসিক মানুষ বলে রসের গানেই পাকা। সঙের ঝাঁঝমেশানো সেইসব ছড়াগান গাজনতলার সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে যায়। তার ওপর আছে হাটে হাঁড়ি ভ ঙা'র বদখেয়াল। পাড়ার গোপন কেলেঙ্কারি নিয়ে গা'ন বাঁধতে ছাড়েন না। প'রে কে বোরজে মশাইকে? কালো দাঁতগুলো বের করে হেসে বলেন—আমি বজ্রধর বজ্র ধরতে পারি হে। যা পারো কোরো।

নাদুসনুদুস মানুষটি। মাথায় টাক আছে। প্রকাণ্ড গোঁফ আছে। সামনে একটা দাঁত ভাঙা। ও'খান দিয়ে পিক করে থুথু ফেলার অভ্যাস। ভুঁড়িটিও নেয়াপাতি। পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে একহাত কপালে অন্যহাত মাজায় রেখে নাচেন। কপালে সিঁদুরফোঁটা। হঠাৎ কারও দিকে তাকিয়ে

ফিক করে হাসলে তার আর মুখে ভাত রোচে না। বোরজে মশাই আমাকে দেখে হঠাৎ হাসলেন কেন? সারাক্ষণ মগজে এই ঝিঁঝি পোকা ডাকে। যদি জিজ্ঞেস করে, বোরজে মশাই, হাসলেন কেন? বোরজে মশাই জবাব দেবার পাত্রই নন। কথায়-কথায় ছড়া কাটেন। রঙ্গব্যঙ্গ করেন। বকুলতলায় বুড়োথুড়ো বাবুরা আড্ডা দিচ্ছেন এবং কোন চাপা ব্যাপার নিয়ে কথা চলছে, দূর থেকে ওঁকে দেখলেই—চুপ, বোরজে আসছে, বলে গম্ভীর হয়ে যান। ছোটভাই চক্রধর বিডিও আপিসের পিওন। তার ও বয়স পঞ্চাস হয়ে এল। বলে—আর কতকালে এঁড়েমি করবে বলো-দিকিনি দাদা? তোমার জন্মে মুখ পাইনে কোথাও ছিঃ। বজ্রধর ফিক করে হেসে বলেন—কী বললি, এঁড়েমি? এঁড়ে দেখছিস কখনও? দেখে আয় গে মিত্তিরমশাইয়ের বাগানে চরছে। এবং চক্রধর একদিন সাইকেলে আপিস থেকে ফিরে আসছে, সন্ধ্যেবেলা সেই বাগানের দিকে তাকিয়ে সত্যি একটা এঁড়ে দেখেছিল। হাসতে-হাসতে নাড়ি ছিঁড়ে যায়। মাইরি! দাদাটা যেন কী!

এই বোরজে মশাইও এখন তৈরি হচ্ছেন অক্ক নাপিতের বাড়িতে। অক্ক এক বালতি ভাঙের শরবত বানিয়েছে। বোরজে মশায়ের চোখ ক্রমশ ঢুলুঢুলু। গাজনতলায় গিয়ে একবার ফাঁক বুঝে ছিলিমও টানবেন। একসময় গাজনতলা অন্ধকার হয়ে যাবে। ভিড় যাবে ভেঙে। শুধু কয়েকজন মাতাল থাকবে শুয়ে। কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলবে। আপনমনে কথা বলবে। আর আসবে একটা কি দুটো শেয়াল। হাড়িকাঠের কাছে ঘুরঘুর করবে। রক্ত চাটবে গাজনতলা তখন পুরাণের শেষ পাতা।......

দীঘির পাড়ে চিনাথ তার উঠোনের মাচায় এনামেলের খুরি ধরেছে, গোবরা সাবধানে নীলচে রঙের তালরস ঢালছে, পিছনে চাপা একটা শব্দ হল। ঢালু পাড়ে কেয়া কোঙা ফণিমনসা আর নাটাকাটা কুচফলের ঝোপঝাড় আছে। গোবরা ভাবল গরু কী মোষ, ঘুরল না। চিনাথ বলল—সাবোধান বাপ। এবং চিনাথের দৃষ্টি খুরির দিকে। তারপর মাচাটা মচমচিয়ে উঠল।

চিনাথ উদাস চোখে তাকায়। গোবরা বলে—কে বটে হে? তারপর সেও মুখ তোলে। দুই সঙালের চোখে পলক পড়ে না। এসেই মাচায় পা ঝুলিয়ে বসেছে একটা লোক। একটু-একটু হাঁপাচ্ছে। রোদপোড়া তামাটে চেহারা। বড় বড় চোখ, গর্তে বসা। এক মাথা রুক্ষু চুল। খাড়া

নাক। চৌকো চোয়াল। চোয়ালের হাড় ফুটে আছে পষ্টাপষ্টি। এক চিলতে গোঁফও আছে। পাতলা খোঁচা খোঁচা দাড়ি আছে। তার গায়ে ধুলো-কাদায় নোংরা খয়েরি জামা, পরনে আঁটো ছাইরঙা পেণ্টুল, তার কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে। চিনাথ একটু ঝুঁকে পায়ের দিগটাও দেখে নেয়। খালি পা শুকনো কাদা মাখা। লোকটা ঠোঁট ফাঁক করে হাসল।

চিনাথ বলে—আপুনি কে বাবুমহাশয় ?

গোবরা বলে—নিবাস কোথা বাবুমহাশয় ?

লোকটা খিক্‌খিক্ করে হেসে ওঠে। —আমাকে চিনতে পারছ না শ্রীনাথ ?

অমনি চিনাথের নেশা চিড়িক করে দুফাঁক হয় এবং মধ্যিখানে মাথা তুলে চমক খাওয়া গলায় নেশা ও স্বাভাবিকতার দুদিকে দুহাত রেখে সঙাল বাউরি বলে—তাইলে চিনলাম বাবু মহাশয়।

গোবরা মেয়েলি চোখে তাকিয়ে বলে—আম্মোও চিনি-চিনি লাগে। বো··· বো··· বোর···

—আপুনি আজ্ঞে বোরজে মশাইয়ের জামাই। বলে চিনাথ মাচা থেকে ধুপ করে নামে এবং আঁটো পাতলুন প্রায় ফাটিয়ে হেঁটমুণ্ডে পায়ের ধুলো নিতে হাত বাড়ায়। বিগলিত হয়ে বলে—অপোরাদ লেবেন না জামাইবাবু, আমি বাঞ্চোত লেশাখোর মনিষ্যি। কী দেখতে কী দেখি। ও জামাইবাবু খবরাদি ভাল তো ? আমাদের মেয়ের খবর ভাল তো ? বাি ' সব ভাল তো ? তো ও জামাইবাবু, দেখি, শ্বশুরবাড়ি ঢোকেন নি এখনও—হুঁ, আগে ঘাটে গিয়ে ধোয়া-পাখলা করুন। বাপ গোবর্ধন, ঘাটবাগে লিয়ে যা জামাইবাবুকে।

এই দীর্ঘ আবেগাপ্লুত সংলাপের পর চিনাথ পশ্চিম মাঠের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে—উদিক কের কোত্থেকে এলেন গো ? বিলখাল জায়গা। দিশে লেগেছিল নাকিন ? যান, মুখচোখে জল দিন।

বোরজে মশাইয়ের জামাই কোন কথার জবাব না দিয়ে পুবের গাজন-তলার দিকে তাকায়। বলে—ওখানে কী হচ্ছে শ্রীনাথ ?

—আজ যে গাজন আজ্ঞে। চিনাথ ভক্তিতে নম্র হয়ে বলে। আজ সংক্রোন্তির পূজো আজ্ঞে। দেখছেন না, তাইতে আমি সেজেছি ! সঙটঙ

দোব। ছোটনোক মনিষ্যির কথা ছেড়ে দিয়ে ঘাটে যান জামাইবাবু। আমরা গাজনতলা যাব। বেলা পড়ে এল।

গোবরা চোখে ঝিলিক তুলে বলে—আপনার শ্বউরমশায়ও সঙ দেবেন গাজনতলায়।

জামাইবাবু শুকনো হাসে। তারপর বলে—তেষ্টা পেয়েছে। জল খাওয়াও তো শ্রীনাথ।

—জল?

—হাঁ, জল। জামাইবাবু ঢোক গিলে ফের বলে—ঘরে মুড়িটুড়ি থাকলে দিতে পারো। নেই?

সন্দিগ্ধ স্বরে চিনাথ বলে—শ্বউরবাড়ি যাবেন না জামাইবাবু? ক্যানে গো?

জামাইবাবু এবার রেগে যায়।—অত কথায় তোমার কাজ কী শ্রীনাথ? জল চাইলাম, দেবে কী না বলো!

অপ্রস্তুত হেসে চিনাথ টলতে টলতে ঘরে ঢোকে। পটেশ্বরী শাড়িপরা গোবরা মেয়েমানুষের চোখে তাকিয়ে থাকে বোরজে মশায়ের জামাইয়ের দিকে। জামাইবাবু খুঁটে খুঁটে জামার শুকনো কাদা ছড়াচ্ছে। কোঁচকানো ভুরু। ঘাম শুকিয়ে মুখটা মরামানুষের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। গোবরা ভাবে, এর অত্থটা কী বটে? বড়ই গুহ্যকথা মনে হয়।

কাঁসার একটা গেলাস আছে ঘরে। চিনাথ হাতড়ে পায় না। জানলাহীন ছোট্ট ঘরে এখন অন্ধকার। ওদিকে গাজনতলার ধুম বুঝি ফুরিয়ে যায়। অসময়ে এ কী জ্বালাতন! নেশার ঘোরে খালি পটেশ্বরীকেই বিড়বিড় করে গাল দেয় চিনাথ। পেতলকাঁসার জিনিস বলতে ওই গেলাসটা বাদে সব ঘুচিয়ে গেছে পালানী মেয়েটা। অপয়া রাক্ষুসী! চিনাথ দুমদাম পেঁটরা সরায়। হাঁড়ি থালা ওলটপালট করে।

গোবরা ডাকে—ও মামা! দেরি হয়ে যাচ্ছে।

চিনাথ বলে—যাই বাপ্। জামাইবাবু বড় মুখ করে আমার কাছে জলটল চাইলেন। ই কি কম কথা? যাই বাপ্, যাই!

হুঁ! অসময়ে এ কী ভোগান্তি দেখদিকিন্। তুমি বাপু বোরজেমশায়ের জামাই। শ্বউরবাড়ি গিয়ে খাটে বসবে। পান খেয়ে ঠোঁট রাঙাবে। আপন শাউড়ি নেই বটে, ছোট্‌ঠাকরুন তো আছেন। তিনিও শাউড়ি। …বোরজে মশায়ের ছেলেপুলে বলতে ওই একটিমাত্তর মেয়ে। মা-মরা মেয়েটা

বড্ড ন্যাওটা ছিল বাবার। টাউনে বিয়ে দিলে সেবার। চিনাথ সেই বিয়ের ভোজে খেয়েছিল। একসময় বোরজে মশাইয়ের দলেও সে ছড়া গাইত। সঙ দিত। কিন্তু ওনার যা মুখখিস্তি আর কথায় কথায় চড় থাপ্পড়!

—ও মামা!

—যাই বাপ, যাই!

গেলাস খুঁজে পেয়ে হঠাৎ সেটা খামচে ধরে বসে রইল চিনাথ। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেছে। চিনাথের বুক ঢিপ ঢিপ করে কাঁপে। নেশা ফিকে হয়ে যায়। হা বাবা ন্যাংটেশ্বর, খামোকা এ কী ঝড়বাদল অবেলায়!

আর সেই সময় বোরজে মশায়ের জামাই এসে ঘরে ঢোকে। চাপা গলায় বলে—শ্রীনাথ, আমি তোমার ঘরে থাকছি। তোমরা গাজনতলায় চলে যাও! আর শোন, আমি এখানে থাকছি, কেউ যেন জানে না। কেমন?

অগত্যা চিনাথ বলে—আচ্ছা।

—ওই ছেলেটাকেও আমি বলেছি। ওকে একটু সামলে রেখো ভাই!

—আজ্ঞে।...

চিনাথ যখন বাইরে এল, তখন গাজনতলার দিকে আকাশের রঙ শালিখ পাখির ডিমের মতো নীলধূসর হয়ে গেছে। কিন্তু পশ্চিমের মাঠের আকাশে রক্তসন্ধ্যার ঘোর লেগেছে। মাচার কলসীটা থেকে বাকি রস খুরিতে ঢেলে গোবরা মিচিক মিচিক হাসে। —খাও মামা!

খুরি তুলে চিনাথ ঘরের দিকে চোখ নাচিয়ে বলে—সাবোধান।

গোবরা অবিকল পটেশ্বরীর গলায় বলে ওঠে—হুঁ। মিনসে, হ্যাঁ। সেটা তোমাকে বলতে হবে না।...

গাজনতলায় হুলুস্থুলু ভাব জমেছে ততক্ষণে। ঘন ঘন শিবো নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে ভক্ত সন্নোসীরা। শেষ বলির ঢাক বাজছে চৌগুণ তোলপাতোল। হাড়িকাঠ ঘিরে ওরা, ঘুরে-ঘুরে নাচছে। মাথার ওপর বেতে-বেতে হচ্ছে ঠোকাঠুকি। বুড়োনিমের তলায় রামপদ বাগদী, যাত্রাদলের বিবেক সে, গমগমে গলায় গান ধরেছে:

'নাচে, পাগলা ভোলা গলায় মালা
হাতে লয়ে শূল।
প্রমথ প্রমত্ত নাচে, (কানে) ধুতুরারই ফুল ॥
স্কন্ধেতে নাচে নাগিনী
হাঁ করে হাঁকে হাকিনি
ডাঁ করে ডাকে ডাকিনী
এলাইয়া চুল ॥'...

রামপদের মূর্তিটি শিবের। সারা গায়ে চুলোর ছাই মাখানো। পরনে নকল বাঘছাল। হাতে ডম্বরু। কাঁধে প্ল্যাস্টিকের সাপ আর মাথায় পরচুলোর জটাজুট। তাতে একফালি রাঙতার চাঁদও আঁটতে ভোলেনি। মুখে খড়িগোলা রঙ মেখেছে এবং গোঁফ এঁটেছে কান বরাবর দড়ি টেনে। বেশি হাঁ করা যাচ্ছে না। তাতে কী? গলার স্বর হাঁড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে যেন, এমন গমগমে ও প্রতিধ্বনিময়। বোরজে মশাই তারিফ করে বলেছিলেন—বাগ্দীর পো কাঁকড়াগুগলি খেয়ে একখানা সরেস গলা জুটিয়েছে বটে! ও রামপদ, রেডিও-সেণ্টারে তোকে লুফে নেবে রে! যেতে চাস তো বল্, জামাইকে এককলম লিখে দিই। জামাই এখন কলকাতার কলেজে পোফেসর হয়েছে জানিস তো? খুব নাম। খবরের কাগজেও নাম ছাপা হয় বাবা। সহজ কথা না। 'পরে একদিন রামপদ গিয়ে ধরল—কই বোরজে মশাই, দিন তাহলে এককলম লেখে। কলকেতা যাই। অমনি বোরজে মশাইয়ের কী রাগ! জামাই না আমার শালা! বুঝলি? শালা। অবশ্য তখন ভাং খেয়ে মনের গতিক অন্যরকম ছিল হয়তো। রামপদ বেজার হয়ে ফিরে এসেছিল। যাক্ গে বাবা, এ গাঁগেরামই ভাল।

ভিড়ের একপাশে মনকির হোসেন ছড়াদার দলবল নিয়ে ছড়া গাইছিল: 'কুচুনীপাড়ায় ভোলা যাও কিসের কারণ, কার সঙ্গে প্রেম করে মজাইলে মন হে...' এবং হই হই করে কুনাইপাড়ার সুদাং-এর দল এসে পড়তেই শ্রোতৃবৃন্দ ছত্রখান। মনকির ছড়াদার তখন আরো চড়ায় গলা তোলে।

এবার জমাটি তুঙ্গে ওঠার সময়। একের পর এক সঙের দল আসছে। ছড়াদাররা আসছে। এসে গেল ন্যাড়া ডোমও হনুমান সেজে। এসে সটান উঠে পড়ল বুড়ো নিমের কাঁধে। ডালপালা নেড়ে উপ ঝাঁপ করতে থাকল। তলায় বাচ্চা-কাচ্চারা চ্যাচায়—এই হনুমান কলা খাবি? জয়জগন্নাথ দেখতে

যাবি ? যুধিষ্ঠির মণ্ডলের সেই গাঁজাখোর ভ্যাবলা ছেলেটা বন্দুক তাক করে। আঙুল হয়েছে নল। মুখে বলে—গুড়ুম। একপা পেছনে, একপা সামনে, একই ভঙ্গীতে বন্দুক তাক করে থাকে। হনুমান ভিড়ে নেমে এসেছে, তখনও মোনাক্ষেপা বন্দুক তাক করে আছে। হেরম্বর মেয়ে সৈরভী অভিসার থেকে ফিরে তার পিঠে খোঁচা মেরে বলে—মরণ! তখন সে ঘোরে। এবং দাঁত বের করে নিষ্পাপ হাসে। বলে—সৈরভী! কবে এলে গো ? সৈরভী যেতে যেতে ফের বলে যায়—মরণ!

এসে পড়েছে 'কাবুলীওয়ালা' সীতু ডোমের মা বুরন ডোমনীও। তাকে ঘিরে মেয়েদেরই ভিড়। হাসতে হাসতে মেয়েদের কোমরের কাপড় যাচ্ছে খসে। ডাগর স্তনে ঝড়লাগা দুলুনি। যুবোযোয়ান পুরুষেরা আড়চোখে তাকিয়ে আছে। হেন সময়ে খবর হল, বোরজে মশাই আসছেন! এতক্ষণে আসছেন দলবল নিয়ে। আবার ভিড়গুলো ভাঙল চুরল। এসে পড়েছেন। বোরজে মশাই এসে পড়েছেন! গাজনতলায় সাড়া পড়ে গেল।

দীঘির পাড় দিয়ে দিনশেষের রোদ ঝিকিমিকি প্রজাপতির মতো নাচছে বোরজে মশায়ের টাকে। মুখে সেই বাঁকাচোরা হাসি। সামনের একটা দাঁত নেই। ঢুলুঢুলু চোখ। কোমর ঘুরিয়ে হাত মাথায় তুলে নাচতে-নাচতে আসছেন। নবীনের ঢোলে বাজছে তেওট তাল : ধা ধিন ধিন/ধেরেকেটে ধেরে-কেটে…রসিক বোরজে মশাই ফাঁকের মাথায় বলে উঠছেন : এক দুই তিন/মেরেকেটে মেরেকেটে…এবং তিনটি আঙুল দেখাচ্ছেন। তার মানে ? মানে আবার কী ? কেমিস্ট্রি পেল্লানিং। সুদাংয়ের গান এবার মা… মারা গেল। সুদাং গতিক বুঝে অন্য গান ধরেছে। বোরজে মশায়ের মতো অমন ঠাটঠমক অমন রঙধরানো পদ বাঁধার সাধ্যি তার নেই।

সবশেষে এল চিনাথের সঙ। সঙ্গে গোবর্ধন। বঁধু লাও বা না লাও/ মুখ দেখে যাও/পটেশ্বরীর আয়না॥ সৈরভী তার মরণ ছুঁড়ে গোবরার পিঠে কিল মেরেছে।—গলা নেই, টলা নেই, খালি চিঁ চিঁ।

গোবরা নাচতে নাচতে একটু কাছ ঘেঁসে চাপা গলায় বলে—ও সৈরভী তোর চুলে অত খড়কুটো ক্যানে ?

সৈরভী রাঙা মুখে সরে যায়। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে আবার খোঁপাটা ঠিক-ঠাক করে নেয়। খোঁপার কাছ থেকে হলদে শুকনো কল্কেপাতা ঝরে পড়ে। বুকের ভেতরটা হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগে। একবার ঠোঁট কামড়ায়। তারপর

হনহন করে চলে যায় অন্য ভিড়ে। কেন যেন হঠাৎ বড্ড ভয় করে সৈরভীর।...

তখন মন্দিরতলায় ভক্ত সন্নেসীরা লম্বা হয়ে পড়ে প্রণাম করছে। খগা জগার ঢাক শেষবারের মতো বাজছে। ঠাকুমশাইয়ের ট্যারা মেয়েটা ধামার মুণ্ডগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, নাকি ভকা বাউরির দিকে, বোঝা যায় না। ঠাকুমশাই ভেতরে ঢুকে সলতে উসকে দিচ্ছেন। বাইরে হাতের রেখা ঝাপসা হয়ে এল।

এবার সময় হয়েছে তোরাপ গুণিনের মড়া নাচানোর। অং বং করে মন্তর পড়ছে গুণিন। অষ্টাবক্র লাঠির ডগায় সিঁদুর মাখানো মুণ্ডটার সবে ঘুম ভাঙছে। দাঁতগুলো আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। গুণিন দুলছে। হাতের লাঠিটাও দুলছে। চোখ বুজে গুণিন হেঁড়ে গলায় তালে তালে বলছে: জাগ জাঁগ জাঁগ জাঁগর ধিনা...জাঁগর ধিনা জাঁগ জাঁগ জাঁগ ..

ওদিকে বোরজে মশাই খিটকেলে ছড়া গাইছেন। বাবুপাড়ার একটা কেলেঙ্কারি সবাই টের পেয়ে উপভোগ করছে। ভুজঙ্গ ডাক্তারের বিধবা বোন আর ব্লক আপিসের পশুডাক্তারের প্রেম জমে উঠেছে। ডাক্তারের গাইগরুর ব্যামো সারাতে এসেই নাকি এই ব্যাপার। এখনই খবর চলে যাবে ডাক্তারের কানে। কিন্তু কী করার আছে! বজ্রধর বাঁড়ুয্যে বলবেন—আমার লবডঙ্কাটি। ভুজুর ওষুধ আমি খাই নাকি? ওষুধ নয়, ঘোড়ার পেচ্ছাপ। আসলে হয়েছিল কী, ও মাসে এক বারান্দা রুগীর সামনে বোরজে মশাইকে অপমান করেছিল ভুজঙ্গবাবু। মিক্সাচারের দাম না হয় ছেড়েই দিচ্ছেন, ট্যাবলেটগুলো কিনতে তো পয়সা লেগেছিল! উনি তো আর দানছত্র খুলে বসেননি। বোরজে মশাই গুম হয়ে বলেছিলেন—ট্যাবলেটে আমাশা বেড়ে গেছে ভাই বুজু। কাজেই তুমিই আমাকে ক্ষতিপূরণ দাও। তারপর ওক্ষুনি কেটে পড়েছিলেন। এবং আসতে-আসতে মাথায় গজিয়েছিল এই গানটা। রোস, দেখাচ্ছি মজা গাজনের দিন। আজ সেই মজা দেখাচ্ছেন। তিনবার ধুয়ো গেয়ে দোহারকিরা সমের মুখে ছেড়েছে, বোরজে মশাই অন্তরার প্রথম কথাটা বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছেন, ঠিক সেই সময়...

হঠাৎ সব শব্দ থেমে গেল গাজনতলায়।

দিনশেষের ধূসর কী এক আলো ন্যাড়া, পাথুরে এবং চাষাপুরুষের হাতের

তালুর মতো খসখসে এই এক একঘ চটানে এতক্ষণ মানুষজনকে প্রাগৈতিহাসিক যূথ-স্মৃতিতে চুবিয়ে রেখেছিল।

একখানা পুরনো ছবির পট ভাঁজ করা থাকে সারা বছর এবং সেই পট খুলে হাত পা ছড়িয়ে বসে ঢুলুঢুলু চোখে দেখছিলেন বাবা স্যাংটেশ্বর শিব, যাঁর অন্য নাম মহাকাল।

হঠাৎ কারা এসে লাথি মেরে উল্টে দিল সেই পট। প্রাগৈতিহাসিক যূথস্মৃতির তাবৎ মগ্নতা ও তন্ময়তা বুদ্বুদের মতো ফেটে গেল তক্ষুনি।

মন্দিরের কোটরে পিদীম ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে ঠাকুমশাই বিগ্রহের আড়ালে খেঁকশিয়ালের মতো লুকিয়ে পড়লেন। শেষ আরতির ঘণ্টা সঙ্গে সঙ্গে গেছে থেমে। আর ভকা বাউরি সেই ফাঁকে একটা মুণ্ডু নিয়ে পালায়। ট্যারা মেয়েটা একবার চেরা গলায় চেঁচিয়েই ব্যাপারটা চোখে পড়ামাত্র চুপ করে।

ন্যাড়া বাউরি খড়ের লেজ কামড়ে আবার নিমগাছ চড়তে যাচ্ছিল। গুড়িতে ঠেস দিয়ে মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। নকল শিবের মুখ চচ্চড় করে, পিটপিট করে তাকায়। ঝুমন ডোমনী, সুন্দ্যাং, চিনাথ, গোবর্ধন.. তাবৎ সঙাল ভাঁড় এবং ভক্ত সন্ন্যেসীগণ, খড়্গধারী রাখু কামার, খগাজগা ভ্রাতৃদ্বয় এবং খগার পুকড়োলাগা কাঁসিবাজানো ছেলেটা কুমোরের বারান্দায় ঝুলনপূর্ণিমা পুতুল হয়ে ওঠে।

আমোদিনীর ভূতিনীও পালিয়ে যায়। হেরম্ব চৌকিদার রক্তকাদাছাই-মাখা নীল পাগুড়ি মাথায় জড়াতে গিয়ে কপালে হাত ঠেক । সে হাত নামাতে ভুলেই যায়। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কাজ যেমন।

বোরজে মশাই ঠোঁট ফাঁক করেছেন তো করেছেন। ভাঙা দাঁতের গর্ত দেখা যাচ্ছে। নবীন ঢোল থেকে হাত তুলতে পারছে না, কী ভীষণ আঠালো ছাউনি! অক্ষ নাপিতের খঞ্জনীজোড়া কানের কাছে ধরা, শব্দহীন। বড় সাধে ভুজু ডাক্তারের বিধবা বোনের গাইগরু সেকে চারপা হয়েছিল হারাধন তিওর, সে দু পা হতে গিয়ে বসে পড়েছে।

তেরাপ গুণিনের লাঠির ডগা থেকে মড়ার মাথা লাফ দিয়েছিল পালাবে বলে পারেনি। গুণিনের দুপায়ের ফাঁকে গেরুয়া লুঙ্গির তলায় লুকিয়ে আছে। তোরাপের চোখের জ্যোতিটি আর নেই। ঘোলাটে চোখের পাতা, নিষ্পলক এবং তারাদুটো নেবায় আক্রান্ত, হলুদবর্ণ।

গাজনতলার চারদিক থেকে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ঝাঁকে-ঝাঁকে 'ছিয়ারপির নোক।

ছিয়ারপির নোক শুনলেই ইদানীং গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বউ-বউড়ি ঝি-ঝিয়াড়ি আর যুবোযোয়ান মরদগুলো মাঠেবাদাড়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। ঝগড়াঝাঁটিতে পরস্পরকে লোকেরা শাসান—থামো, ছিয়ারপি ঢোকাব ঘরে। চ্যারাক্-পেঁা চলবে না।

'ছিয়ারপি'রা দেখতে কেমন, সবাই জেনে ফেলেছে ইদানীং। ওনাদের মাথার টুপিটি লাল নয়কো মোটে। মহা বন্দুকবাজ। লাঠিবাজও বটেন। এবং ঝাঁকে আসেন, ঝাঁকে যান। এবং বাবুপাড়ার বর্ণনা মতো ওনারা সেই হিল্লিদিল্লির নোক। তাই মহিমাপুরের বংশী দারোগারও সাধ্য নেই, সামাল দেবেন। গত মাসে পাশের গাঁ হাটপাড়ায় চালে আগুন ধরিয়ে আসামী বের করে'ছিল। বংশী দারোগা পরে বলে গেছেন—বাবারও বাবা থাকে। আমি তো এতটা কাল সামাল দিয়ে এসেছিলুম, পারলুম না। আর হাটপাড়ার ও শালারাও মহা ত্যাঁদোড়। কতবার বলেছি, শোনেনি। নে, এখন মর্।

গাজনতলার চোখে সেই মরার আতঙ্ক। ছোটলোক-টোটলোক মানুষ সব। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। রক্তারক্তি হয়। মেঘের মতো গর্জে গালমন্দ করে পরস্পরকে। কিন্তু বাবুমশায়দের সামনে একেবারে কেঁচো। ওনারা চটলে পেটে পাথর বেঁধে পড়ে থাকা গত্যন্তর নেই। আর সেই বাবুমহাশয়রাও যমের মতো ভয় পান যেনাদের, তেনাদের এমন করে সশরীরে চোখের সামনে দেখলে পিথিমী আঁধার হয়ে যায়। ভুঁইকম্পে পা টলে। জিভ শুকিয়ে খড় হয়। হে বাবা স্যাংটেশ্বর, অবেলায় হঠাৎ এ কী উপদ্রু! আসরভঙ্গ, নেশাছুট, রা সরে না মুখে।

একটা হৃদয়হীন ভয়ঙ্কর শব্দহীনতার তলায় ক্ষীণতম একটা বিলাপ নেড়েচেড়ে। কে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

তারপর কে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে বলে—এ্যাই শুওরের বাচ্চা।

সঙ্গে সঙ্গে নড়াচড়া শুরু হয়। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কাজ থেকে ছিটকে পড়ে মূর্তিরা ছত্রভঙ্গ পালাতে থাকে। রুক্ষ ন্যাড়া চটানে পায়ের শব্দ ওঠে। ভারী জুতোর শব্দ ওঠে। ধুপ ধুপ ধুপ দুদ্দাড়·· ঝন ঝনাৎ। উল্টে যায় পাপড় ভাজার উনুন কড়াইসমেত। রসগোল্লার গামলা গাড়িয়ে

পড়লে বেচা ময়রা আকাশপাতাল আর্তনাদ করতে থাকে। সইদের মনোহারির রঙ ঝিলিমিলি বাজারের ওপর অজস্র হাতি বাঘ শুওর ও হরিণের পাল ছুটোছুটি করে।

—এই শুওরের বাচ্চা! আবার কে হুঁকরায় এবং বোরজে মশাইয়ের কাঁধে থাবা পড়ে। অমনি বোরজে মশাই ভাঁড়ের গলায় বলতে থাকেন—আমি কিচ্ছু জানিনে। মাইরি বলছি, আমি কিচ্ছু···আমার জামাই নয়, শালা···একশো শালা··মাইরি বলছি··তারপর গুঁতো খেয়ে অঙ্ক করেন এবং চুপ করেন।

ওদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে হাতি বাঘ শুওর ও হরিণের পাল। মন্দির থেকে বুড়ো নিমতলা, বুড়ো নিমতলা থেকে দীঘির পাড়, দীঘির পাড় থেকে কেয়াফণিমনসার ঝোপ অব্দি।

বস্তুত কী যে ঘটছে, কেউই বুঝতে পারছে না। হাতের রেখা অস্পষ্ট করেছে সন্ধ্যার ছাইরঙ, যখন বুনোপায়রার পালকের মতো দেখায় দিনের মরণদশাকে।

তাহলেও এতক্ষণে ঠাহর হয়েছে, শুধু 'ছিয়ার পর নোক' নয়, বংশী দারোগার দলবলও আছে। তাদের মাথায় লাল টুপিগুলো ঘুরপাক খেয়ে ভাসছে।

তারপর বংশীলোচন গাজনতলার মন্দিরের সামনে গেলেন। প্রণাম করে একাচিলতে মাটি কপালে ঘষে একটু হেসে বললেন—এবার কটা পাঁঠা পড়ল রে? কেউ জবাব দিল না। তাকিয়ে দেখলেন দুটো ঢাক সিংহের কাটা মুণ্ডুর মতো পড়ে আছে। বায়েন নেই। খাঁড়া পড়ে আছে হাড়িকাঠের পাশে। কামার নেই। বেতগুলো পড়ে আছে। সন্ন্যেসীরা নেই। আর দারোগাবাবুর পায়ের তলায় কাঁসি। বললেন—শালারা মানুষ, না ভূত? এ্যাঁ?

একে-একে ধরে নিয়ে আসছে সেপাইরা সঙসাজা লোকগুলোকে। সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে টর্চ জ্বালছেন বংশীলোচন। মুখে কিছু দেখছেন। খুঁজছেন।

—এ্যাই ব্যাটা! কে তুই?

—এজ্ঞে সুদাং।

—কী সেজেছিস?

—ডাক্তারবাবু এজ্ঞে!

—ডাক্তার! দারোগা খিক খিক হাসেন।

একটু সাহস পেয়ে সুদাং বলে—এজ্ঞে ফেমিলি পেলানিংয়ের সঙ দিচ্ছিলাম কি না!

—কী!! ফ্যামিলি প্লানিংয়ের সঙ? গিরিধারী, শালাকে এখানে বসিয়ে রাখো। আর তুই কোন ব্যাটা?

—আমি সার ন্যাড়া।

—ওটা কী তোর হাতে?

—লেজ সার।

বংশীলোচন লেজটা কেড়ে নিয়ে খড় ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই করেন। তারপর ফের খ্যা খ্যা করে হেসে বলেন—কী সেজেছিলি? বাঘ?

—না সার, হনুমান।

—এ ব্যাটা আবার কে?

—হুজুর, আমি তোরাপ আলি।

দারোগা তার জটাজুট আর দাড়ি ধরে টানাটানি করেন। তোরাপ খোলা গলায় বলে—ও বাঁপ, বাঁপজান গোঁ!

এবার দারোগা চিনতে পেরে বলেন—ও। তুই সেই ভূতের রোজা! ডাকাতদের বোমা সাপ্লাই করিস না আজকাল?

—না হুজুর, না। তোরাপ পা ছুঁতে হুমড়ি খায়। কিরে করে খোদা আর ন্যাংটেশ্বরের নামে।

—বোস্ এখানে। কথা আছে তোর সঙ্গে।

তোরাপ বসে থাকে রক্তছাইকাদার উপর। মড়ার মাথাটা কাঁধের ঝোলায় রাগে ফোঁসে না কি? নিশ্চয় ফোঁসে। তোরাপ টের পায় সেটা। মনে মনে মন্তর পড়ে। খ্—খাঁ এই দারোগার পেঁকে। কঁড়মড়িয়ে মচমচিয়ে খাঁ।

—তুই কে?

—আমি ঝুরুন গো। হেই দারোগাবাবু, চেনা মানুষ চিনতে ভরোম। ই কী কথা!

—কী সেজেছিস ঝুরুন? তোর মাথায় ওটা কী? বংশীলোচন মিঠে গলায় বলেন। ও ঝুরুন, হাতে লাঠি কেন?

ঝুরনডোমনী হেসে হেসে বলে—অমোৎ (রহমত) কাবুলীকে মনে পড়ে না দারোগাবাবু? আমি অমোৎ গো, অমোৎ।

—হুঁ, তুই কোন ব্যাটা ?

—হুজুর, আমি রামপদো বাগ্দী। সুরোপদর ছেলে হুজুর।

—তোর বাপ তো দাগী ছিল ?

—ছেল হুজুর। আমি দাগী নই। খাতা খুলে নিষ্টি দেখুন।

—ক হাঁড়ি গিলেছিস ব্যাটা ?

—হুঁজুর, বিরিঞ্চি আজকাল তেমন ঝরেন না। আগে মনিষ্যি তো বটেই, পাখপাখালি কাঠবেড়ালি অসের বন্নেতে ভেসে যেত। আপনি তো জ্ঞেনী বেক্তি হুজুর, ক্যানে এমন হল; বলুনদিকিনি ?

—চোওপ্।

—চুপলাম হুজুর।

—হুঁ শিব সেজেছিস দেখছি ?

—ওইটুকুনই পারি এঁজ্ঞে।

—বোরজে বাঁড়ুয্যের জামাইকে দেখেছিস ?

আবছা আঁধারে পণ্ডালের দল মুখ তাকাতাকি করে। বংশীলোচনের টর্চ সমানে আলো বিকিরণ করতে থাকে। কয়েক দণ্ড চুপচাপ থাকার পর রামপদ জোরে মাথা দোলায়।—বাবা ন্যাংটেশ্বরের ছামুতে বলছি, তেনাকে অনেকদিন দেখিনি। সেই যে অঘ্রুন মাসে একবার এলেন।

—এসেছিল নাকি ?

—এসেছিলেন বটে। কিন্তক, যতীনবাবু, চিকান্তবাবু, আপনার মশাই হরিরামবাবুরা বোরজে মশাইকে শাসালেন। বোরজে মশাই বললেন, জামাই তুমি পালিয়ে যাও। গণ্ডগোল করো না।

—থাম্। চৌকিদার কোথায় গেল ? চৌকিদার।

—আছি স্যার। পেছনেই আছি।

—সে ব্যাটা এসেছিল, খবর দিস নি কেন ?

—সন্ধ্যেবেলা এসেছিল শুনলাম, খবর দেব-দেব ভাবছি, আবার শুনলাম, কেটে পড়েছে।

—চুপ্ ভাঙখোর কোথাকার! বোস, দেখাচ্ছি মজা।

এই সময় গাঁয়ের দিক থেকে একটা হ্যাজাক আসছিল। বংশীলোচন ও তাঁর বাহিনী আলো দেখতে থাকেন। আলোটা এনেছে হরিরামবাবুর লোক। মন্দিরের বারান্দায় সেটা রাখা হয়। আরেকজন এনেছে একটা চেয়ার। বংশীলোচন খাপ্পা হয়ে বলেন—এখন সিংহাসনে বসব না।

তাহলেও আলোটা পেয়ে ভাল হল। দারোগা সিগারেট ধরিয়ে বলেন—তুই কে রে?

—আমি লাটু কুনাই এঁজ্ঞে?

—কী সেজেছিস?

লাটু হাউমাউ করে কেঁদে পা ধরতে যায়। সেজেছিল দারোগাবাবু। বরাবর তাই সাজে সে। খাকি পোশাকটার বয়স তার বড় ছেলের সমান। হ্যাটটারও তাই। এগুলোর মালিক ছিলেন কায়েতবাড়ির মটর সিঙ্গি। বন্দুকবাজ শিকারী ছিলেন তিনি বিলেখালে পাখপাখালি মারতেন। বুড়ো হবার পর ভিক্ষে করে এনেছিল লাটু। তারপর তো কবে মরেহেজে গেছেন মটর সিঙ্গি। সে প্রায় একুড়ি বছর আগের কথা।

—তুই কে রে?

—গোবরা দারোগাবাবু।

—মাগী সেজেছিস কেন?

গোবরা ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। তার হয়ে চিনাথ বলে—গাজনের দিন হুজুর। বাপপিতেমোর আমল থেকে আমরা সঙালী করে আসছি।

—চোওপ্। তোকে কে ফোঁপর দালালী করতে বলেছে? কে তুই?

—অধীনের নাম আজ্ঞে চিনাথ বাউরি।

—কোথায় থাকিস? কী করিস?

—হুইখানে আজ্ঞে। দীঘির পাড়ে একাদোকা থাকি। মাঠে জাগালী করে খাই।

—বোরজে বাঁড়ুয্যের জামাইকে চিনিস?

—না আজ্ঞে। বললাম তো, মাঠে-ঘাটে সম্বচ্ছর কাটাই। গাঁঘরের খবর জানতে পারিনে।

—পণ্ডিতের মতো কথা বলছিস কেন? তাড়ি গিলিস নি?

চিনাথ সবিনয়ে বলে—ছোটনোক মনিষ্যি আজ্ঞে। গিলেছিলাম বইকি। তাতে আজ বাবার গাজন। কিন্তুক মজাটা দেখুন, নেশা আপনাদের দেখেই চটে গেয়েছে। হিঁক...হিঁক...হিঁক

—দাঁত বের করিস নে।

—আচ্ছা হুজুর।

—আবার দাঁত বের করে!

—হুজুর অব্যেস। আজ বছরের শেষ দিন। হাসতে হয়।

—দাঁত ভেঙে দেব ভূতের বাচ্চা!

—হুজুর, আজ শিবের বিয়ের পরব। শিব বড়নোক শ্বশুরকে হেনস্তা করতে সঙ সেজে গেলেন। সঙ্গে আমরাও গেলাম। তাপরে হুজুর, বড় লণ্ডভণ্ড হুলুস্থুলুস হল। তাপরে··

বেটনের গুঁতো খেয়ে সে চুপ করে। হেঁটমুণ্ডে ঝুলন্ত গোঁফটা টেনে ছাড়াতে থাকে। বংশীলোচন অন্যেকজনকে নিয়ে পড়েন।···

মাঠের ধারে নিসিং পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি। অন্ধ হয়ে গেছেন ইদানিং। তবু কত বছরের অভ্যাস। নাতি-নাতনীরা হাত ধরে এনে বারান্দায় বসিয়ে দেয়। পা ঝুলিয়ে সতরঞ্জিতে বসে পশ্চিমের আকাশের দিকে মুখ তুলে থাকেন। হাতের মুঠোয় লাঠিটা খাড়া হয়ে থাকে সামনে। মনের চোখে সূর্যাস্ত দেখেন।

আজ ছিল গাজনতলায় ধুম। বাজনা হই হট্টগোল কানে আসছিল। হঠাৎ থেমে গেল তো গেলই। নিসিং পণ্ডিত বলেন—কী হল রে?

কেউ ধারে কাছে নেই। জবাব পেলেন না। তখন গলা চড়িয়ে ডাকলেন—পিণ্টুমণ্টুরা কোথা গেলি রে?

পিণ্টুমণ্টুরা নেই। কেউ যেন নেই বাড়িতে। আরও দু-চারবার ডেকে তেতোমুখে বললেন—সব মরেছে, সব্বাই। তারপর কান পেতে বসে আছেন তো আছেন। টের পাচ্ছেন একটা কিছু ঘটেছে গাজনতলায়। এমন হঠাৎ সব নিঃঝুম হয়ে যাবার কথা তো নয়।

কতক্ষণ পরে পায়ের শব্দ শুনে বলেন—কে?

—আমি সল্লা পণ্ডিতমশাই।

—সল্লা মানে?

—দুলেপাড়ার সল্লা গো! বিল থেকে আসছি।

—ও, সরলা। মাছ পেলি রে?

—আর মাছ পণ্ডিতমশায়! পেরান নিয়ে ডটস্থ। সেই দুপুর থেকে লুকিয়ে ছিলাম বেনার জঙ্গলে। এতক্ষণে পালিয়ে আসছি। বাবা রে বাবা। মিনসেদের বিলখালেও মরণ নেই গা!

নিসিং পণ্ডিত গলা চেপে বলেন—কী, কী?

—আবার কী? ছিয়ারপি বলেই মনে হল।

—বিলে কী করতে গেল বল্ তো ?

—উদ্ধব গরলার সঙ্গে দেখা হল। বললে, বোরজে মশায়ের জামাই নাকি কাল থেকে ওখানে লুকিয়ে আছে। ছিরু ঘোষের বাগানে ওনাকে কে দেখতে পেয়েছিল। পেয়ে খবর দিয়েছিল গাঁয়ে।

—তারপর, তারপর ?

—গাঁ থেকে নাকি সেই খবর গেল থানায়। তাপরে যা হবার হল। চণ্ড মিনসেদের।

নিসিং পণ্ডিত মাথাটা একটু দোলান। বলেন—হুঁ। বোরজেটাও মরবে। তখন বলেছিলাম, যেখানে-সেখানে মেয়ে দিসনে বোরজে! কোথাকার কে, জাত-পাত চেনাপরিচয় কিচ্ছু ঠিক নেই।

হ্যাঁ গা পণ্ডিতমশায়, বোরজেবাবুর জামাই নাকি জেহেলখানা ভেঙে পালিয়ে এসেছে ?

—হুঁ তাই শুনেছি।

জেহেলখানায় ঢুকেছিল ক্যানে বাপু ? ঢুকল যদি পালাই বা ক্যানে ?

—সরলা, তুই গোমুখ্যু। খিকখিক করে হাসেন নিসিংপণ্ডিত।

—বলুন না বাপু, কী করেছিল জামাইবাবু ?

—পার্টিফার্টি করত। বুঝলি ?

—ও, পার্টি। বুঝলাম বটে।

—কী বুঝলি ?... নিসিং পণ্ডিত নড়ে চড়ে বসেন। ফের বলেন—বেশ। যা বুঝেছিস, বুঝেছিস। এখন বাড়ি যা। ত্থাখ্ গে, তোদের গাজনতলায় কী যেন হচ্ছে।

সরলা দুলেনীর কাঁধে বেসাল জাল। লম্বা বাঁকা দুটো বাঁশে আটকানো। মনে হয় বিশাল ডানাওলা পরী এল পশ্চিমের বিল থেকে উড়ে। সাঁৎ করে উড়ে চলে গেল ফের।

আবার নিঃঝুম চুপচাপ অবস্থা। কতক্ষণ পরে আবার পায়ের শব্দ হয়। নিসিং পণ্ডিত বলেন—পিন্টু মন্টুরা এলি নাকি রে ? গাজনতলায় কী হচ্ছে বল্ দিকি ?

কোন জবাব না পেয়ে ভাবেন কুকুরটুকুর হবে। তারপর আপনমনে বলেন—হবেটাই বা কী ? সঙ হচ্ছে, সঙ। গাজনতলায় যা হয়।

কবিতা সিংহ



সব হিসাবের বাইরে

বেরোতে যাবে কোত্থেকে হুড়মুড় বৃষ্টি। সত্যেন সাতদিন ধরে একটু বেরোনোর জন্যে কী প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিছুতেই বেরোনো হচ্ছে না। তার মনে হতে লাগলো এবার সে ফেটে ছিঁড়ে পড়বে। পাতলা একটা সেলোফেনের মোড়কে যেন জড়ো করা আছে তাই; আসলে সে কবেই টুকরো হয়ে গেছে তার ঠিক নেই।

সাতদিন আগে সে নিজের জন্যে হাওয়াবদলের ব্যবস্থাপত্র লিখেছিল। এমন কিছু নৈনী দার্জিলিং না মাত্র একটু মা আর বাসন্তীর কাছে যাওয়া। তাও একটা না একটা কারণে কিছুতেই হচ্ছে না।

বৃষ্টিটাও ভাংচি দিল। নিজের মনে হাসলে সত্যেন।

বিনোদ মোহনরা আজকাল তার ব্যাটারিডাউন মেজাজ নিয়ে ভাবনা করে। যদি একবার মা বা বাসন্তীর কাছে পৌছানো যেত, তাহলে দেখিয়ে দিত সত্যেন টগবগে টপগীয়ার মেজাজ কাকে বলে। সেই ভাবেই প্রাজমা স্রোত থেকে জীবনী জোগাড় করে এমন কি বিকোভস্কির মত সুখী সুখী মুখের রেডিও ফটো সমেত 'আমি এখন চমৎকার বোধ করছি', এই বাণীটি অবধি পাঠানো কত সহজ।

এক মাস হল আর. এস. লক্ষণ সমাদ্দার একটা না একটা বাহানা করে ছুটি বাড়াচ্ছে। আর সিনিয়ার হাউস সার্জন হিসেবে দায়িত্বে তার পিঠ কুঁজো হবার জো। ঠিক সময় বুঝে এখনই ডাক্তার কম, সিসটার বাড়ন্ত। ফলে সত্যেনের দেহ মন এখন তার নাগালের বাইরে। মন বিকল, দেহ স্বয়ংচল। সত্যেন ভেবেছিল দেহটা একটা মুণ্ডহীন ধড়ের মত একসময় না একসময় রিফ্লেকস অ্যাকসনের দম ফুরিয়ে থামবে। এখন দেখছে ব্যাপারটা অত জল পড়া, পাতা নড়ার মত সহজ-পাঠ না। অসম্ভব 'ফেটিগে'র পর মনও

একটা অস্বাভাবিক চলন জানে। তখন দেহের ওপর সে মায়াহীন প্রেতাত্মার মত ভর করে। আসলে মন সম্বন্ধে মানুষের কোনো ধারণাই নেই।

সত্যেন যখন ছোট ছিল, তখন নিজের মনকে ছোট্ট একটা পিন-হোল ক্যামেরার মত ভেবেছে। একটু বড় হলে শতাধিক প্যাটার্ন করতে জানা কুড়ি নম্বরের একটা মেকানো বাক্স।

এমন কি যখন ফাইন্যাল এম-বি দিচ্ছে, তখনও মনকে তার একটা হাল মডেলের রোটারি মেশিনের চেয়ে কিছু বড় মনে হয় নি—যে সাধারণত রোজ ভোরে শহর সংস্করণ ছেড়ে দেয়, সারাদিন অনর্গল ছেপে যায়, আবার প্রয়োজন পড়লে এসবের ওপরও দেহ মুচড়ে বিশেষ সান্ধ্য-সংস্করণও বের করে দিতে পারে।

এই ত দিন সাতেক আগেও আটটা অপারেশন অ্যাটেণ্ড করবার পর যখন তার অসম্ভব হাত কাঁপছিল, তখন সিসটার সরোজিনী তাকে এক কাপ চায়ে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে খেতে দিলে। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস কেসটায় প্রথম ইনসিসন দেবার পর সেই সত্যেনই ঝরঝরে স্টেডি। তখনও কি ধৃষ্টতা! মন নামক মেসিনটাকে সেদিন সে একটা মহাকায় ব্ল্যাস্ট ফারনেস ভেবেছিল। তার অস্পষ্ট মনে হয়ে থাকবে ফারনেস জ্বালাতে জ্বালাতেই বহুদিন যায়। কিন্তু একবার থাই থাই জ্বলে উঠলে তখন আর চট করে নেবানোও ভারি শক্ত।

এখন সত্যেনের কাছে এ সব উপমাই অকিঞ্চিৎকর।

গত এক মাস, বিশেষ করে এই সাতদিন সত্যেন পাগলের মত অহোরাত্র কাজ করেছে। প্রথম তিনদিন নোভ্যালজিন, সোনেরিল, এমনকি গোপনে পেথিডিন ইনজেকশন নিয়ে রাতের খানিকটা সময় সে নিজেকে অসাড় রাখবার চেষ্টা করেছিল। গত চারদিন ড্রাগ অ্যাডিকসনের ভয়ে বিনোদরা সেটুকু অসাড়তার সুখ থেকেও সত্যেনকে বঞ্চিত করেছে। ওই করে করে খগেনটা রোজ রাতে ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করে বলে সত্যেনকে নিয়েও ওদের আতঙ্ক।

গত এক মাস ধরে সত্যেন ক্রমাগত চা কফি ব্র্যাণ্ডি ইত্যাদি ঘুম-তাড়ুয়াদের আস্কারা দিয়েছে, ফলে ঘুম এখন ফস্কে নাগালের বাইরে।

এবং এবার সত্যেন, মন নামক অত্যন্ত বিশাল অজানা যন্ত্রটার সুইচ বোর্ডটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে।

বোর্ডটা আকাশের মত বড়। সুইচগুলো তারার মত অগুণতি। সুতরাং যতই ছুঁয়ে চিনতে চাক, মূল যন্ত্রটার কোণ, তল, পিস্টন, রোলার, কম্বাশ্চন চেম্বার কিছুই আঁচ করা তার পক্ষে সম্ভব না। আর সবচেয়ে আশঙ্কার কথা যন্ত্রটা যতটা চালু করবার তার চেয়ে বেশি চালু করে দিয়ে এখন সত্যেন দেখছে, মনচালানী কোম্পানী কোনো এক্সপার্ট পাঠায়নি। ফলে সুইচ বোর্ডে গোলমাল হয়ে গেছে। কণ্ট্রোল বোর্ডে বিরাট আরবিট্রারি ডায়ালের কাঁটা বিদ্যুৎ বেগে এদিক ওদিক করছে।

ডাক্তার হিসেবে সত্যেন নিজেকে যে প্রেসক্রপশন দিয়েছিল, রুগী হিসেবে তা চালিয়ে যেতে অপরাগ হল। যেমন আজ সব ইচ্ছে শিকেয় তোলা এই শত্রুপক্ষ বৃষ্টি।

মাত্র একটা চারমিনার জিয়ানো ছিল! ভেবেছিল .গট পেরিয়ে মুক্ত পৃথিবীর স্বাস্থ্য কামনা করে ধরাবে। এখন হাসপাতালের করিডোরেই সেটার মুখ পোড়ালে: মর্গের চারপাশে মেহেদির বেড়া বৃষ্টিতে ভিজে সবুজ রাঙতা। হাসপাতালের একনাগাড় শুয়োর-মাংস আবহাওয়া। সেই এমার্জেন্সীতে খগেন আর রেণু নার্সের ফিসফিস, বারান্দায় 'এখানে পুরুষ রোগী বসিবেক' লেখা বেঞ্চ ওয়ার্ড বয় দুটোর পা 'V' করে ঘুম, স্ট্রেচার চারটের দিব্যি আরাম জিরেন····

রহমান আর্দালির ভিজতে ভিজতে কেটলিতে চা নিয়ে আসা।

সত্যেন বুঝতে পারলে রাধাচূড়া গাছটা যেভাবে আকাশে অক্টোপাশ, হুই হুই বিদ্যুৎ, মেঘে মেঘে বেতারের যান্ত্রিক গোলযোগের ঘড় ঘড় তাতে এই বৃষ্টি এ-রাতে আর ধরছেনা।

তার চেয়ে এমার্জেন্সীতে খানিকক্ষণ বসলে হয়ত মন খারাপ সারানো'র কোনো ব্যবস্থা হলেও হতে পারে।

এমার্জেন্সীতে ঢুকেই দপ করে জ্বলে উঠলো সত্যেন।

—শালা, আবার পেথিডিন নিচ্ছিস?

ফোলা ফোলা চোখে তাকালে খগেন। কিছুই যায় আসে না, এমনি একটা ফাঁকা দৃষ্টি। এপ্রন কোটের খোলা-বোতাম বুকের তলায় সুন্দর শরীরে স্যাণ্ডো গেঞ্জি। গলায় কালো জেড্ পাথারের লকেট লাগানো চেন। সব মিলিয়ে খগেনকে গালাগাল দেওয়াও বৃথা মনে হল।

রেণু নার্স শুধু অপ্রস্তুত গলায় বললে, মুখার্জি যেন আবার ভাববেন না

যে, আমি দিয়েছি। নিজেই নিচ্ছিলেন, পাছে নিডল ভেঙে ফেলেন তাই শুধু পুশ করে দিচ্ছিলাম।

—তুমি ত শালা এখুনি জ্ঞানহারা চিৎ হয়ে পড়বে, তারপর কেস এলে? বলতে না বলতেই অ্যাম্বুলেন্সের চেনা গর্জন শোনা গেলে।

ছুটো উজ্জ্বল হেড্ লাইটে বৃষ্টির ঝাপটা খেতে খেতে অ্যাম্বুলেন্সটা একটা বিশাল সাদা ষাঁড়ের মত গেটটাকে গুঁতোচ্ছে। রামধারী সিং গেট খুলে দিচ্ছে, আর্দালি ছুটো স্ট্রেচার নামালে। হতাশায় বিরক্তিতে সত্যেন খগেনের দিকে তাকালে।

—শালা, তোর বউ তোকে জ্বালাবে, আর তুই আমাদের জ্বালাবি। যা জ্ঞান থাকতে ওপরে চলে যা।

যার অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে তার জ্ঞান নেই। সত্যেন এখন তাকে নিয়েই পড়ল।

পা কাটতে হবে। সত্যেন এমার্জেন্সীতে এণ্টি করিয়ে সোজা অপারেশন থিয়েটারের দিকে চলল। বাইরে সমানে বৃষ্টি।

মা আর বাসন্তীর জন্তে ফ্রণ্ট যাত্রী সৈন্তের মত ছুটো ফ্লাইং কিস্ ছুঁড়ে দিয়ে সত্যেন হাসপাতালের দিকে একটা অ্যাবাউট টার্ণ দিলে।

অপারেশন থিয়েটার থেকে এমার্জেন্সীর দূরত্ব একেবারে কর্কট থেকে মকরে। এক একটা ওয়ার্ড যেন আগের ওয়ার্ডের চেয়ে অনেক বড়।

অনন্ত কাল ধরে হাঁটছে সত্যেন।

উরুর মাস্‌লে স্ট্রেন। সিঁড়ি। সামনে চড়াই। পেশীর ভিতরে গ্লাই-কোজেন ভেঙে শক্তি জল উত্তাপ কার্বন হচ্ছে। আর ঘামের ক্বাথ।

তারপর সেই সিঁড়ি, প্যাসেজ, করিডোর, সেই দরজা, সেই অপারেশন থিয়েটার, সেই অনন্ত কাল ধরে দেখা অভিজ্ঞ নার্স সরোজিনী।

সরোজিনী ইতিমধ্যে লোকটাকে টেবিলে ফেলেছে। ভাবলেশহীন মুখে বললে, ডাক্তার মিত্রকে ফোন করেছিলাম। বাড়ি নেই। একটা অপারেশনের সময় যদি পাওয়া যায়! তার ওপর অ্যানাস্থেটিস্ট শম্ভুবাবুও খেতে গেলেন। কি বলব বলুন সেই আড়াইটে থেকে এসেছেন বেচারী।

—এদিকে এর ত দেখছি বিরাট ব্যাপার। যা করবার এখুনি না করলে নয়।

—ডাক্তার নেই অ্যানাস্থেটিস্ট না, চমৎকার। একা এতবড় দায়িত্ব··

সত্যেন শার্টের হাতা গুটিয়ে বেসিনের কাছে এল।

—অ্যান্টিটিটেনাস দিয়েছেন?

—জ্ঞান নেই যে। কি করে জানব ছ-মাসের মধ্যে নিয়েছে কিনা?

রবারের গ্লাভস গলিয়ে সত্যেন লোকটার কাছে এল।

এমার্জেন্সী পর্যন্ত যে এসেছিল সে একজন পথচারী।

—দু পা চাপা পড়েছে। প্রথমে বুঝতে পারেনি স্যার, তাই খানিকক্ষণ কথাও বলেছিল। বলেছিল স্যার ওর নাম বিলাস দোসাদ। শিবু মিস্ত্রী গলিতে স্যার থাকে। ঠেলাওয়ালা।

কালো, দাড়ি না কামানো, চোখ বোজা। আনুমানিক বয়স পঁয়ত্রিশ, দাঁত নষ্ট একটা। নির্বোধ অকিঞ্চিৎকর। নাড়ি প্রায় নেই।

—আমি স্টার্ট করছি সিস্টার।

—রিস্ক নেবেন মুখার্জি?

গ্যাস দেবার কানেকটা পরখ করতে করতে সত্যেন বললে, নিলে তবুও বাঁচতে পারে, না নিলে যে একদম বাঁচার চান্স নেই, সিস্টার। অতএব সত্যেনের কাঁধে এপ্রন কোট, মাথায় শাদা টুপি, নাকে আবরণ বেঁধে দিলে সরোজিনী।

তখনি লোকটা একবার পিটপিট করে তাকালে। তাকে তখন কেউ দেখছিলনা। ঠিক পেটের ওপর বড় ধাতুর শেডের মধ্যে একরাশ সাদা বাল্ব, সাদা পোশাক, নিঃশব্দে চলা মানুষ। এ সব দৃশ্য লোকটা মরণোত্তর বলে ভাবেনি। আচ্ছন্ন চেতনার ভয়ে তার গলা দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরোতে সত্যেন ফিরে তাকালে। চেতনাকে প্রাণপণ আঁচড়ে লোকটা অস্ফুট ঠোঁট নাড়লে। বোধহয় ওর বক্তব্য ছিল,

—হম্ কো মত ও টনে দোগা বাবুজি···

পার্ট-টাইম ঈশ্বরের মত সত্যেন তার কপালে হাত ঠেকিয়ে মুখ নামালে।

দায়িত্বে তার ঘাড় ভেঙে যাচ্ছে। এই ত এখুনি, কোনো দিন দেখিনি যাকে তার প্রাণ রাখার ভার গ্রহণ করে ভারী হয়ে গেছি। আমায় সব চেষ্টা দিয়ে একে বাঁচাবোই।

সত্যেনের কথা হয়ত লোকটা বুঝতে পারলে না। নাড়িও প্রায় নেই। তবু আচমকা চেঁচিয়ে উঠল সত্যেন, জলদি। জলদি!

রক্ত, স্যালাইন, অক্সিজেনের ভার সরোজিনীর হাতে সামিল করে সত্যেন গ্যাস দিলে।

দশ, নয়, আট, সাত, পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক।

অপারেশন শেষ হবার আগেই লোকটা টেবিলেই শেষ হল।

সত্যেনের একার হাতে, এই প্রথম একজন, অপারেশন টেবিলে মরে গেল। গ্লাভস দুটো বেসিনে ফেলে দিয়ে সত্যেন রিপোর্ট লেখার ফর্মটা টেনে নিলে। নার্স সরোজিনী মর্গে ফোন করছে।

আজ সকাল থেকে সত্যেন ছটা ডেথ রিপোর্ট লিখেছে। হাত কাঁপেনি। কিন্তু ঐ যে ডেথ্ অন অপারেশন টেবল। সত্যেনের হাত সরছিল না। সে যে লোকটাকে কথা দিয়েছিল।

যখন গ্যাস দেয় তখন নিজ্ঞানের ওপারে পৌঁছে দেবার আগে সে যে ঈশ্বরের অনুপস্থিতির সুযোগে ঈশ্বর সেজে লোকটাকে ফিরিয়ে আনবে বলেছিল।

কিন্তু অচৈতন্যের অপেক্ষাঘরে মাত্র গচ্ছিত লোকটাকে ফিরিয়ে আনতে পারলে না সত্যেন।

যখন অনভ্যস্ত হাতে গ্যাস দেয়, তখন মাত্রাজ্ঞান যতদূর সম্ভব ঠিক ছিল। ভলিউম ঠিক ছিল প্রায় শেষ পর্যন্ত। তবে হঠাৎ হার্ট থেমে গেল কেন?

অলিন্দ নিলয়ের সেই সুবিখ্যাত তিনপাল্লা দু পাল্লা দরজা?

আমার কোন ত্রুটিতে?

লোকটাকে নিজ্ঞানের মধ্যে আমিকি আমার ঘুমের অবিকল বে-আন্দাজ ঠেলে দিয়েছিলাম? যতটা দিতে হয় তার চেয়ে বেশিদূর?

আমার জন্যেই কি সে, যার বিলাস দোসাদ নাম, টায়ারের চটি, তেলচিটে বালিশ, টিনের কৌটোয় কিছু দোক্তাপাতা, কয়েকটা পাকানো এক টাকার নোট, দেশে একটা গরু কটা বালবাচ্চা রেখে চলে গেল।

সত্যেন যেন দেখতে পেলে।

তার চোখের সামনে ভীষণ উদ্‌ভ্রান্ত বেগ তাকে ঠেলা দিয়ে একটা অন্ধকার টানেলের মধ্যে পাচার করে দিচ্ছে। লোকটা পাঁচ ফুট থেকে এক ফুট হয়ে পরে শূন্য হয়ে মিলিয়ে গেল।

তার দৃশ্য শেষ হয়ে যাবার পরও তার ধ্বনি টানেলের পাথরে প্রতিধ্বনিত হতে হতে সত্যেনের কানে এসে লাগছে।

জি বু-বা গা-হো নে-ট-ও-ল কো-মহ—

সত্যেন নিমেষের জন্তে ভারী হয়ে টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়তেই টেবিলটা তার বুকের তলায় সুইচবোর্ড হয়ে গেল। বুকের চাপে আরো কটা বাড়তি যন্ত্র চালু। সত্যেন চমকে উঠে বসল।

সরোজিনী কিছু একটা বুঝতে পেরেছিল।

—বাইরে হাওয়ায় দাঁড়ালে বোধহয় ভালো লাগবে, মুখার্জি।

সত্যেন সরোজিনীর চোখের আড়াল হয়ে বাঁচল।

বাইরের বিদ্যুতের আলোয় সকালে পড়া বাসি মোড়ানো কাগজটা আবার খুলে ধরলে সত্যেন। বিকোভস্কি আর ভ্যা লেন্টিনা হাসি হাসি মুখে এখন মহাকাশ থেকে ছবি পাঠাচ্ছে।

যেন বাসে চড়েছে এই ভাবে সত্যেন খবরটায় চড়ে বসল কিংবা আগেই সে এই বেগের মধ্যে ছিল। শুধু বেগ সম্বন্ধে সচেতন ছিলনা

মহাকাশচারীর সঙ্গে তার মাত্র এইটুকুই তফাৎ।

লোকটাকে সময়ের আগেই বিনা বর্মচর্মে, বিনা পরিচয়পত্রে সে কোথায় পাঠিয়ে দিলে। যদি তা চাপহীন মন্থর শূন্যের অবিকল হয়। আহা, তার রক্ত তবে হাজার ডিগ্রী উত্তাপে ফুটতে ফুটতে দেহ ফাটিয়ে বেরুচ্ছে। নিজের মনে হাসলে সত্যেন।

দেহ ত মর্গে; তবে আবার ভাবনা কি? যত সব বাজে ভাবনা।

তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সত্যেন সেই ভয়ংকর ব্যাপারটা লক্ষ করলে।

তাঁর ঘড়িটা অসাধারণ; হ্যাঁ, অ-সা-ধা-র-ণ খারাপ হয়ে গেছে। ডায়ালটা কেলেংকারী কাণ্ড বাধালে। তার বিস্ফারিত চোখের সামনে খুব কাছে এসে, খুব দূরে গিয়ে, খুব ছোট হয়ে, খুব বড় হয়ে দড়াম করে ফেটে গেল বোধ হয়। সত্যেন 'এক' থেকে 'বারো' পর্যন্ত সংখ্যাকে ফোয়ারার মত সামনে উঠতে পড়তে দেখলে। ঝাঁক ঝাঁক জোনাকির তৈরী অতিকায় কুণ্ডলী পাকানো সাপের মত তাদের নিজেদের মধ্যে পাক খেতে দেখলে। কেলিডোস্কোপের প্যাটার্নের মত তারা ক্রমাগত আপনাদের চেলে সাজাচ্ছে। সত্যেন সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কর মধ্যে চলে গেল। পায়ের তলায় লাল মাটির রাস্তা নেই। অসংখ্য 'উদাহরণ মালা' খচ খচ করছে। সত্যেন ভাত খেতে পারলে না।

একরাশ 'এক' এর মত ভাত, পাঁচের মত চিংড়ি মাছ। দরজা খুললে— থার্ড ব্র্যাকেট। বিছানায় বেড-কভার নেই। বাঁদি-পোতার চৌখুপি কাটা তোশকটা অঙ্কটাকে আরো জটিল করে তুলেছে। সত্যেনকে এখন প্রত্যেকটা ছোটো বর্গক্ষেত্র, আর মূল আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে। আধ— ছড়ানো মড়ার মাথার মত এক পাট খোলা আলমারির ভিতর জটিল নানা রকমের স্কোয়্যার, প্যারালালোগ্রাম, পেন্টাগ্রাম হয়ে বই কাপড়-চোপড়, শঙ্কুর মত সিলিণ্ডারের মত কতকগুলো মদের বোতল।

সত্যেন আবার দেখলে। আবার আবার আবার দেখলে। চোখ রগড়ে দেখলে।

কাঁচের তলায়, ডায়ালে তার ঘড়িটা অন্যরকম ঘুরছে। সর্বনাশ, সেকেণ্ডের কাঁটাটা দেখাই যায়না। বন বন করে ঘুরছে। ঘণ্টার কাঁটা মিনিটের বেগে। (কি কাণ্ড! তাহলে কি ক'দিন মানে চব্বিশ মিনিট ?)

সত্যেন ঘড়িসুদ্ধ হাতটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখলে। দেখবে না। কিছুতেই দেখবে না। ডায়ালটা তবু সেই কাঁকড়ের মত তার দৃষ্টি কামড়ে মস্তিষ্কের ভেতর নিজের বেগটা সঞ্চারিত করে যাচ্ছিল। চোখ বুজেও রেহাই নেই। ডায়াল চোখের পাতা পিছনে রেখে কনীনিকাকে চ্যালেঞ্জ করছে।

তখনি আউটডোরের আর্দালিটা সত্যেনকে ঠেলা দিলে।

আউটডোর খুলবেন না, স্যার! আটটা বাজে।

—আটটা ?

আগের দিনের চিন্তার চারপাশ দিয়ে সত্যেন স্পুটনিক-অবিকল ঘুরে এসে নিজের মনেই মাথা নাড়লে।

তাই ত সময় কই ? ঘুমোবে কখন ? বারো মিনিট বারো ঘণ্টা যে। কিভাবে সাঁ সাঁ করে দিন রাত্রি কাটছে। কি তাড়াতড়ি সময় সরছে। এর মধ্যে কখন মার কাছে যাওয়া, বাসন্তীর কাছে যাওয়া, W B M S পরীক্ষার জন্য দুশ্চিন্তা, রাইটার্স বিল্ডিং-এ একটা তদ্বির, থানায় অ্যাপ্লিকেশন, দিল্লীতে ট্রেজারী চালান সমেত অজুটি, বাবার ছানি কাটানো, জীবনে কিছুই হলনা। নো ব্যাকিং। শালা এখনো দেড়শো টাকা অ্যালাওয়েন্সে ডাক্তার চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোয়। তার ওপর এই ঘড়ির ঝামেলা। সাঁ সাঁ টাইম। সব ব্ল্যাংক, সংখ্যা উজার। ডট্, কমা, সেমিকোলন ; নোট্

অফ এক্সক্র্যামেশন, ইন্টারোগেশন পাস করছে। ঘড়িটা নিদেন এমার টাইট না হলে কানের কাছে ডায়াল আনলে কানের চুল নড়ত।

ঘড়িতে আটটা!

কবেকার আটটা কে জানে?

চোখের চারপাশে ম্যাপের রেলপথের মত কাল কাল শিরা। শরীর কষে শুকনো। পরতে পরতে টক্সিন। দাঁতে পিজ বোলাশে মদ্দল, কিডনি নিংড়োলে খানিকটা জ্বাল ধরা হলুদ প্রস্রাব বেরোবে। সত্যেন ভয়ে দাঁত মাজলে না, মুখ ধুলে না, তাতে আবার পুরো একটা দিন যাবে, তখন আবার দু'দিনের জন্য রুগী দেখে মর। ঘড়ি যে রেটে চলেছে। এসব ভাবতেই তাও সত্যেনের পুরো একটা দিন কেটে গেল। ঘড়িতে পরদিন ন'টায় সত্যেন রুগী দেখতে নামলে।

এমার্জেন্সীতে কি অসম্ভব ভিড়। বিনোদ সত্যেনকে দেখেই কেমন যেন তটস্থ হয়ে গেল।

—তুই বরং একটু রেস্ট নে না সত্যেন। তোকে খুব টায়ার্ড লাগছে।

সত্যেন তখন কটা মাথা ড্রেস করে ফেলেছে।

বিনোদ সকালের কাগজ পড়ছিল:

"ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভার সকাল আটটা চল্লিশে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি এখন চমৎকার বোধ করিতেছেন। শান্তিপূর্ণ নিদ্রাকালে তাঁহার নাড়ীর গতি ছিল মিনিটে বাহাত্তর হইতে চুয়াত্তর।

এত লেপ্রসি কেস্ এখানে কেন?

—ষোল বছরে হয়েছে উনিশ বছরে দেখালেন, ক্যান্সার ক্রে করতে পারে কিন্তু।

—'সিস্টার আপনার ইকুইপমেন্ট।'

—কাঁদেনা, পুরুষ মানুষ কাঁদছেন কি মশাই!

—এঃ, চোখটা একেবারে ঝুলে পড়েছে রে! কি সাইকেলের স্পোক?

—ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের নতুন লেডি ডাক্তারকে দেখলে না মাইরি প্ল্যানিং ফ্ল্যানিং মনে থাকে না আর!

—ও-ই ত গ্যাড়াকল, নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাওয়েন্স দেবেনা বলছে ভাই।

—কাল একটা লোক ভাই টেবিলে মরল। আইফে ফার্স্ট। এর আগেও হয়েছে। সে সব বারে দায়িত্বের একটা ভাগাভাগি ছিল।

এবার সব এই ঘাড়ে। বলতে বলতেই সত্যেন একটা কৈফিয়ৎ পেয়ে গেল।

পৃথিবীতে কোথাও কোনো একটা বিন্দু ঠিক করে নিয়ে আমারা সেখানে পৌছতে চেষ্টা করি। তার সঙ্গে একটা সময়ের যোগসাজস আছে। লোকটা যোগসাজস ঘটবার আগেই বোধ হয় বিন্দুটায় পৌছতে চেয়েছিল। ভেবেছিল এই বিন্দুটা এগিয়ে রাখলে পরের বিন্দুটাও এগিয়ে থাকবে। এ ভাবে সময় সংক্ষেপ। কিন্তু ভালো ছাত্র ছাড়া কি ডবল প্রমোশন হয়? যদি ব্যাপারটা এই হয় তাহলে—কাঁধ ঝাঁকালে সত্যেন, তাহলে দায়িত্ব তার নয়।

—বুঝলে টেক্‌অফেরও যেমন একটা হিসেব রাখতে হয় ল্যাণ্ডিংয়ের ও তেমনি। অক্ষ-দ্রাঘিমার কম-বেশী হলে প্রাণ যেতে পারে তা জানো।

কিন্তু পরম লজ্জার কথা এই যে লোকটা কোন কৈফিয়ৎ চায়নি। সে সমানে তার অভ্যন্তরে, নেপথ্যে কোথাও এতক্ষণ ফ্যাশ্‌ ফ্যাশ্‌ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আর সত্যেন তাকে কৈফিয়ৎ নং এক, কৈফিয়ৎ নং দুই, কৈফিয়ৎ নং তিন তৈরী করে শুনিয়ে যাচ্ছিল।

—হয়ত তোমার জীবনীশক্তি ছিল না।

—হয়ত লিউকোমিয়া ছিল রক্তে।

—নিয়তিই বা না মানি কেন?

—কম পরমায়ু।

সব যুক্তি জোলো মনে হচ্ছিল অবশ্য।

অবশ্য কিছুটা পরে সত্যেন তার মেরুদণ্ডকে আবার কঠিন হতে দেখলে। লোকটার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে করতে সত্যেনের মনে হল ওই নির্দিষ্ট বিন্দু আর সময়ের যোগ-সাজসের ভুলেই আসল গণ্ডগোল।

এক সময় পৃথিবী বেশী ছিল। মানুষ কম। সব মানুষ সেদিন রাজা। রবিনসন ক্রুশো। মানুষ প্রতি কত জমি। এখানকার মত না। জীবিত অবস্থাতেও এখন টলস্টয়ের সেই মর্মান্তিক তিন হাত জমির গল্প প্রকৃত। জমির সঙ্গে খাদ্যের সঙ্গে মানুষের বাড়ন্তহারের সঙ্গে তখন থেকেই গতি আর সময় একটা আঙ্কিক সম্বন্ধ রেখে গেছে।

তারপর মানুষ বাড়ল, জমি কমল, তখনি গতি বাড়ল।

এখন কি অবস্থা। পৃথিবী একেবারে কাটো-কাটো। এর পর সমুদ্র সেঁচে

জল তুলে স্পেসের রিজার্ভয়ারে রাখতে হবে। ওখানে নগর বলে যাবে। একটি বিন্দুর জন্যে হাজারো আবেদনকারী!

পৃথিবী তার দেহকে দারুণ ভাড়া খাটাচ্ছে।

তোমার এখানে আসবার আগে আমার এখান থেকে যেতে হবে। তুমি সেখান থেকে সরে গেলে, তবে আর একজন। ফলে গতি। যানবাহন। মোটর ট্রেন, এরোপ্লেন জেট্ রকেট। সব ছোটো। কোথাও বাড়তি নেই। রবিনসন ক্রুশোর পূর্বপুরুষেরা দিন কেটে মাত্র দুটো করেছিল। সূর্য আর চাঁদের রাজত্ব। তারপর সেই দিন চারটে, আটটা, ষোলটা, বত্রিশটা। এখন এমন স্লাইস যে ডালটনও রসায়ন বিদ্যার ঐতিহাসিক মিউজিয়ামে। বিভাজ্যতা ইলেকট্রন প্রোটন ভেঙে পজিটিভ নেগেটিভ শক্তিকেও আক্রান্ত করেছে। যেন চর্ম চক্ষে দেখলে সত্যেন।

লোকটাকে অংকটা বোঝালে হত।

ওর যখন অকুস্থলে যাবার কথা তখন এলে সে দিব্যি ঠেলা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে পেরিয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে একটু আগে গিয়ে পড়েছিল; বাসটার তখনি সেখানে আসবার কথা।

—সত্যেন খেতে যাবিনে? বারোটা বাজল।

—এইত চা খেলাম আবার ভাত?

—চ, চ পাগলামি করিসনে। দাঁড়া, বাসন্তীকে ফোন করে দিচ্ছি, এসে তোমায় ঠিক করে দেবে।

বিনোদের সঙ্গে এমার্জেন্সীতে পেরোতে সত্যেনের মাথা ঘুরে উঠল। হবে না? এভাবে সময় মাথার দুপাশ দিয়ে গেলে ব্যাঘাত হবেই। চা, ভাত, চা, ভাত, আবার চা আবার ভাত। সর্বনাশ। ক্যালেণ্ডারটা অকালপক্ক হয়ে গেল। ওটার এবার কলপ দরকার; কি তাড়াতাড়ি পাতা পাকছে বাব্বা। তার ওপর যদি আবার সেই পুরানো আমলের মত ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে হয়ত ঘুম ভেঙে দেখবে আকাশে পাঁচটা চাঁদ, লাল রডো ক্লাইসি ছাড়া পৃথিবীতে কোনো উদ্ভিদ নেই। বাসন্তী তার হাসপাতালের ডিউটি সেরে তার জন্য থার্ড-ক্লাস স্পেসশিপের স্টপে অপেক্ষা করে থাকবে। তারা চাঁদের বিস্তীর্ণ মারিয়া সমতলের রোমান্টিক শান্তিক ফাটলে সন্ধ্যা কাটাতে যাবে। প্রথম প্রথম মহাকাশের অসাধারণ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে যে সব স্পেস যাত্রীরা মারা যেত তাদের কবরে ক্রস্টালের পুষ্পগুচ্ছ রেখে আসবে।

চলে যেতে থাকা সময়ের ভারবহন করতে করতে অ্যাটলাসের মত সত্যেনের দু কাঁধ ঝুঁকে এল।

আজ অনেক কাজ। মার কাছে যাওয়া। পাত্রী দেখতে যাওয়া। বাসন্তীকে বিয়ে করার কথা কিছুতেই মাকে—। বাসন্তী কেন নার্স হল? তবু...তবু পৃথিবী রসাতলে গেলেও আমি আজ বাসন্তীর কাছে যাবোই। সত্যেন নিজের মনে বার বার বলতে থাকল।

জামা-কাপড় বদলে, ট্যাক্সি। মা। মার ভাত দেওয়া, পরেই চা। চাববার জলখাবার জামাইবাবু। আবার ট্যাক্সি। ভিক্টোরিয়া। মেয়েটির সতের বছর। লাল শাড়ি। স্কুল ফাইনাল পাশ। নাক রাঙা গানে। জামাইবাবু, কাকাদের খুব পছন্দ। চেম্বার করার বিলেত যাবার খরচ দেবে। সত্যেন কেবল ঘড়ি দেখছে। ভাগনা টুনু বলেছে—মামা রথ দেখাবে মামা? মেলায় যাবো?

তাহলে বাসন্তী। সত্যেন অতটুকু সময়ের খাপে কি পারমানেন্ট অ্যাপয়েন্ট-মেন্ট ভরছে।

ক্রমাগত ঘড়ি। কয়েকটা দিন কেটে গেল। মাত্র তিনটে দিন। তবে কেন 'এই ত সবে দেখা' সতের বছরের চানটান মেয়েটা সাত্যরলায় সেই বুড়ি বুড়ো হয়ে গেল।

—কি রে সত্যেন মেয়ে পছন্দ ত!

—ও ত বুড়ি।

কি বললে, কি বললে—শুনতে শুনতে সত্যেন ট্যাক্সি থেকে নেমে গেল। বাস চারটে। এ হসপিটাল বাসন্তীর ডিউটি চারটেয় শেষ হয়। তিন সাড়ে চারটেয় এই স্টপে নামে বাসন্তী। সত্যেন একটা সিগারেট ধরালো। মনে মনে ভাঁজতে লাগল বাসন্তীকে কি বলবে।

—আমাদের এই বর্তমানটা বুঝলে বাসন্তী, ভাঙা থার্মোমিটারের বেকায়দা পারা। আমি বাপের বড় ছেলে। ব্যাকিং নেই। এম-বি পাশ ছোকরা ডাক্তার। তুমি সামান্য একটা নার্স। আমার সঙ্গে এতদিন শরীর বাঁচিয়ে... যা টাকা বাঁচিয়েছ তাতে একটা মিটসেফ হবে কিনা সন্দেহ... কবে বিয়ে হবে, বাসন্তী? নাতির বয়সী ছেলে নিয়ে তবু একবার দাঁতে ব্যথা কোমরে বাত নিজেদের ঘরের জানালার ফ্রেমে একটুক্ষণের চলচ্চিত্র হব?

ভাবতেই পুরো একদিন ঘুরে এল কাঁটা। কি তাড়াতাড়ি সময় যাচ্ছে।

কানের দুপাশে রগ দপদপ। এভাবে সময়ের মত একটা অপদার্থ পেলে তারও একটা চাপ লাগে।

সত্যেন দেখলে আহা কি গোধূলি। তেলরঙা আকাশ। লাল-নীল কাগজ রাঙতামোড়া রথ। ছোট রথ, মাঝারি রথ, বড় রথ। মোম বাতির সরল আলো। দেবদারুর চকচকে পাতা। সার হাতে চুল আঁচড়ানো ছেলে। কাজলপরা মেয়ে। চলন্ত মন্দিরের মত বড় বড় রথ। কত রঙ। কাঠের পরতে পরতে রাঙা পালিশ। পতাকা। বাতাসে নড়া পতাকা। ছোট্ট ছোট্ট আলোর বাল্ব জড়ানো। ফুলের গন্ধ, ধূপের গন্ধ, কাঁসির আওয়াজ। ঘণ্টাধ্বনি। ঢাকের কুড়াং কুড়াং। মলায় ভাজা পাঁপর, পুতুল কিনবে পয়সার থলি। আনন্দিত পথচারী। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ কাগজের শিকলি। আনন্দ। আনন্দ। আবার বাঁচতে ইচ্ছে করে। লম্বা লম্বা বাঁশি হাতে শিশুরা নকীবের মত জীবন নামক রাজাকে ডেকে আনছে।

দেখতে দেখতে আরো আধদিন।...দেড় দিন সত্যেন অপেক্ষা করলে তাও বাসন্তী এল না। ঘড়িও সেই একই ভয়ঙ্কর বেগে ঘুরছে। সেই চব্বিশ মিনিট একদিন। তবে সময় কাটছে না কেন? থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি? বাসন্তী নেই। পৃথিবীতে নেই? সে তারা হয়ে গেছে। সব চেয়ে কাছের তারাই যদি হয় সেও যে তিন ট্রিলিয়ন মাইল দূরে। সত্যেন শেষ পর্যন্ত যখন বাসন্তী—বাসন্তী করে একটা চিৎকার করেছে তখন বাসন্তী এল।

—সত্যেন তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। বিনোদবাবু ফোন করেছিলেন। বললেন তোমার অসুখ!

বাসন্তী, বাসন্তী, ভাবতে পারো তোমার জন্য দেড়দিন—এত দেরী কেন বাসন্তী?

কি যে বলছ? চারটেয় ডিউটি অফ হয়েছে এখন ঠিক চারটে ছত্রিশ!

—আমরা কিন্তু তিন মাস চার মাস একসঙ্গে থাকব বাসন্তী।

– কি যে বলো? যা কল্পনা করা যায়, একলা, তা এমন করে দিনের আলোয় বলতে আছে বুঝি?

—কোথায় যাবে বাসন্তী? ট্যাক্সি নিই। আগেকার চব্বিশ পঁচিশ মিনিট লাগবে, মানে একদিন, একদিন পুরো আমরা দুজন ট্যাক্সিতে—।

ট্যাক্সিতে উঠে বাসন্তী বললে,—তুমি কিছুদিন বিশ্রাম নিতে পার না

সত্যেন? বিনোদবাবু বলছিলেন তুমি নাকি সাত রাত ঘুমোও নি। তাছাড়া·

—কি চেপে গেলে বাসন্তী? আর কি? ওঃ বুঝেছি বিনোদ সব বলে দিয়েছে, তাই না? আমি আজকাল স্ল্যাং বলি, পেথিডিন নিই, সেদিন সুযোগ পেয়ে নার্স গৌরীকে, ·

বাসন্তীর সাদা হয়ে যা· য়া মুখের সামনে সত্যেন হঠাৎ নিবে গেল।

—ও কথা থাক, কি চেহারা হয়েছে বলো তো তোমার, যেন একশো বছর বয়স হয়ে গেছে। আবার উদ্দীপিত হয়ে উঠল সত্যেন।

—আরে এই কথাই ত, তোমাকেই তাহলে বলি বাসন্তী। আরে ওইটাই ত আমার আসল ভয়। কবে যেন সেই সতের বছরের পাত্রীটা স᾿ ঝিলার থুত্থুড়ে বুড়ি হয়ে গেল।

তারা এতক্ষণ দুজনের মাঝখানে খানিকটা ফাঁকে ঘাস, ভালোবাসা কৌমার্য এই সব রেখে দিব্যি বসেছিল। কিন্তু দুদিন একসঙ্গে বাস করার পর এ ধরনের ব্যবহারের আর কোনো মানেই হয় না। সত্যেন সরে বসল। ফাঁকটা রইল না।

—আজ তোমার কি হয়েছে বলো তো?

দু'দিন সংযম দেখিয়েছি আর কত? সত্যেনের ঘড়ির হিসেবে বাসন্তী-দের চব্বিশ মিনিট চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেছে। একথাটাই সত্যেন কাউকে বোঝাতে পারছে না।

বাসন্তী পরম মমতায় সত্যেনের দপ্‌দপে শিরা ওঠা একদম পুরুষ হাতটাকে সামাল দিতে থাকল।

আশ্চর্য, বাসন্তী এমন করছে কেন?

তা'তো হবেই, দ্বিতীয় চিন্তায় সত্যেন বুঝল। যে ভাবে হু হু করে দিন রাত্রি। প্রেমিকা থেকে এখন বাসন্তী স্ত্রী হয়ে গেছে।

বর্তমান ভীষণ বেগে দুপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। সত্যেন বাসন্তীকে দোকানের ম্যানিকুইনের মত দেখলে। ঝপ্ ঝপ্ ফ্যাশান বদলাচ্ছে, ম্যানিকুইন বেকালে যে ফ্যাশান, ব্লাউজের হাত এই ছোট, এই বড়, এই নেই, গলাবন্ধ গলাখোলা, বুক কাটা কোমর ওঠা, পিঠে খাবলা তোলা,—চাওড়া পাড়, পাড় নেই, মাঝখানে পাড়, পাড়ে আঁচল···ফ্যাশান সময় হাত ধরাধরি যাচ্ছে। বাসন্তী সত্যেনের চোখের সামনে বেনারসী ছাড়লে, ভিতরে চিকনের সায়া,

মাড় দেওয়া ঝাঁকা ঝাঁকা গন্ধ হলুদ তাঁতের শাড়ি পরে কিছু দিন বিছানায় এল, ক'দিন পরে হাসপাতালে-পরা সাদা ফরসা মাড় ছাড়া নরম শাড়ি, তারপর সারাদিন রান্না করা উনুনের ধোঁয়ার গন্ধ লাগানো···শেষ পর্যন্ত বাতিল করা অঙ্গ। বেঢপ সায়া আর ব্লাউজ। বিছানায় নিজেকে কমনীয় দেখাবার ইচ্ছে বাসন্তী ঝরিয়ে ফেলেছে। স্বামীর কাছে স্ত্রী একমাত্র রমণী যার কোন যৌন-আবেদন নেই। পাপড়ি ঝরে যাবার পর ফুল তার আসল অঙ্গ দেখায়।

সত্যেন পরিষ্কার দেখতে পেলে সিলিয়া সমেত একরাশ জীবকোষ শির শির করতে করতে গিয়ে গোল স্থির ডিম্বকোষকে আক্রমণ করলে। দেয়াল ভেঙে গেল। সাবান জল নাড়লে অজস্র ফেনা যেমন কোষ কোষ হয়ে ফুলে ওঠে, নিমেষে তার সন্তান মাতৃগর্ভে তেমনি দ্রুততায় সমস্ত বিবর্তনবাদের পুনরাবৃত্তি করতে লাগল। সত্যেন সূর্য চাঁদকে সোনালী রূপালী বল লোফালুফির মত আকাশের এপাশে-ওপাশে চলাফেরা করতে দেখলে। ইতিমধ্যে সে বিবাহিত, বাবা,—বাড়িতে ছেলে অনেকক্ষণ একলা এই বোধটা মাথায় আসতেই বাসন্তীর দিকে ফিরে তাকালে। তখনি, তখনি বাসন্তীকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি ওপাশে আপত্তিকর ভঙ্গিতে বসে থাকা একজোড়া ছেলেমেয়ের দিকে পড়ল।

সত্যেন বিরক্ত হল।

—আচ্ছা একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই ওদের, এই ভোর বেলায় এই সব? এখুনি রেললাইনের ওপার থেকে রিফিউজিরা স্নান করতে আসবে।

—ভোর কোথায়, সন্ধ্যে হয়ে এল।

—যাঃ ওইত দেখনা শুকতারা!

—সন্ধ্যাতারা!

সত্যেন ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল।

—বাড়ি চলো, খোকা অনেকক্ষণ একলা রয়েছে।

বাসন্তী সত্যেনের সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল।

—শোন, এদিকে তাকাও, কি বলছ পাগলের মত?···বলো তো আমাকে, তোমার কি হয়েছে?

বাসন্তীর বুকের মধ্যে অনেকক্ষণ মাথা রাখলে হয়ত আমার দুশ্চিন্তা যেত।

—তাহলে এতদিন থাকবার, ভাববার পরও আমাদের বিয়ে হল না বাসন্তী, কবে হবে ?

—এই ত চাকরি পেলেই।

তখন এই খারাপ ঘড়িটা ফেলে দেব। তুমি বিয়ের সময় আমাকে একটা সিক্রিয়াম ঘড়ি দিও বাসন্তী।

বাসন্তী তাকালে।

উড়ুক্কু, ঘড়ি। স্পেসে পাঠায় ওরা। সেকেণ্ডে ২৪০০০,০০০,০০০ বার কাঁপে। বাসন্তী তাহলে আর সেকেণ্ডেরও গরমিল হবে না। ভবিষ্যৎ, তুমি, আমি, খোকা সেই কেন্দ্রাতিগে ছিটকে বেরিয়ে যাব।

বাসন্তীর দু'চোখ দুশ্চিন্তায় সজল দেখলে সত্যেন।

—তোমায় কিছুতেই একা যেতে দেব না, সঙ্গে যাব। বাসন্তী সত্যেনের হাত চেপে ধরলে।

—তুমি ভাবতে পারো বাসন্তী, আমি কোটি কোটি পরার্ধ পরার্ধ কালধরে হাসপাতালে হাউস-সার্জেনী করছি। চলন্ত পৃথিবীর জাড্য আমার মধ্যে সংক্রামিত—দেখে ইচ্ছে করলেই আর থামতে পারিনা। উল্টো দিকে যেতে পারিনা। আমায় ছেড়ে দাও আমি যাই।

সত্যেন দেখতে পেলে তার শার্টের হাতায় কপিং পেনসিলে তার ওয়ার্ডের পেসেণ্টদের নাম-ধাম অবস্থা, টেম্পারেচার, প্রেসার, ইউরিন, স্টুল, ব্লাড রিপোর্ট, কোয়াগুলেশন রিপোর্ট, এক্সরে স্লাইড্-এর বিবরণ সার সার লেখা হয়ে যাচ্ছে। অমানুষিক দায়িত্বের ভারে প্রবাহমান সময়ের চাপে সত্যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না।

বাসন্তীকে এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে সত্যেন চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠে পড়লে।

বাসন্তী পড়ে রইল।

বাসে উঠতেই টুকুনের মুখ। 'মামা মেলায় নিয়ে যাবে না'—মুখ। রিবন বাঁধা আশা করা মেয়েটা। সত্যেন ভেবে দেখলে হাসপাতাল ফেরার সময় কখন পেরিয়ে গেছে। সে দু হাত দিয়ে ঘড়ির কাঁটা দু পাশে ঠেলে মাঝখানের ফাঁকে চেপে চেপে অ্যাপয়েণ্ট্‌মেণ্ট ভরলে। বা পোর্টম্যান্টো আটো করে চেপে বসে লোকে যেমন তালা লাগায় তেমন সময়ের ওপর চাপতে চাইলে।

তখনি ঝন্ ঝন্ কাঁসি খোল কর্তালের কর্ণবিদারী আওয়াজ। বাস বন্ধ। সত্যেনের কপাল দিয়ে বদ্ধ গরমে ঘাম ঝরে পড়ছে। ঘাড় নামিয়ে সে অনর্গল চাকা দেখতে পেলে। বাসে দাঁড়ালে রথের চূড়ো দেখা যায় না। চাকা চাকা চাকা। ছোট বড় মাঝারি চাকা। চাকায় চাকায় রং। রং রং টিপ। বন বন করে চাকা ঘুরছে। রথ ফিরছে! রথ ফিরছে কেন। রথ ফিরছে কেন? সত্যি? এই রথ দখলে যাবার সময় এই ফেরার সময় উল্টোরথ? (সত্যেনের খেয়াল ছিল না সে নিজে উল্টো-দিকে ফিরছে)। চাকা চাকা, ক্রমাগত চাকা। ক্রমে বড় বড় চাকা! কর্তাল গঞ্জনী। মানুষদের গলা ভাঙা। মেয়েদের কাজল থেবড়ে চোখের চারপাশে চশমা,। শিকলি ছিঁড়ে পড়ছে। অসহ্য গরম। কখন বাস ছাড়বে। হাসপাতালে নেমে সেখানে বলে টুকুনের কাছে যাবো। টুকুনকে বলব,—সোজা রথে আসতে পারিনি মামণি, উল্টোরথে চলো। রাগ ক'রো না! লক্ষ্মী মা মণি!

এর মধ্যে আবার লোকটার চিন্তাও ঠেলা মেরে উঠল। বাঃ বেশ। সত্যেন ডাক্তারের কাঁধে লোকটার মৃত্যুর দায়িত্ব। সত্যেন দেখলে সে দায়িত্বটা মুঠোয় করে ঘুরছে সামনে। লোকটা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত চলে যাচ্ছে। সত্যেন তাকে ডাকবার চেষ্টা করলে। তার খুব দরকার ছিল। লোকটার হিসেব ইতিমধ্যে সময় করে বুঝিয়ে দিতে পারলে তার দৃঢ় ধারণা সে মেলায় শিশু নকীবদের মুখে জীবনের বাঁশি শুনতে পেত। নির্বোধ 'নিগ্রিটো, লোকটা। চাঁদের দু রকম মানে জানে না। পৃথিবী এমনিও বাসুকীর ফণায়, গ্রহণে সূর্যচাঁদ রাহু এঁটো করে ভেবে রাম নাম জপে। এমনি মুঠো কতক লোক এখনও পৃথিবীর আদিম বনস্থলী পাহাড় মরু নদীতীরে বাস করে। আজও তারা দিনকে ডাবের মত দুভাগে কেটে ভিতরের শাঁস জমায়। সময়ের অন্ত ভাগাভাগি খাওয়াখায়ি তাদের নির্বোধ নিষ্পাপের ওপাশে অপরিচিত রেখেছে। সত্যেনের ইচ্ছে হয়েছিল এই আদমকেও সে জ্ঞানবৃক্ষের সেই রক্তাক্ত "জানা"র আপেল খাওয়ায়। লোকটাকে অন্তর্জলিতে গীতা শোনানোর মত সত্যেন ক্রমাগত বলে গেল:

শোনো, তুমি অমন করে আমার দিকে আঙুল দেখিও না। শোনো বলি, প্রত্যেক মানুষ একটা বিন্দুতে যাবার জন্যে বেরোয়। তুমিও তাই বেরিয়েছিলে। তুমি আগে এসে পড়েছিলে। তোমার মৃত্যুর কারণ সেইটে। আমি নয়।

লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করে সত্যেনের দিকে তাকাল। সত্যেনকে তার চোখদুটো এত কষ্ট করে তুলতে হল, যেন ভুরুর ওপর তিনশো চারশো বছরের ভার চেপে বসে আছে। আমি তোমায় মারিনি জানো। আমি সাধারণ একটা হাউস সার্জন। আণ্ডার পেড, আণ্ডার ফেড। হাসপাতালের কুলির মত সারাদিন রাত খাটি। একটা মেয়ের সঙ্গে কতদিনের আলাপ সেটাকে বিয়ে অব্দি করতে পারছি না। বাবা পেন্সন পেয়েছেন। বাড়িতে কিছু দিতে পারি না। চাকরির অ্যাপ্লিকেশন করছি কোনো উত্তর নেই। পাগলের মত অবস্থা। চাকরি করলে নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাওয়েন্স পাব না। প্র্যাকটিস করলে সাক্‌সেস্‌ফুল হব কিনা সন্দেহ। লুকিয়ে নার্সিংহোমে কাজ করি। পৃথিবীতে জনসংখ্যা কমানোর কাজ। ডাক্তার দেবকে সাহায্য করলে মাঝে মাঝে কাঁচা টাকা পাই। তাও বাড়িতে দিতে ইচ্ছে করে না। বাসন্তীকেও উপহার কিনে দিই না। নিজের জিনিস কিনি। বন্ধুদের দামী রেস্তোরাঁয় খাওয়াই। ফুর্তি করি। কি করব বলো? বর্তমান যদি হঠাৎ দড়ি হয়ে যায় আমরা ভাল রেখে সার্কেসের খেলোয়াড় হই কি করে?

লোকটা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করেছে। সত্যেন বললে,

—যেওনা দাঁড়াও। বিশ্বাস কর। তোমাকে আমি মারিনি। মারতে পারিনা। সত্যি বলছি। তুমি ত সময়ের অংকটা জানতেই না। তাই আগে এসে গিয়েছিলে। কিন্তু দেখো আমি ত সময়ের অংক জানি, তাও এই দেখো আমার হাসপাতালের স্টপ। আমি নামলাম। দেখো একটু উল্টো হয়ে নামলে মানুষ কেমন হোঁচট খায়। এবার দেখো আমি ত সময় হিসেব জানি, বাঘের পিঠে চড়া লোক,—তাও আমি ঘড়ি,—দেখো আমার ঘড়ি কি ভীষণ বেগে ঘুরছে। এখন ভুল সময়। লাল আলো নিবে গেল। আমি পেরোবার প্রথম সুযোগ হারালাম। মস্ত দোতলা হাজার চোখো বাসটা আসছে। হেড্‌ লাইট দুটো দেখো। ধবক্‌ ধবক্‌ করে জ্বলছে কি রকম। হলুদ আলো। এখনো আমার সময়। আমার জায়গা। আমার পেরোবার জায়গা। পৃথিবী এই মুহূর্তের জন্যে এই পেরোবার জায়গা আমায় দিয়েছে। নীল আলো হয়ে গেল। এখন আর আমার সময় না। জায়গা না। আবার পাবো। সে বারে বাসটা এসে গেল। আমি ওর সময়েই পেরোচ্ছি। আমার চারপাশে শব্দের বিস্ফোরণ। আলোগুলো উজ্জ্বল হয়ে ফেটে যাচ্ছে, মানুষের কাটা চৌচির ভোকাল কর্ডের আওয়াজ। সাধারণ আওয়াজ না।

সময়ের সঙ্গে সময়ের সংঘর্ষের দুর্ঘটনার আওয়াজ। কান ফেটে গেল। কি শব্দ আলো! শোনো, যেও না। দেখো আমি তোমাকে সমস্তটা করে দেখাচ্ছি···

এই শক্ত কঠিন নিশ্চিন্ত পৃথিবীতেও আজ তুমি, আজ আমি বর্ম চর্মের অভাবে নাকে মুখে রক্ত তুলে ফেটে মরে যাচ্ছি। আর তেমন তেমন রক্ষাকবচ পেলে আহা মহাকাশে নিষ্ঠুর মহাকাশেও আমি জলবিন্দুর মেশা দেখাতাম, বাসন্তী তেরেসকোভার মত গান করত, আমরা বংশ বৃদ্ধি করতে পারতাম। তোমায় বলেছি না ফিরে আসাটাও একটা মস্ত ক্যালকুলেশনের ব্যাপার!

আরে ভীড়ের মধ্যে ওটা আবার কে? বাসন্তী না?

সত্যেন তুমি আত্মহত্যা করতে গেলে কেন?

আমার চেতনা বুঝলে প্রায় তোমারই মত আবছা হয়ে আসছে। মেয়েটা বড় হতাশ গলায় কথা বলছে।

আমাকে যখন তুলে নিয়ে যাচ্ছিল তখনো ও সঙ্গে সঙ্গে চলছিল।

সত্যেন লোকটার সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলে যাচ্ছিল তখনো।

এরা ভাবছে আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম। তা নয়। আমি জানি এখন বেশির ভাগ হাউস সার্জন থাকে না। শম্ভুবাবু এই সময় খেতে যায়। আমি ঠিক তোমার অবস্থায় যেতে চাই। গিয়েও যদি ফিরতে পারি তাহলে বুঝবে আমি তোমায় মারিনি।

আচ্ছা আমার কোথায় লাগল বলো ত। ঠিক বুঝতে পারছি না!

আবছা বাসন্তীর মুখ। কী বড়। যেন আকাশ কেটে তৈরী!

ঝিনঝিনে ঘাম যেন একরাশ তারা।

এমার্জেন্সীতে কে? বিনোদ। বিনোদেরই ত গলা শুনছি।

ভেঙে পড়বেন না। না না। নিউরোসিস···মেলাংকলিয়া···না না ভয়ের কোন কারণ নেই।

আমি প্রাণপণ কথা বলবার চেষ্টা করছি। ঠিক তোমার মত আমার শরীরটাও একটা বিশ্রী ঝাঁকি দিল।

—এঃ ঘড়িটা একেবারে চুরচুর ভেঙে গেছে·· ক্যারাজিনীর গল—হার্ট, লাংস···হ্যাঁ সিস্টার রিস্ক নিতেই হবে, ব্লাড, স্যালাইন, গ্যাস···রেডি সিস্টার।

বিনোদ আমার মুখের কাছে এল, গ্যাসের ক্যানেলটা পরিয়ে দিলে।

আমার শরীরটা ঝাঁকি দিয়ে উঠল। আমি বলতে চেষ্টা করলাম—দিস না, দিস না বিনোদ।

তখনই তোমার অন্ধকার টানেলটা দেখতে পেলাম।

দশ, নয়, আট, সাত, ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই।

আমি শেষবারের মত ফিরতে চেষ্টা করলাম।

সত্যেন বুঝতে পারলে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যতটা যাবার সে তার চেয়ে অনেক বেশী ভিতরে চলে যাচ্ছে।

মতি নন্দী



চতুর্থ সীমানা

"তাকিয়ে দেখ, সমুদ্র তাই না? মনে হচ্ছে যেন আকাশটা গড়িয়ে পড়েছে।"

রুবি স্বামীর কথা অনুসরণ করে চোখটাকে আকাশ বরাবর উত্তর-দক্ষিণ করিয়ে ঘাড় নাড়ল। রাস্তাটা সোজা চলে গেছে। মাঝখানে খানিকটা উঁচু হয়ে থাকায় এবং তার ওপারে গাছপালা-বাড়ি ইত্যাদি না থাকায় সত্যিই মনে হয় আকাশটা মাটির দিকে নেমেছে।

"যেখানে আকাশটা মাটি ছুঁচ্ছে ওখানেই ভূমিটা।" বেসরকারী বাস ওদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। ওরা রাস্তা পার হবার আগে এই নতুন কলোনিটার দিকে তাকিয়ে এইসব বলে মুগ্ধ হয়ে রাস্তা পার হল।

কাঁচা ড্রেনের উপর সিমেন্টের সেতু। পার হয়ে কলোনির সদর সোজা রাস্তাটাই রাজপথ। কলোনিকে দু-ভাগ করে 'এ' এবং 'বি' ব্লক তৈরী হয়েছে। বাস চলাচলের রাস্তার ধার থেকেই বাড়িগুলো তৈরী হতে হতে পিছু হটেছে। প্রায় আধাআধি বাড়িতে ভরে গেছে। পিছন দিকে এখনো মাঠ। মাটি পড়ছে জমি ভরাট হচ্ছে। দুচার বর্ষা না গেলে আর উঠবে না।

বাঁ হাতে কোঁচাটা একটু তুলে নিখিল ছোট্ট একতলা বাড়িটাকে থুতনি দিয়ে দেখিয়ে বলল "ইউনিভার্সিটির প্রফেসারের বাড়ি। ওর মত ইকনমিস্ট ইণ্ডিয়াতে খুব কম আছে।"

রুবি বাড়িটার দিকে তাকিয়ে, সমীহ করে বলল, 'বড়লোক'?

"খুব নয়, তবে দিল্লিতে প্রায়ই ডাক পড়ে।"

ওরা পাশাপাশি হাঁটতে থাকল। রুবির জুতোটা নতুন। এখনো খাপ খায়নি। নিখিল সিগারেট ধরাতে দাঁড়াল। রুবি বাড়িগুলো দেখতে দেখতে

বলল, "বেশ ফাঁকা ফাঁকা, ঘেঁষাঘেঁষি নয়।" ছুটো কাঠি নিভেছে, তৃতীয়টা জ্বালাতে অপেক্ষা করছে বাতাস পড়ে যাওয়ার সুতরাং নিখিল জবাব দিলনা।

কয়েকজন গৃহিণী গল্প করতে করতে বড় রাস্তায় নামল কাছেরই একটা বাড়ি থেকে। তারা একবার পিছু ফিরে তাকালো। সিগারেট ধরেছে। গৃহিণীদের পিছনে রুবি এবং নিখিল হাঁটতে শুরু করল।

"এরা সব এখনকারই?"

"নয়তো কোথাকার হবে!"

রুবি হোঁচট খেল। ভ্রূ কুঁচকে নিখিল দেখল রাস্তার খোয়াটাকে। গৃহিণীরা কি কথায় খুব হাসছে।

"ওরা রোজ বেরোয় বোধহয়।"

"বেরোবে না কেন, বেড়াবার এমন রাস্তা রয়েছে, বেশি গাড়ি চলেনা, ভিড়ও নেই।"

"দোকান পাটও তো কম।"

"নতুন জায়গা, একি কোলকাতার মত পুরনো? সবই হবে, আস্তে আস্তে হবে। লোকজন আরো আসুক।"

বড় রাস্তাটা থেকে দুধারে ছোট ছোট সমান্তরাল রাস্তা বেরিয়ে গেছে। রাস্তার ধারে সিমেন্ট বাঁধান খোলা ড্রেন, ইলেকট্রিকের খুঁটি। লুঙ্গিপরা এক মাঝবয়সী লোক বাড়ির সামনের ড্রেন খোঁচাচ্ছে বাখারি দিয়ে। ছাতে বাচ্চা কোলে বৌ। বাজারের থলি হাতে একজন পাশের রাস্তা থেকে বেরোল, একটু ব্যস্ত। গৃহিণীরা তাকে কি জিজ্ঞাসা করতেই লোকটি বলল, নিখিল-রুবি তখন তাদের অতিক্রম করে যেতে যেতে শুনল, "হঠাৎ এসে পড়েছে, আজকেই গৌরীকে নিয়ে যাবে।"

"ওমা সেকি, এইতো সবে বাপের বাড়ি এল।"

একটু পরেই কয়েকটা চাপা হাসির মধ্য দিয়ে কথা ফুটল, "বেচারা, দুদিন জিরোতে এসেও শান্তি নেই।"

"বেশ রোগা হয়ে এসেছে।"

"হবেনা, যা টানের বহর।"

গৃহিণীরা একটা রাস্তায় ঢুকে পড়ল। আড়ে তাকিয়ে নিখিল লক্ষ্য করল-রুবির ঠোঁট হাসিতে মোচকান।

নতুন একটা বাড়ি তৈরী হচ্ছে। এখন শেষ পর্যায়ে। আজ ছুটির দিন, বাড়িতে মিস্ত্রি লাগেনি। মোটরে কর্তা-গিন্নি দেখতে এসেছে, সঙ্গে ঠিকাদার। গিন্নি মেঝের দিকে হাত নেড়ে কিছু একটা বলছে, গভীর মনোযোগে কর্তা ও ঠিকাদার শুনছে

"বেশ পয়সাওয়ালা।"

জবাব দিল না নিখিল। বাড়ির মাথায় খোঁচা খোঁচা কংক্রীট থামের শিক। জানালার গ্রীল। দক্ষিণে পোর্টিকো। গ্যারেজ ঘর। দরজাগুলো সেগুনের। সিঁড়িতে মোজাইক।

"লাখ খ'নেকের কম নয়।"

"এত লাগে!"

"লাগবেই, প্রায় পাঁচ কাঠা জমি।"

"আমাদের তো তিনকাঠা মোটে।"

"মোটে মানে? তাই কটা লোকের আছে?"

নিখিলের স্বরে কিছুটা ঝাঁঝ ছিল। ক্ষুণ্ণ হয়ে রুবি বলল, "তা বলছি না, খরচ আমাদের কমই হবে। তিনটে লোকের জন্য এতবড় করে তো আর করার দরকার নেই।"

"তিন কোথায় চারজন তো!"

"মা আর কদ্দিন বাঁচবেন।"

ওরা ক্রমশ ফাঁকা অঞ্চলের দিকে এগিয়ে আসতে থাকল। বাড়ির সংখ্যা কমছে, তৈরী শুরু হওয়াদের সংখ্যা বাড়ছে। কলোনির প্রায় মাঝামাঝি ওরা এসে পড়েছে।

সাজগোজ করে একটা পরিবার বাস ধরতে চলেছে। তার মধ্য থেকে একটা বাচ্চা ছুটে গেল রাস্তার ধারের বাড়িটার দিকে। নিচু লোহার বেড়া, একটুখানি বাগান। তারমধ্যেই দুটি চেয়ারে ধূসর হয়ে বসে রয়েছে স্বামী-স্ত্রী। বাচ্চাটি ফুল চাইল। ওরা ঘাড় নাড়ল। বাচ্চাটি হাত বাড়িয়ে একটি সাদা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে ছুটে পরিবারের মধ্যে ফিরে এল। ঘাড় বেঁকিয়ে যতক্ষণ দেখা যায় দেখতে দেখতে স্বামী-স্ত্রী হেসে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করল।

নিখিল এবং রুবি সবটাই দেখতে দেখতে এগোল। একবার শুধু রুবি মন্তব্য করল, "নিঃসন্তান বোধ হয়।"

"বুড়ো বয়সে এদের খুব কষ্ট হয়।"

রুবি ঘাড় নেড়ে সমর্থন করল। "আমার এক মামারও ঠিক এই অবস্থা। কেউ তাদের কাছে গেলে যা খুশী হয়। যাবে একদিন?"

এর জবাবে নিখিল আঙুল দিয়ে দেখাল "ওইটে হচ্ছে পার্ক। ভেতরে পুকুরও আছে।"

রুবি সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। ফ্রকপরা কয়েকটি কিশোরী ভারিক্কী চালে গল্প করতে করতে পুকুর ধারে ঘুরছে। দুজন যুবক বেঞ্চে ঘেষাঘেষি হয়ে একটা বই পড়ায় ব্যস্ত। গুটি কয় শিশু ছুটোছুটি করছে।

"পুকুরটা ঘেরা নয়। বাবুলকে একা ছেড়ে দেওয়া যাবে না।"

"না যাবে না।"

দুজনের স্বরেই দুশ্চিন্তার প্রকাশ।

"তবে ওদিকে একটা খেলার মাঠ আছে, বড়দের জন্য।"

"বড়দের খেলার মধ্যে গেলে, লেগে-টেগে যাবে।"

"পুকুরটাকেই ঘেরাও করার একটা ব্যবস্থা করাতে হবে। ওতো আর এখুনি চলা-ফেরা শিখছে না।"

নিখিল আশ্বস্ত করল রুবিকে। তারপর আঙুল তুলে দেখাল "ওইযে বিরাট ফাঁকা জায়গা, ওইখানে জমিটা।"

"কোনখানে?"

"চল দেখাচ্ছি। ওরই মধ্যে একজায়গায়।"

ওরা চলতে শুরু করল। দুধারে জমি। কোন কোনটায় সীমানা-চিহ্ন দেওয়া। সিমেন্টের তৈরী চৌকো ঢিবি, তারওপর আঁচড় কেটে প্লট নম্বর লেখা। কিছুদূর গিয়ে রাস্তাটা অসমাপ্ত অবস্থায় রয়ে গেছে। দরকার পড়েনি কারণ এদিকে আর বাড়ি ওঠেনি। ইলেকট্রিক খুঁটি নেই।

কলোনির লোকালয় ছাড়িয়ে ওরা অনেকদূর এসে পড়েছে। সামনে ধূ—ধূ মাঠ তারপর অস্পষ্ট গ্রাম। দুপাশে অনেকদূরে বাড়ি। সেগুলি অন্য কলোনির।

"এমন ফাঁকার মধ্যে?"

রুবির বক্তব্যটা ঠিক পরিষ্কার হলনা। নিখিল মুগ্ধ হয়ে সামনে তাকিয়ে বলল, "এই তো ভাল, লোকালয়ের কোলাহল থেকে দূরে, শান্ত নির্জন পরিবেশে, মানুষতো এই ভাবেই বাঁচতে চায়।"

"দোকান, বাজার, বাস থেকে দূরে হয়ে গেল।"

"দোকান বাজারতো আর চব্বিশ ঘণ্টা করতে হবেনা একবারই, বাসেও একবার আফিস যাওয়া আর আসা। তোমাকেতো কলোনির প্ল্যানটা দেখিয়েছে, এখন যে জায়গাটায় আমরা দাঁড়িয়ে এখানে একটা রাস্তা হবে, আড়াআড়ি, এর ওপারে 'সি' আর 'ডি' ব্লক। পয়সাওলা লোকেরা এই দিকটায় জমি কিনেছে।"

"ওদেরই পোষাবে, গাড়িতে করে তো যাতায়াত করবে।"

কথাটা যেন শুনতে পেলনা নিখিল। রাস্তা থেকে পাশের জমিতে নেমে হাঁটতে শুরু করল। বর্ষার কাদায় চটচটে। বুনোগাছ আর লম্বা ঘাসে হাঁটু পযন্ত ঢেকে যাচ্ছে। থেমে পিছু ফিরে নিখিল বলল, "এই জায়গাটায় এলে মনে হয় যেন মাঝ সমুদ্দুরে এসেছি, অবশ্য মনে হওয়াটা নেহাতই আন্দাজি ব্যাপার সমুদ্রই কখনো চোখে দেখিনি।"

"কিসে মনে হল যে জায়গাটা সমুদ্রের মত?"

"এমনিই। মাঝে মাঝে মনে হয়না কি এ রকম? কোন কোন লোক দেখলে যেমন মনে হয় পাহাড় দেখছি। কাউকে অরণ্য, কাউকে নদী, বন্যা, উদ্যান, সেই রকম, সবকিছু মিলিয়ে একটা। তাই না?"

ভ্রূ তুলে রুবি শুনল। মন্তব্য না করে চারধারে তাকাতে তাকাতে বলল, "আমাদের জমিতে পিলার দিয়েছে?"

"নিশ্চয়,"

"এখানে বেশিক্ষণ না থাকাই ভাল। বর্ষার সময় সাপখোপ থাকতে পারে।"

"হ্যা, তা পারে।"

এক প্রবীণ গ্রামবাসিনী ওদের কাছ দিয়েই গ্রামের দিকে চলে গেল। একবার শুধু তাকিয়েছিল। রুবি তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। বেশ জোরে হাঁটছে। দূরে দূরে আরও কিছু লোক চলাচল করছে। আকাশে ভেসে চলেছে মেঘ। বাতাসে আঁচল খসে পড়ল। তুলে নিয়ে রুবি বলল, "এটা ভাদ্দর মাস।"

"এইটে আমাদের জমি।"

"কই?"

"এই তো।"

সন্তর্পণে শূন্যে হাত বুলোল নিখিল।

"পিলার কই ?"

হঠাৎ রুবি আর্তনাদ করে উঠল।

"পিলার !"

চমকে উঠে বুনোগাছ আর লম্বা ঘাস মাড়িয়ে নিখিল ছুটে গেল। উবু হয়ে গুপ্তধন পাওয়ার মত জমি আঁচড়াতে থাকল। নেই। হামা দিয়ে কিছুটা এগোল। নেই। দুহাতে ঘাসের চাপড়া টেনে তুলতে শুরু করল। নেই। উঠে ছুটে গেল আর এক কোণে।

রুবিও পা চেপে চেপে খুঁজতে শুরু করল। কাদা লাগছে শাড়িতে। হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে তুলল। ঝুঁকতেই আঁচলটা মাটিতে পড়ল। বুকের কাছে দুহাতে জড়ো করে আরো নিচু হল।

"কোথায় জমি ?"

মুখতুলে ফ্যালফ্যাল করে নিখিল তাকাল। চারপাশে চোখ বুলিয়ে বিড় বিড় করে কি বলল।

"কোথায় জমি ?"

চীৎকার করল রুবি। নিখিল আর একটু সরে গিয়ে খুঁজতে শুরু করল। কাঁটা গাছ ওপড়াতে রক্ত ঝরছে। আঙুল মুখে দিয়ে নিখিল দাঁড়াল।

"ওরাতো বলেছিল করে দেবে।"

রুবি শুনতে পেল না। প্রায় মাটি শুঁকতে শুঁকতে সে এগোচ্ছে। হঠাৎ থমকালো। দুহাতে ঘাস সরিয়ে অস্ফুটে বলল, "এই তো।"

"পেয়েছ ?" ছুটে এল নিখিল। রুবির পাশে বসে মুখটা মাটির কাছাকাছি এনে বলল, "পঁচিশ। আমাদের প্লট নাম্বার পঁচিশইতো, না ছাব্বিশ ?"

"পঁচিশ।"

"ঠিক মনে আছে ?"

ঘাড় নেড়ে রুবি বলল, "রেজিস্ট্রির দিনই তো তুমি বললে নম্বরটা শুভ, পঁচিশে ডিসেম্বর যীশুর জন্মদিন, পঁচিশে আগস্ট প্রমোশনের চিঠি পেয়েছি, পঁচিশে যে বাবুল জন্মেছে। মনে নেই ?"

"বাকি তিনটেও তাহলে আছে।"

প্রথমটির থেকেও কম সময় লাগল বাকি পিলার খুঁজে বার করতে। তার মধ্যে একটি ভাঙা, ইঁটগুলো চুরি হয়ে গেছে। নিখিল তাইতে অস্বস্তি বোধ করল। চারদিকে চারটে না থাকলেও অবশ্য মালিকানা স্বত্ব নষ্ট

হবে না, তবুও যদি এই নিয়ে পাশের জমির সঙ্গে গোলমাল হয়! কাজই ব্যবস্থা করতে হবে, এইভেবে তিন পিলারের মাঝে দাঁড়িয়ে নিখিল হাসল। বলল, "এই হল জমি।" বুকভরে নিশ্বাস নিল। উদ্ধত ভঙ্গিতে গ্রীবা তুলে চারধারে তাকাল। পাশের স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করে হাসল।

"এতক্ষণে স্বস্তি পাওয়া গেল।" চারিপাশের পৃথিবীতে চোখ ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে রুবি আঁচল রাখল কাঁধে। "যা ভয় ধরেছিল।"

"ভয়, ভয় কিসের? টাকা দিয়েছি, দলিলও আছে, জিনিসটা লোপাট হবার মত নয়। জমি হচ্ছে আবহমান কালের, থাকবেও চিরকাল। তবে একটা ভয় রয়েছে পাশের জমির মালিক হয়তো ওই ভাঙা পিলারের দিক থেকে খানিকটা চুরি করে দখল করতে পারে। এ পাশের জমিটা কিনেছে এক আই, এ, এস, আর এইটে ব্যারাকপুর কোর্টের মুন্সেফের। পেছনেরটা বায়না করে রেখেছে এক সাব-এডিটার।"

"তবু নজর রাখা ভাল।"

"নিশ্চয়, মাঝেমাঝে এসে দেখে যেতে হবে।"

দূরে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে, বোধ হয় জমি দেখতে এসেছে। কয়েকজন যুবক বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় বসল। একটা লরী এসে থামল, ইঁটে বোঝাই। লাউডস্পীকারে কোথাও রেকর্ড বাজছে, অস্পষ্ট শোনা যায়। একটা চিল মাটিতে ছোঁ মেরে কি তুলে নিয়ে গেল। কুকুরটা যেতে যেতে থমকে চিলটাকে দেখল। তারপর সবুজ ধানচারার মাঠ লক্ষ্য করে দুলকি চালে এগিয়ে গেল।

"এখানে সাপ থাকতে পারে, সরে এস।"

নিখিল সরে এল। "কোথাও যদি বসার মত একটা জায়গাও থাকত।"

দুজনে চারধারে তাকিয়ে খুঁজে পেল না। তাই উবু হয়ে বসল জমির কিনার ঘেঁষে।

'এখন মাটি আলগা, জলে কিছুটা বসবে, রোদ খেয়ে শক্ত হবে!"

"তখন ভিৎ খোঁড়া হবে?"

স্মিত হাসল নিখিল। বাতাসের বিরুদ্ধে চোখ রেখে নিমীলিত করল। পাঞ্জাবীটা বুকের সঙ্গে লেপটে গেছে, উঁচু হয়ে উঠেছে মানিব্যাগ।

"দোতালার ভিৎ করে, প্রথমে একতলা তুলতে হবে। কেন জান?

পরে দরকার হলে দোতালা তুলে একতলাটা ভাড়া দেওয়া যাবে। ধর আমি মরে গেলুম, তখন তুমি ভাড়ার টাকায়—"

"আহা, কথার কি ছিরি।"

স্মিত হাসি, নিমীলিত চোখে নিখিল আবার বলল, ইন্সিওরেন্সের টাকাতেই দোতালা তুলতে পারবে।"

"থাক, খুব হয়েছে।"

"প্ল্যানটা সেইভাবেই করব। সিঁড়িটা এমনভাবে হবে যাতে একতলার সঙ্গে কোন সম্পর্ক দোতালার না থাকে তাহলে ভাড়াটের সঙ্গে কোন গোলমাল হবার চান্স থাকবে না।

"এখানে বাড়ি ভাড়া কেমন ?"

"তা পুরো একতলা, অবশ্য আমাদের মত ছোট বাড়ির, আশিটাকা তো হবেই।"

শুনে রুবিও বাতাসের বিরুদ্ধে চোখ রাখল। কিছুক্ষণ পরে বলল "হাওয়ার কি রকম সোঁ সোঁ আওয়াজ হয় দেখেছ। ঠিক কানের গোড়াতেই।"

"বলেছিলাম না, মনে হয় সমুদ্রে এসেছি। কি খোলামেলা যতদূর ইচ্ছে তাকাও, যত বড় ইচ্ছে নিশ্বাস নাও, মনে হয় যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছি।"

"রান্না ঘরে যাতে হাওয়া আসে সে ব্যবস্থা কিন্তু রাখতেই হবে।"

খড়খড় করে উঠল ঘাস। কিছু একটা চলে যাচ্ছে। ওরা ভয় পেল। নিখিল বলল,

"এবার যাওয়া যাক।"

পিলারের কাছের ঘাসগুলো পরিষ্কার করে দিলে হোত।"

"পরে হবে, আর একদিন রোদ থাকতে থাকতে আসা যাবেখন।"

আসার সময় ওরা একটা খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে তাকাল। ট্যাক্সিটা তাই দেখে আস্তে ঝুয়ে পড়ল। নিখিল হাত নেড়ে না করে দিল।

"এক পয়সা, দুপয়সা করেই টাকা জমে। কষ্ট হবে, হোক। পরে দেখবে সেই কষ্টের ফল ভোগ করতে কেমন লাগে। অন্তত তিরিশ হাজার টাকা না হলে বাড়ি তৈরীতে নামা চলে না। মাল মশলার দাম যা বাড়ছে দিন দিন।"

"এমনিই তো কত খরচ কমিয়ে দিয়েছি।"

জোরে হেঁটে এসে ওরা বাসে উঠল। সন্ধ্যা উতরে গেছে। ছুটির দিন তাই শহরতলীর বাসে ভিড়। নিখিল বাসের হ্যাণ্ডেল আঁকড়ে ঝুঁকে পড়ে কলোনিটার দিকে তাকাল।

বাস থেকে নেমে মিনিট চারেক হাঁটতেই কলকাতার মধ্যে চলে এল ওরা। এবার ট্রামে উঠল। নেমে দুমিনিট হেঁটে বাড়ি। বাড়ির পথে রুবি বলল, "বাবুলের বিস্কুট ফুরিয়েছে কিনবে ?"

"অভ্যেসটা ছাড়াও, এক বছরের ছেলেকে ওসব না খাওয়ানোই ভাল।"

"তোমার গেঞ্জী ছিঁড়েছে।"

"এখনো কটা দিন চলবে।"

"মার কাল একাদশী।"

"আঃ এই তো তোমার দোষ, একটু আগে বললে না কেন, তাহলে আসার পথে নেমে, কিনে নিতুম। এইতো তোমার দোষ। এখন কে আবার যাবে ? কালকে বরং কাউকে দিয়ে আনিয়ে নিও।"

একতলার ভাড়াটেদের বৌয়ের সঙ্গে সিঁড়িতেই রুবির দেখা হল। দাঁড়িয়ে পড়ল।

"তোমার ছেলে কি দুরন্তই না হয়েছে। এসেছিল আমাদের ঘরে। এটা টানে, ওটা হাঁটকায়। এই মাত্তর ঘুমোল, তা কেমন দেখলে ?"

"বিরাট কলোনি, আর কি ফাঁকার ওপর। হু হু করছে হাওয়া, মনে হয় যেন সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছি। ফিরতেই ইচ্ছে করে না।"

"এখনই এতখানি, বাড়ি হলে না জানি কি হবে।"

"তাইতো ভাবছি, নাজানি কি হবে। বিরাট বিরাট বাড়ি, কেউ ম্যাজিস্ট্রেট কেউ ইঞ্জিনীয়ার, কেউ প্রফেসার ওর মধ্যে আমাদের মত মানুষ গিয়ে কি করে বাস করবে, তাই ভেবে এখনই তো বুক কাঁপছে। পাশের জমিটাই এক জজের।"

ঝকমক করছে রুবির মুখ। কথায় আধোআধো ভাব।

"তোমার ছেলে একপাটি জুতো ফেলে গেছে, নিয়ে যাও।"

জুতো নিয়ে রুবি দোতালায় এল। দুখানি ঘর। বাইরের লোক এলে সামনের ঘরে বসে। রাত্রে নিখিলের বুড়ি মা শোয়। ভিতরেরটি বড়। খাট, আলমারি আছে। রান্নাঘর বারান্দার ধারে টিনের চালা।

বছর পনেরোর একটি ছেলে বাইরের ঘরের চেয়ারে বসে, শীর্ণ হাত-পা, ড্যাবড্যাবে চোখ। চেয়ারের হাতল ধরে পা বেঁকিয়ে মাথা নিচু করে রয়েছে। রুবি ভিতরের ঘরে গেল। নিখিল জামা ছেড়ে লুঙ্গি খুঁজছে।

"মণ্টু, ছোট কাকার ছেলে, ওকে বোধ হয় তুমি দেখনি।"

"কি জানি, ওরাতো অনেক ভাইবোন। কি জন্তে এসেছে?"

"একটা চিঠি এনেছে, দেখতো কি লেখা।"

থুতনি নেড়ে টেবিল দেখাল নিখিল। রুবি চিঠিটা তুলে পড়তে শুরু করল।

"কি লিখেছে?"

লুঙ্গিটা মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে, দাঁতে চেপে সাবধানে, কাপড়ের পাঠ রক্ষায় নিখিল ব্যস্ত ছিল হঠাৎ চমকে উঠল, "কি বললে? ছোট কাকীর কি হয়েছে?"

"খুব অসুখ, বাড়াবাড়ি যাচ্ছে।"

"তা আমি কি করব?"

রুবি চিঠি থেকে আবৃত্তি করল—

"এদিকে আমি তো অকর্মণ্য, পঙ্গু।"

"মাতলামি করে গাড়ি চাপা পড়েছিল।"

"সুবোধ মাসে ষাট টাকার বেশি সংসারে দিতে পারে না।"

"ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়ে বখামি শুরু করে, এখন বুঝি মোটর কারখানায় ঢুকেছে।"

"প্রবোধ ঈশ্বরের দয়ায় স্কুল ফাইন্যাল পাশ করিয়া, নাইট কলেজে পড়িতেছে, দুইটা টিউশনিও করে।"

"এ ছেলেটা ওদের মধ্যে তবু ভাল।"

"সোনা এবং মোনার জন্ত পাত্র খুঁজিতেছি কিন্তু উহারা লেখাপড়া জানা নয়, দেখিতেও ভাল নয়। বুঝিতেই পারিতেছ আজকালকার বিবাহের বাজার উহাদের পার করিবার মত সঙ্গতিও আমার নাই। তাহার উপর তোমার কাকিমার ভীষণ অসুখ, বোধহয় বাঁচিবে না।"

"ও বাড়িতে এই একটি মাত্র মানুষ, সারাজীবন দুঃখে দুঃখে কাটল, তবু মুখফুটে একটা কথা বলেনি। মুখে সর্বদাই হাসি। আমার খুব ভালবাসত।"

"ডাক্তার একরূপ জবাবই দিয়াছে। বাঁচাইতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা আমার নাই। তোমার কাকিমা সর্বদাই তোমার কথা বলে। তুমি তাহাকে যেরূপ ভালবাস, তাহার গর্ভের সন্তানও সেরূপ ভালবাসে না, একথা সে প্রায়ই বলে। তোমার পিতা মারা যাওয়ার পর তোমাদের সহিত যে মনোমালিন্য দেখা দেয়, তাহা তোমার কাকিমার চেষ্টাতেই বেশি দূর গড়াইতে পারে নাই। তোমার হয়তো এখনো ধারণা থাকিতে পারে যে, সম্পত্তি ঠকাইয়া লইয়াছি, কিন্তু রাধারমণের নামে দিব্যি করিয়া বলিতে পারি, এক কানাকড়িও ঠকাই নাই। বসত বাড়িটিও বাঁধা পড়িয়াছে এতগুলি সন্তানের মুখে অন্ন যোগাইবার জন্য। কিন্তু আজ বাঁধা দিবার মতও আর কিছু নাই। তুমি বংশের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান। ভাল চাকরী কর, আরও শুনিয়াছি ভালই হয়। তোমার কাকিমাকে সুস্থ করিয়া তোলার জন্য আমাদের থেকে তোমার দুশ্চিন্তাই বেশি হওয়া স্বাভাবিক। তাই সুনীলকে পাঠাইতেছি, যদি—"

"টাকা?"

রুবি একবার তাকিয়ে নিঃশব্দে চিঠির বাকি অংশটুকু পড়ে নিয়ে, ঘাড় নাড়ল।

"সেই রকমই বোধ হচ্ছে।"

লুঙ্গিটা পরা হয়ে গেছে। নিখিল গম্ভীর হয়ে খাটে বসে পড়ল। ওঘর থেকে কথার শব্দ আসছে। মন্টুর সঙ্গে মা কথা বলছে।

চিঠিটা ভাঁজ করে টেবলে রেখে রুবি ও নিখিলের পাশে বসল। দুজনে পাশাপাশি সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল। ঘাড় ফিরিয়ে আলমারির আয়নায় দুজনের চোখাচোখি হল। তারপর দুজনেই ঘাড় শক্ত করে বসে থাকল। দরজার কাছে গলা খাঁকরির শব্দে রুবি উঠে দাঁড়াল। শাশুড়ি।

"অনেকক্ষণ এসেছে, প্রায় ঘণ্টা দুই।"

অস্ফুটে নিখিলের মা বললেন। মেঝের দিকে তাকিয়ে নিখিল বলল, "তা কি করব?"

একটুক্ষণ চুপ থেকে তিনি আবার বললেন, "দুদিন ধরে নানা জায়গায় ঘুরেছে, মামার বাড়ি গিয়ে পায়নি, পিসীর বাড়িতেও না, শেষে এখানে এসেছে।"

"তাতো বুঝলুম, কিন্তু আমি কি করতে পারি !"

অসহায়ের মত নিখিল অগত্যা রুবির দিকেই তাকাল। সেও তারই দিকে তাকিয়ে। দরজার কাছ থেকে আবার অস্ফুটে উনি বললেন, "মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে, থাইসিস হয়েছে। অনেকদিনই তো না খেয়ে থাকত।"

"মা, বাবুলের দুধ গরম করে রেখেছেন ?" ধড়মড় করে রুবি বলে উঠল। নিখিলও সচকিতে তাকাল।

"রেখেছি।"

আশ্বস্ত হয়ে রুবি বলল, "মণ্টুকে কিছু খেতে দেওয়া উচিত।"

নিখিল উঠে পড়ল। পাঞ্জাবীটা হাতে নিতেই রুবি বলল, "খাবার আনতে চললে ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে মার জন্যেও কিছু এনো।"

মণ্টুর সামনে দিয়েই বেরোতে হবে। নিখিল বেরোতে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়াল। "কাকিমা এখন কেমন আছে।"

উঠে দাঁড়াল মণ্টু "ভাল আছে।"

ভ্রূ কোঁচকাল নিখিল, "ভাল আছে ?"

মণ্টু থতমত হল। ঢোঁকগিলে বলল, "কাল রক্ত পড়েনি।"

"কদিন এমন হয়েছে ?"

"দু-তিন মাস। কাউকে বলেনি, লুকিয়েছিল।"

"জানার পর কি হল ?"

মাথা নামিয়ে মণ্টু চেয়ারের হাতল আঁচড়াতে শুরু করল।

"খোকা শোন্।"

মার ডাকে নিখিল ভিতরে এল।

"ওকে এখন আর কিছু জিজ্ঞাসা করিসনি। মুখটা শুকিয়ে আছে কি রকম। ছোট ছেলে ভাবনা চিন্তা ওরও হয়। খাওয়া-দাওয়াও বোধ হয় হয়নি।"

কথা না বলে নিখিল হন হন করে বেরিয়ে পড়ল। গলি দিয়ে যাচ্ছে এমন সময় কে ওকে চীৎকার করে ডাকল। ফিরে দেখে অমিয়। পাড়ারই ছেলে, পেশায় ড্রাফটসম্যান।

"আপনার প্ল্যানটা আজকেই শেষ হল। পারলাম না, হাজার চল্লিশ লাগবেই।"

"কেন, আমি যে ভাবে বললুম তাতে তো অত লাগার কথা নয়।"

অমিয় ছোট্ট করে হাসল। "আপনিতো বলেই খালাস, দোতলা বাড়ীর ভিত, জমি তিনকাঠা, মেটিরিয়ালস কি রকম দেবেন তা আপনিই ঠিক করবেন, তবে যাই দিন না কেন, আমারতো মনে হয় না ওর কমে হবে। দু'বছর আগে হলে হত। আইডিয়া আছে বটে আপনার, অফিসে একজনকে আপনার করা প্ল্যানটা দেখিয়েছিলাম, খুব তারিফ করলেন।"

"অনেক ভেবেচিন্তে করা।" অস্ফুটে, প্রায় আপন মনেই বলল নিখিল।

"কবে শুরু করবেন?"

"কি জানি।"

"সেকি, এই যে সেদিন বললেন, তাড়াতাড়ি চাই, ইমিডিয়েট স্টার্ট করবেন।"

"টাকা চাইতো। কুড়ি হাজার পর্যন্ত লোন পেতে পারি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে, ভেবেছিলাম ধার নেবনা। কিন্তু......"

অধৈর্যের ভঙ্গিতে নিখিল যাবার জন্য ঝুঁকল। অমিয় সহানুভূতি জানাবার মত করে বলল, "আসল প্ল্যানটাই হল টাকা যোগাড়। প্ল্যান হলে তখন স্যাংশান করাতে প্রাণান্ত। নানান বায়নাক্কা, একে ঘুষ তাকে ঘুষ। তাই দিতে দিতেই ফতুর।

বেশ বড় করে অমিয় হাসল। তারপর বলল, "দাঁড়ান, আপনার প্ল্যানটা নিয়ে আসি।"

অমিয় প্ল্যান আনতে চলে গেল।

তখন নিখিলের সামনে থেকে গলিটা এবং বাড়িগুলো অদৃশ্য হতে শুরু করল। হু হু হাওয়া বইতে লাগল। অস্ফুট ভেসে আসছে সমুদ্রের গর্জন। চতুর্দিকে প্রবল অন্ধকার। আর সে তার তিনকাঠা জমির মাঝে দাঁড়িয়ে। তিনকোনে তিনটে পিলারের মাথা ক্রমশ উঁচু হচ্ছে দেখে চতুর্থটির দিকে তাকাতেই দেখল ছোট কাকি পিলার হয়ে দাঁড়িয়ে, হাসছে। তারপর কাঁদতে শুরু করল: "বড় কষ্টরে নিখিল, আমাকে সারিয়ে তুলবি?" নিখিল বলল: "এইটে আমার জমি, এখানে আমি বাড়ি তুলব। আমি সুখী হতে চাই।"

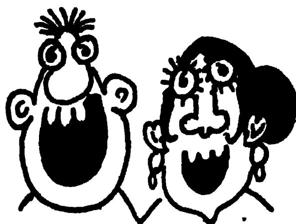
শোনামাত্র চতুর্থ পিলারটি মাটির মধ্যে আগাছার মাঝে বসে যেতে লাগল। তাই দেখে আঁতকে উঠল নিখিল :

"না, ছোটকাকী যেওনা। তাহলে আমার জমির সীমানা হারিয়ে যাবে। তুমি থাকো ছোটকাকী তুমি থাকো।"

হাত বাড়িয়ে নিখিলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অমিয় প্ল্যানটা এগে দেবার সময় বলল, "খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন মনে হচ্ছে। যদি বলেন তো, আরো কমে যাতে হয় এমন ভাবেও করা যায়।"

বিবর্ণ কণ্ঠে নিখিল বলল, "বাড়ি করা বড্ড শক্ত কাজ। নতুন প্ল্যানই বোধহয় করতে হবে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়



বিদ্যুৎ পাল সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

স্বাধীনতার ঠিক পরেই ১৯৪৭ সালের শীতকালে কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে যে ব্যবসায় সর্বাধিক পরিমাণে বাড়তে আরম্ভ করে তা হল লণ্ড্রী ও স্টেশনারী। মূলতঃ পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন লোক যখন অন্য কোথাও সুবিধে করতে পারল না তখন তারা এই দুই বৃহৎ সম্ভাবনাময় ব্যবসায় অধিক সংখ্যায় আত্মনিয়োগ করতে আরম্ভ করল। কলকাতায় বিভিন্ন পাড়ায় মৃন্ময় ষ্টোর্স, আমার দোকান, ভাগ্যলক্ষ্মী ভাণ্ডার ইত্যাদি নামের সাইনবোর্ড দিয়ে নতুন নতুন লণ্ড্রী ও ষ্টেশনারী দোকান আরম্ভ হয়ে গেল।

সদাশয় সরকার এই সব ছোটখাট ব্যবসায়ে গ্যারাণ্টর সহ টাকা ধার দিতে লাগলেন! পুনর্বাসন দপ্তর ও উদ্বাস্তু ত্রাণ বিভাগের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে উৎসাহদান শাখা এই সব দোকানের অনেকগুলিকে উপযুক্ত গ্যারাণ্টির বিনিময়ে টাকা যোগাতে আরম্ভ করলেন।

আমাদের পাড়ায় সবচেয়ে ঝকঝকে একটি দোকান দেখা দিল ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর নাগাদ। দোকানটির নাম পলস্ ট্রেডিং কোং। স্বত্বাধিকারী শ্রীবিদ্যুৎচন্দ্র পাল। সামান্য অনুসন্ধিৎসা থাকায় এবং স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে কয়েকদিনের আলাপ পরিচয়ে জানা গেল শ্রীপাল এই দোকানটি অথবা ব্যবসায় কোম্পানীর ব্যাপারে কোনরকম সরকারী সাহায্য নেন নি। তিনি পূর্বে বরিশালে ব্রজমোহন কলেজের গেটের বিপরীতে সরবৎ, ডাব, বিস্কুট, দেশলাই, কেক্ ও সিগারেট বিক্রয় করতেন। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই একটি লম্বা কাপড়ের গাজিয়া ভর্তি দশ টাকার নোট নিয়ে তিনি ভারতে চলে আসতে সমর্থ হন। সেই টাকাতেই এই ব্যবসায়ের পত্তন।

পালস্ ট্রেডিং কোম্পানীর বিবিধ উপযোগিতা থাকায় আমাকে সেখানে প্রায়ই যেতে হত। একই দোকানে লণ্ড্রী আর স্টেশনারী দু-ই ছিল। কলকাতায় এরকম আর দুটি ছিল না, নেইও সম্ভবত। এখন আর কেন যাই না তা ক্রমশ প্রকাশ্য।

নিজে সরকারী টাকা না নিয়ে দোকান করলেও শ্রীপাল সরকারী সাহায্য গ্রহণের ব্যাপারে জড়িত ছিলেন্। তাঁর ভগ্নীপতি পার্ক সার্কাসে ঐ একই সময়ে নাকি একটি স্টেশনারী দোকান দেন। সে দোকানের মূলধন ৮০০০ টাকা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে উৎসাহদান শাখা ধার দেয়। তার গ্যারাণ্টি দিয়েছিলেন শ্রীবিদ্যুৎচন্দ্র পাল। সেকথা তিনিই কথা প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন—তখন তিনি ঐ গ্যারাণ্টি সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন বলে আমার ধারণা হয়েছিল। তাঁর ভগ্নী, ভগ্নীপতি, ভগ্নীপতির দোকান ইত্যাদির কোনটিই আমার বা আমার পরিচিত মহলের কারও দেখার সৌভাগ্য হয় নি। তবে উল্লেখ্য, এই ভগ্নীপতিই তাঁর নিয়তি হিসেবে দেখা দিয়েছিল।

পরে ভুলে যেতে পারি তাই অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করছি শ্রীপাল অবিবাহিত, বয়স ৩৮।৩৯, দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি এবং ঈষৎভাবে গঠিত। লক্ষণীয় বলতে প্রথমেই চোখ, চোয়াল, দাড়ির অসামঞ্জস্য ও অপস্রিয়মাণ চুলের পলায়নপরতা উল্লেখ করতে হয়।



চোখের ওপরের ঢাকনা তুলে তিনি প্রায়ই ছেড়ে দিতেন। ছাড়বার সময় কান পেতে থেকে বলতেন, শব্দ পেলেন? পরে বুঝিয়ে বলেছেন; চোখ গর্তে বসে গেছে বলে ওপরের ঢাকনা টানতেই 'পট' নামক একটা শব্দ হচ্ছে। সু-শরীরের লক্ষণ নাকি মুখের ওপর চোখ ভেসে থাকা। তিনি সব সময়েই চোখের নীচের কালির জন্যে অস্বস্তি প্রকাশ করতেন।

চোয়াল সম্পর্কে মুখে তিনি কোন দিন কিছু বলেন নি। কেবল গালের হাড়ের সংস্থান ক্রমাগত দাঁত দিয়ে বিচ্যুত করে তিনি চোয়ালকে অবিশ্রান্ত-ভাবে গালের চামড়ার নীচে উত্থিত পতিত করেছেন। ফলে, দুই এক সময়

তার শীর্ণ হাড়সর্বস্ব মুখমণ্ডলের পার্শ্বচিত্রকে কোন মেশিনের সচল লিভার বা সকর্মক পিস্টন বলে কল্পনা করার অবকাশ ঘটেছে।

বাঁ হাতের অগ্রভাগে দাড়ি ও ডান হতের শীর্ষে মাথার চুল তিনি একই সঙ্গে বুলোতেন—তখন তার মুখভঙ্গী যা দাঁড়াত তার মানে—হায়! হায়! বুড়ো হয়ে গেলাম!

তিনি কতদুর পড়াশুনো করেছেন কিংবা আদৌ করেন নি তা ভাল করে জানি না। জানবার চেষ্টাও করি নি। আমি ছিলাম ক্রেতা, তিনি বিক্রেতা। অবশ্য ক্রমে ক্রমে তিনি উত্তমর্ণ ও আমি অধমর্ণে পরিণত হই। তথাপি আমাদের সম্পর্কে বহুকাল টিঁকে ছিল। এখনও পুরোপুরি ছিঁড়ে যায় নি। তবে আমিই রাখি না। সে কারণও একে একে প্রকাশ্য।

আমি মোটামুটিভাবে তাঁর ব্যক্তিগত প্রায় সব কিছুই জানার সুযোগ পাই। কারণ, তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যা, বিপদ আপদে আমিই উপদেষ্টা ছিলাম। ষোল বছর হল আমরা কাছাকাছিই আছি। তবে এখন আমাদের মধ্যে খুব কম কথা হয়। যখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তখন তিনি ছিলেন দোকানের মালিক। এখন তিনি সেই দোকানের কর্মচারী।

দীর্ঘ ষোল বছরের মধ্যে তাঁর অনেক পরিবর্তন আমার চোখের সামনেই হয়। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁর তিনটি উপসর্গ জোটে।

১। আমি তাঁকে একটি ডাইরি উপহার দিয়েছিলাম। টাটা কোম্পানীর। একদিকে রোজনামচা লেখার জায়গা। অন্যদিকে ভারত-বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের একখানি করে বিখ্যাত ছবির রঙীন প্রতিলিপি। ডাইরির শেষদিকে ভারতে ও বিদেশে টাটা কোম্পানীর ব্যবসায় উদ্যোগের বিবরণ ও মূলধনী অর্থের পরিমাণের একটা হিসেব ছিল।

এই ছবি তাঁকে শিল্পবোধে জাগরিত করে এবং অপরদিকে ডাইরির প্রান্তভাগের ব্যবসায়ী-উদ্যোগে-টাটার ক্রমবিস্তারের বিবরণ তাঁকে ব্যবসায় সম্পর্কে সচেতন ও উদ্যোগী করে তোলে। এই ডাইরিতে তিনি দীর্ঘকাল তাঁর জীবনযাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।—তবে, তারবার্তার ভাষায়। ডাইরিটি বর্তমানে আমার কাছে আছে। সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে কিয়দংশ আমি এখানে উদ্ধৃত করব। কেননা, তাঁর সঙ্গে যাঁরা আগে ব্যবসায় সম্পর্কে এসেছেন এবং ভবিষ্যতে আর যাঁরা আসবেন এই বিবরণ তাঁদের পক্ষে উপকারী হবে।

২। একটি দুধেল ছাগল। আকার বৃহৎ ও কিঞ্চিৎ উগ্র স্বভাবের। এই ছাগল বা রামছাগল ক্রয়ের পিছনেও আমিই ছিলাম। মৌখিকভাবে কোনদিন ছাগল কিনতে আমি তাঁকে বলি নি। টাটার ব্যবসায় উদ্যোগ—অর্থাৎ আমার উপহার দেওয়া ডাইরিই তাঁকে এই ছাগল সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি ছাগলটিকে দোকানের সামনে ট্রামের তার লাগানো খুঁটিতে বেঁধে রাখতেন। স্বল্প পরিসর রাস্তা দিয়ে ট্রাম, বাস, প্রাইভেট গাড়ি যাতায়াতের পরেও যেটুকু চলাচলের পথ কোনমতে থাকত তা দিয়ে লরী এলে দোকানের সামনে বা কাছাকাছি দুর্ঘটনা ঘটত। কারণ, ছাগলটি বাঁচানোর জন্যে সকল লরী চালকেই একবার দু'বার গাড়ি নিয়ে ড্রেনের দিকে নেমে যেতে দেখা গেছে।

এই ছাগলের জন্যে তিনি তাজা ঘাস সংগ্রহ করতেন। একবার তাকে পাল খাওয়ানোর জন্যে তিনি প্রকাশ্য রাস্তায় দুর্গন্ধযুক্ত একটি বৃহৎ পাঁঠাও আমদানী করেন। ফলে, কিছু দিন পরে অনেক দিনের জন্যে তার কোলে আমরা সর্বক্ষণ একটি চঞ্চল চুকচুকে কালো শিশু রামপাঁঠি দেখতে পয়েছিলাম।

এখানে একটি জিনিস বলা দরকার। শ্রীপালেরা দুই ভাই। তিনিই বড়। ছোট ভাই রাইটার্স বিল্ডিং-এ কোন মন্ত্রীর ঘর পাহারায় নিযুক্ত পুলিস ছিলেন। এখনও আছেন।

একবার আমাদের প্ররোচনায় শ্রীপালের বিবাহেচ্ছা হয়। কনে দেখতে গিয়ে ছোট ভাই কনেকেই বিয়ে করে ফিরে আসেন। এসে, পৃথক বাসায় ওঠেন। সেই থেকে দুই ভাইর মুখ দেখাদেখি বন্ধ। ছোট ভাইর তিনটি সন্তান। তিনি অফ টাইমে অর্ডার সাপ্লাই করেন। দাদার কথা উঠলে বলেন, অপদার্থ।

ঐ ছোট সন্তান ক'টির প্রতি শ্রীপালের আকর্ষণ ছিল। কিন্তু তিনি কখনও তাদের কোলে নেন নি। ছাগলের দুধ নিয়ে সূর্যোদয়ের পূর্বে তিনি নির্দিষ্ট বাড়ি বাড়ি দিয়ে আসতেন। কোন সন্তান-সন্ততি না থাকায় শিশু রামপাঁঠিকে তিনি বহুদিন আদরে আদরে কোলেই রাখতেন। পরে, পাড়ার মাংসলোলুপ দুর্বিনীত গুণ্ডাশ্রেণীর যুবকেরা সেটি কিভাবে হস্তগত করে তা আমি জানি না।

৩। হারমোনিয়াম। এটি বাজনা হিসেবে করায়ত্ত করার পক্ষে

সুবিধের বলে শ্রীপাল তাঁর দোকানের পার্শ্ববর্তী হিজড়েদের আড্ডা থেকে সস্তায় কেনন। গভীর দুপুরে কিংবা সন্ধ্যায় ক্রেতার ভিড়ের পূর্বে তিনি নিয়ে বসতেন। দীর্ঘকাল তিনি একটি গানকে ঐ হারমোনিয়ামে ধরবার সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। হারমোনিয়ামটা কোত্থেকে কেনা হয় তা আমরা জানতে পারি একটি কারণে। হিজড়েদের আড্ডা ও শ্রীপালের দোকানের মধ্যে একটি দুর্গন্ধ গলিতে আমরা প্রায়ই পেচ্ছাব করতাম। আশেপাশে কোন জায়গা না থাকায় ওখানেই যেতে হত। ফলে, হিজড়েদের আড্ডাতেও দু'একবার যেতে হয়েছে। প্রথমবার ঢুকেই দেখতে পাই কলকাতায় সহজে বহনীয়-চুরি-যাওয়া প্রায় সব কিছুতেই সেখানে বিক্রয়ের জন্যে মজুত। সেলাইকল, গ্রামোফোন, রেকর্ড, এনসাইক্লোপিডিয়া, হারমোনিয়াম, ফেলমারা ব্যাঙ্কের প্রায় দুইমণ ওজনের গাদা গাদা নতুন চেক বই থেকে আরম্ভ করে টেবিল ফ্যান মায় বড়ুয়ার প্রেকরা পুরো ষোল রিলের একখানা পুরনো বাংলার ছাব। অর্থাভাবে সেখানে আমাকে তিন জোড়া পাম্পসু ও প্রায়ই সের দরে খবরের কাগজ বেচতে হয়েছে।

এই উপসর্গ তিনটির কোনটিই এখন আর তাঁর নেই। তাঁর ক্রেতা-সাধারণের উপকার হবে এই বিবেচনায় সেই ডাইরি থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু কিছু অংশ এখানে উপহার দেওয়া হল।

পরে সর্বসাধারণের কথা চিন্তা করেই পল্‌স ট্রেডিং কোং-এর একদা স্বত্বাধিকারী ও অধুনা কর্মচারী শ্রীযুক্ত বিদ্যুৎচন্দ্র পাল সম্পর্কে একটি নিয়মাবলী দেওয়ার চেষ্টা করব।

যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন—সে ক্রেতাই হোন্ কিংবা ব্যক্তিগত উপদেষ্টাই হোন—তাঁদের সকলের পক্ষেই এটা উপকারী হবে বলে আশা করি। কারণ, আমরা যাঁরা একাধারে তাঁর উপদেষ্টা ও ক্রেতা হিসেবে সুদীর্ঘ ষোল বছর আগে তাঁর দোকানে দেখা দিয়েছিলাম তাঁরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের সুবিধের জন্যেই তাঁর সম্পর্কে একটা খসড়া নিয়মাবলী তৈরী করে নিয়েছিলাম। এতে আমাদের সময়ও বাঁচত এবং তাঁর সঙ্গে দেখা হলে যে সব সুবিধে অসুবিধের অবকাশ ছিল সেগুলিও এই নিয়মাবলীর সাহায্যে আমরা আয়তনে অনেক হ্রস্ব করে নিতে পেরে ছলাম। সে খসড়া উপস্থিত আমার হাতে নেই—সন্ধান করে কারও কাছে পাইও নি। তাই স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে দেওয়ার ফলে কিছু অসম্পূর্ণতা দোষ থেকে যেতে পারে।

উপস্থিত ডাইরিতে যাচ্ছি। মনে রাখতে হবে এই সময়েই শ্রীযুক্ত পাল স্বত্বাধিকারীর পদ থেকে স্বেচ্ছায় কর্মচারীর ভূমিকায় নেমে আসার উদ্যোগ করছেন। কারণ, তাঁর নিয়তি। তাঁর ভগ্নীপতি। তাঁকে আমরা কোন দিন দেখি নি। ডাইরিতে তিনি ভোম্বল নামে উল্লিখিত আছেন।

মনে রাখতে হবে A.M. এবং P.M. সম্পর্কে শ্রীযুক্ত পালের নিগূঢ় সন্দেহ বা দ্বিধা ছিল। ফলে, যিনি এই ডায়েরির কাছাকাছি হবেন তাঁকে নিজের সুবিধে মত A.M. এবং P.M. সাজিয়ে নিতে অনুরোধ করছি।

ডাইরির শাদা রোজনামচার জায়গায় তিনি দিনলিপি লিখেছেন। মনে রাখতে হবে তার বিপরীত পৃষ্ঠায় টাটা কোম্পানী ভারত বিখ্যাত ও দু'একজন জগবিখ্যাত চিত্রশিল্পীর একখানি করে ছবির রঙীন অনুলিপিও উপহার দিয়েছেন।

এই ডাইরি রচনার সময় শ্রীযুক্ত পাল ডাইরির উপান্তে টাটা? কোম্পানীর ব্যবসায় সাফল্যের পরিমাণ সম্পর্কে প্রায়ই ওয়াকিবহাল হয়েছেন। ফলে, সেখান থেকেও দু-একটি বিবরণ তুলে না দিয়ে উপায় নেই। উপরন্তু, চিত্রশিল্পীদের পরিচয়ও শেষে দেওয়া আছে। এগুলিও নিশ্চয় শ্রীযুক্ত পালের মনে রেখাপাত করেছিল। ফলে, তারও কিছু কিছু প্রসঙ্গ এই ডাইরিতে আসবে। মনে রাখতে হবে ডাইরিটি ১৯৫৬ সালের শেষ থেকে ৫৭ সালের শেষ অব্দি।

প্রথমেই বাঁ হাতে কে. এচ্. আরা অঙ্কিত 'মিডনাইট' ছবিটি রয়েছে। একটা টেবিলে ফুলের টবে কিছু ফুল ও উদ্ভান্ত বাহারি পাতা। টেবিলটি চক্‌চকে বলে তার প্রতিবিম্বও পড়েছে। ঘরের জানালা হলুদ—দেওয়াল গিরি মাটির। একটা লাল দরজা। মৌলিক গবেষণা সংক্রান্ত টাটা ইন্সটিট্যুট কর্তৃক এই নিস্তব্ধ ছবিটি সংগৃহীত। পাশে ২৬শে ডিসেম্বরের পৃষ্ঠায় সোমবার থেকে আরম্ভ করে ১লা জানুয়ারী অব্দি শ্রীযুক্ত বিদ্যুৎচন্দ্র পাল সম্ভবত মধ্যরাত্রির সঙ্কল্প হিসেবে লিখেছেন—

28. 11. 56. আজ হইতে আমার Pland হইয়াছে এবার যাহা টাকা জমাইব সব টাকা খাজা ও লজেন্স কোম্পানীর জন্ত খরচ করিব। এছাড়া Holsell Business করিব—এই আমাদের Pland.

ইতি :—

বি. সি. পাল

২৮.১১.৫৬

PAUL'S TRADING CO.
BIDUYT CHANDRA PAUL.
29/1/2B, TOLLYGUNGE CENTRAL ROAD.
CALCUTTA-3

এই মধ্যরাত্রির সঙ্কল্পের উৎস সম্ভবতঃ ডাইরির উপান্তের বিবরণ। যে রকম—

TATA SONS LIMITED
(Established in 1917)
TATA INDUSTRIES LIMITED
(Established in 1945)

Successor to a small trading farm founded by Jamsetji Tata in 1887, Tata Sons Limited, a private Limited Company, which owns Tata Industries Limited, has built up the largest single aggregation of Indian Industry, with a total financial investment of Rs. 136 crores (£ 102,000, 000) 116, 600 employees and an annual output of goods and services valued at Rs. 61 crores (£ 45, 750,000).

About 85 per cent of Tata Sons Capital is held by philanthrophic trusts endowed by members of Tata Family.

ঠিক এই সময়েই শ্রীযুক্ত পালের কাছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে উৎসাহদান শাখা থেকে একটি চিঠি আসে। শ্রীযুক্ত পাল আমাকে চিঠিটা দেখান। তাঁর ভগ্নীপতি যে ৮০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করেন তা খুঁজে না পেয়ে সরকার ইন্সপেক্শন করে জানেন যে, ভগ্নীপতিটি দোকান বেচে দিয়ে সেই টাকায় নির্বিঘ্নে সংসার করছেন। অতএব শ্রীযুক্ত পাল আপনি যখন গ্যারাণ্টর তখন অবিলম্বে ঐ ৮০০০ টাকা সরকারী তহবিলে জমা দিন। নতুবা সরকারকে বিভাগীয় আদেশবলে সম্পত্তি ক্রোকের পথ দেখতে হবে।

আমার উপদেশ ছিল : দোকানটি আমার নামে বেনামা করুন। শ্রীযুক্ত পাল তা করেন নি। কারণ, তখনও নানা কারণে আমাদের ব্যাডমিণ্টন ক্লাবের নামে তাঁর দোকানে দু-ডজন কেদারের দাম বাকি ছিল—সঙ্গে, হিসেবের দেওয়ালে কিছু সিগারেটের উল্লেখ ছিল।

Directors of Tata Sons and of Tata Industries : Lady Ratan Tata, Mr. J, R. D. Tata (Chairman), Sir. Homi Mody, Mr. N. H. Tata, Mr. A. D. Shroff, Mr. J. D. Choksi, Mr T, V. Baddeley, Sir Jehengir Gandhy, Mr. D. R, Tata, Mr. A. P. Narielwala, Mr. S. Moolgaokar, Mr. K. A, D. Naoroji, Mr. K. C. Bakhle and Mr. M. K. Powvala.

কিন্তু বলে রাখা দরকার ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে পলস্ ট্রেডিং কোং-এর লণ্ড্রি বিভাগটি তুলে দিতে হয়।

প্রধান কারণ, পাড়ার থানার ও-সি'র ইউনিফর্মটি দোকানের ইস্ত্রি বিভাগে অর্ধদগ্ধ হয়।

গৌণ কারণ, মাসকাবারি পরিশোধযোগ্য তাড়া তাড়া লণ্ড্রির বিল শ্রীযুক্ত পালের সহযোগী ব্যবসায় ও গোষ্ঠদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছাগলটি একদা উদরসাতের চেষ্টা করে বিফল হলেও লালা ও চর্বণ উদ্যোগে তার লেখাগুলির মর্মোদ্ধারে বাধা জন্মায়।

শ্রীযুক্ত পাল স্মৃতি থেকে যে সব দাবি উত্থাপন করেন তার মধ্যে দুটি পাজামা একাদিক্রমে দু-মাস কাচানো বাবদ আমার নামও ছিল। কিন্তু উপদেষ্টা পদে আসীন থাকায় আমি নির্বিবাদে রেহাই পাই।

Address : Bombay House, Fort Bombay-1
Telegrams : TATA SONS, Bombay.
TATIND. Bombay.

এই সময়েই তিনি ভগ্নীপতির সন্ধানে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন।

শ্রীযুক্ত পালের মধ্যরাত্রির সঙ্কল্পের পাশে 'মধ্যরাত্রি' ছবিটির শিল্পী পরিচিতিতে বলা হয়েছে :

K. H. ARA, though he displays such Versatility in his paintings, did not study at any Art School.

১৯শে জানুয়ারী থেকে ২০শে জানুয়ারী শ্রীযুক্ত পালের লিপিবদ্ধ ডাইরিতে লেখা আছে দেখছি—

6 P. M. to 7 P.M.	to 12 P.M.	3 P.M. to 7 A.M.
প্রথমে খাতা লেখা	প্রথমে দেবতা পূজা	বাজারে যাওয়া
তারপর হাতমুখ ধোয়া	করা তারপর	দেবতা পূজা
	Business	তারপর
	বাজারও ভাল নয়	Business

5·30 to 7-15 P.M.	7-15 to 12-30 A. M.	4 A. M. to 10 A.M.
প্রথমে Exercise	আজগে বাজার	Business
তারপর বাজন বাজান	ভাল	দুধ বিক্রয়
তারপর মাখন ঠিক করা		তারপর বাড়ী আসা
তারপর হাতমুখ ধোওয়া ও খাওয়া		

পাশের ছবিটি ডঃ টি. সিমেশ-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত ভি. এস্. গাইতোণ্ডে অঙ্কিত 'দি রেড রিবন।'

একটি রঙীন যুবতী বাঁ হাতে-দু-আঙুলে একটি মুদ্রাধৃত অবস্থায় স্তব্ধ— মাথায় একটি লাল রিবন। মুখের বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। দিনলিপির তারিখ দৃষ্টে বিবেচনা হয় এই সময় শ্রীযুক্ত পালের বিবাহেচ্ছা হয়। কিছু দিন আগে ছাগল আমদানী করা হয়। শিল্পীর পরিচয়ে বলা হয়েছে তিনি shed the traditional style in 1951 for abstract painting.

সম্ভবতঃ এই সময়ে শ্রীযুক্ত পালের বয়ানে জানতে পারি তিনি ভগ্নীপতির সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু যেখানে আছে সেখান থেকে টাকা উদ্ধার করা অসম্ভব। ভগ্নী ও ভগ্নীপতি একই সঙ্গে তাকে মারধোর ও মৃত্যু-ভয় দেখিয়েছে। ফলে, একা সেমুখো হওয়া বিপজ্জনক।

মাঝে একটি ছবি আছে। এস, জি. নিকমের আঁকা লাল রঙের গণেশ। তারপর (তারিখ উল্লেখ অর্থহীন)—

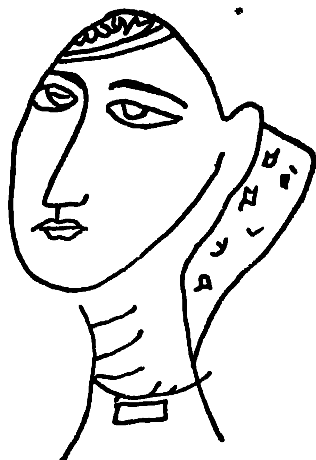
5-30 P. M. to 10 A.M.

[P. M. এবং A.M. শ্রীযুক্ত পালের পক্ষে বিড়ম্বনা।]

বাজনা + খাতালেখা + Business — মাল আনা + গান (বাজার ভাল)।

ওই সময়ে সম্ভবতঃ সবাই তাঁর দোকানের ধার শোধ করছিল। আমাকে তিনি কোন দিন তাগাদা দেন নি। অসম্ভব বিশ্বাস করতেন। 5-30 P.M. to—

বাজনা + খাতা লেখা + Businness + বিশ্রাম + গান।



আজগে বাদলার দিন (বাজার ভাল নয়)।

তারিখ দেখে বোঝা যাচ্ছে ঐ সময়ে আমরা তার ভাইয়ের বিয়েতে নৈহাটি থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে বৃষ্টি ভিজে ফিরছি।

মাঝে এই ছবিটি আছে—

ছবিটি কৃষ্ণ বর্ণের। নাম, দিবাস্বপ্ন। শিল্পী শ্রীরাবাল।

মূল ছবিতে এখানকার রেখাগুলো সাদা, সাদা জায়গাটুকু ঘোর কালো। তারপর কয়েকটি পাতা একেবারে সাদা। মাঝে Ploughing, Ayahs in Marine Drive, Bhopal Road, Beggar Woman, Faded Flower, Lady with a bird ও Huts and Poplars আছে।

পাশে লেখা Dull market falls in this month. লেখাটি ধরে ধরে মক্স করে সাজান। বোধ হয় আমিই ডাইরি দেখে মন্তব্য করেছিলাম তখন।

6 a.m. to 7. a.m.—দাড়ি কামান—পর বার দোকানে আসা। দোকানে আসিয়া ঝাড়ু দেওয়া—দেবতা পূজা। তারপর ঠোঙা করা। তারপর বাজনা।

আর এক জায়গায় 4-30 p.m. Business, তারপর পড়া।

তারপর Business. তারপর লেখাপড়া, তারপর ঠোঙা তারপর Business.

উপান্তে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির টাকার অঙ্কের নীচে শ্রীযুক্ত পালের নীল পেন্সিলের গভীর দাগ—

TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED

Subscribed Capital Rs. 17,33, 76,013.

অপর তিনটি কোম্পানীর **Subscribed Capital Rs. 12,83,72, 000.** নীচে শ্রীযুক্ত পালের দাগ। অন্য কয়েকটি কোম্পানীর মূলধন ইত্যাদি শ্রীযুক্ত পাল ২৬শে ফেব্রুয়ারী একজায়গায় পর পর সাজিয়ে একটা যোগ অঙ্ক রেখেছেন।

৮,৮৩,০০,৯০০	১,২৫,০০,০০০
১,০০,০০,০০০	১২,৬৮,০০,০০০
২.০০,০০,০০০	১,০৬,৮২,০০০
৫,০০,০০,০০০	১,২৭,৫৮,৭৮১
৭,০০,০০,০০০	২,৩৫,৬৭,০০০
৩০,০০,০০০	
	...০০০০০০৮১

শ্রীযুক্ত পাল এই যোগটি অসমাপ্ত রেখেছেন।

তিনি ঐ সময় পথ খরচ দিয়ে আমকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে উৎসাহদান শাখায় পাঠান। আমি দুপুর রৌদ্রে দেখা করতে গিয়ে জানি যে, কার্ড ছাড়া ও আগে-থেকে-ঠিক-না করে দেখা হয় না তবু চেষ্টা করে ভেতরে ঢুকে বকা খাই। বাইরে এসে আমি একটি ঠাণ্ডা ঘরে সিনেমা দেখি। এক মাসে পর পর দিনই একই ঘটনা ঘটে।

তারপর কয়েক পৃষ্ঠা ঘন ডাইরি :

5-30 a m. প্রথমে উঠিয়া exercise তারপর দাড়ি কামান। 6-40 a. m. দোকানে আসিয়া ঝাড়ুদান ও দেবতা পূজা।

এরপর সব কয়দিনই ক্রমাগত দেবতা পূজা। মাঝে মাঝে—

তারপর খিদিরপুর যাওয়া। ভোম্বল তর্ক করিল।

তারপর সঙ্গীত।

তারপর কাপড় কাচা ও istri।

তারপর বাঁশী বাজানো।

তারপর cinema।

তারপর পড়া ও অঙ্ক।

Business।

তারপর ঠোঙা করা।

ঘাস ক্রয়।

5A.M.প্রথমে উঠিয়া 'রমাকে' লইয়া মর্নিংওয়াক।

5-30 A.M. প্রথমে উঠিয়া exercise, তারপর কিছুক্ষণ বিছানায় ঘুম, কারণ—আমার শরীটা ভাল নয়।

তারপর অঙ্ক+তারপর ঠোঙ্গা+তারপর হাত মুখ ধোওয়া+তারপর Business+তারপর খিদিরপুর যাওয়া+তারপর সঙ্গীত, হারমোনিয়মটিতে ভাল বাঁশী হয়+আজগে শরীরটা খুব ভাল নয়+সঙ্গীত করা+5 A.M. প্রথমে উঠিয়া ইংরাজী কাগজ পড়া+Business ও Account করা—শরীরটা ভাল নয় কারণ, সর্দ্দি ও কাশী হইয়াছে+5-50 A.M.—আকাশের আবহাওয়া খুব ভাল নয়—সারাদিনই বৃষ্টি হইয়াছে+সন্ধ্যায় খিদিরপুর যাওন+ফিরিবার পথে বাজার ভ্রমণ—ভোম্বল নাই।

ভগ্নীপতি সম্ভবতঃ খিদিরপুরে পলায়ন করে। শ্রীযুক্ত পাল শেষ দিকে তাঁর হারমোনিয়ামে সি সার্পে শেষের রিডটি চেপে ধরে বাঁশী বাজাতেন।

রাম তাঁর ছাগলের আদরের নাম। ঘাস তারই জন্যে।

এই সময়ে সরকারী নোটিশ এসে গেছে। এক বছর সময় পাওয়া গেছে। শ্রীযুক্ত পাল তখন অভ্যেস বজায় রাখলেও ছাগলের দুধের ব্যবসায়ের আয়তেই জীবনধারণ চলছিল। দোকানের লাভ কিস্তিবন্দীতে সরকারী ধার শোধে ব্যবহৃত হচ্ছিল।

মাঝে দু-খানি ছবি—Coloured Windows এবং Washing Day। একটি মারাঠি মেয়ে মালকোছা মেরে শাড়ি ধুতি শুকোতে দিচ্ছে। শিল্পী ভজুভাই ভগৎ।

তারপরেই পাওয়া যাচ্ছে—

'এছাড়া ব্যাঞ্জো বাজান ও কয়লা ভাজা'।

এমন সময় পাশের চায়ের দোকানে শ্রীযুক্ত পালের ভাত হত। কিছু দিন পরে তাকে উনুন নিকোতেও দেখা যায়। হারমোনিয়ামের একটি রিডের তার ওপরে ঝুলে দিয়ে তখন তিনি ব্যাঞ্জো বাজাতেন। এই সর্বার্থ-সাধক হারমোনিয়মটি তখন তাঁর মনের মত আওয়াজ সরবরাহ করত। আমি তখন যন্ত্রটির জন্যে পর পর দু-দিন খদ্দের এনেছি। তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন, দুঃখের দিনে সাথী বলে।

এর কিছু দিন পরেই ছাগলটি নিরুদ্দেশ হয়। দোকানে দুপুরবেলা ইন্দ্র টান ছোট ছেলে মেয়ে লজেন্স বিস্কুট চুরি করিতে আরম্ভ করে। একটি ছোট মেয়ে ধরা পড়ে। কিন্তু শ্রীযুক্ত পাল তাকে তার বাবার হাতে দিয়ে নিজেই বকা খেলেন, সাবধানে রাখেন না কেন?

তখন পলস্ ট্রেডিং কোং-এর আশেপাশে অনেকগুলো দোকান দাঁড়িয়ে গেছে। ইতিমধ্যে একজন বিত্তশালী লোক ক'দিনই সন্ধ্যের দিকে ঘুরে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য: গুডউইল সুদ্ধ ভাল পোজিশনের এই দোকানটি তিনি কিনবেন। শ্রীযুক্ত পাল দোকানেই থাকবেন। উদ্দেশ্য সফল হলে আমাকে ১০০ টাকা দালালি দেবেন বলায় আমি ঠিক এই সময়েই কিছুটা উদ্যোগী হই।

5 P.M. প্রথমে উঠিয়াই সূর্য উদয় দেখেন। একমাস হইল রাম নিরুদ্দেশ।

4-30 p.m. Business—আজ শরীরটা ভাল নয়—তারপরেও দোকানে আসিতে হইয়াছে। দোকানে ইন্সপেক্টর বাবু রাত আটটার পর দোকান খোলা রাখায় ফাইন করিবেন বলিলেন। ৫ টাকায় একখানি নোট দিতে ক্ষমা করি.লন। কিন্তু ধার শোধ দিব কিরূপে?

2 p.m. হারমোনিয়ামটি বেহালার মত বাজিতেছে।

কলিকাতায় ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়াছে—পূজা করিয়া Business আরম্ভ তারপর অঙ্ক করিয়া বাড়ী যাওয়া।

এখানে দেখা যাচ্ছে সেই বড় যোগ অঙ্কটি শেষ করা হয়েছে.

5 a.m.—তাহা হইলে টাটার মোট কত টাকা ব্যবসায়ে খাটিতেছে?—আজ কাগজে সংবাদ ..ı Actident-এ ২ জন নিহত ও ৩৮ জন আহত—কিন্তু ইহারা সত্য ঘটনা দেয় নাই।

5-40 a. m.—সকালে উঠিয়া লেবু চা। আজ exercise করি নাই। কারণ, আমার শরীরটা ভীষণ খারাপ। পেটের শিরায় টান ধরিয়াছে—সেই জন্য শরীরটা ভাল নয়।

5 a.m. প্রথমে উঠিয়া বেহালা। কালই হারমোনিয়ম কিনিতে লোক আসিবে। শ্যামলবাবু এত খরিদ্দার কোথায় পায়? দোকান কিনিবার লোকও তিনিই আনিতেছেন। তিনি আমার বড় বন্ধু। আমি ত আজকাল খবের পাই না।

5 a.m. বাঁশী বাজান। 5 p.m. বেহালা বাজান। 7 p.m. হারমোনিয়ম বাজান।

বাড়ী যাওয়া, বাঁশী বাজান, ঠোঙ্গা করা, বাড়ি আর যাব না। Business করিয়া ঠোঙ্গা করা। Accound লেখা করিয়া ঝাড়ু দেওয়া। শ্যামলবাবুর সঙ্গে সেই লোকটি আসিবে। দোকান কিনিতে চায়। শরীরের অবস্থা ভাল নয়।

5 a.m.—7 p.m. Business, হারমোনিয়ম বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ২৫ টাকা দাম ঠিক হইল। Advance ৫ টাকা হাতে পাইয়াছি। শ্যামলবাবুর এত পরিশ্রম গেল এই ভাঙ্গা হারমোনিয়ামটির জন্যে। তিনি উহার মধ্যে ৩ টাকা লইলেন। ৩৫ টাকায় তিনিই হারমোনিয়মটি কিনাইয়াছিলেন। তখন নিয়াছিলেন ১০ টাকা।

এখানে ব্লু ও কালো রঙের একটি ছবি। নাম, The Drak Lady. শিল্পী, লক্ষ্মণ পাই। শ্রী জে. লাফলিনের সৌজন্যে ছবিটি পাওয়া গেছে। উপান্তে শিল্পী পরিচিতিতে লেখা আছে he loves to paint 'all that surrounds me'.

এইখানে শ্রীযুক্ত পালের অব্যবহৃত একটি ডাকটিকিট পাওয়া গেল।

৭ই জুলাই শনিবার লেখা আছে—9-30 p.m. আজ হরতাল সেই জন্য সারা সকাল দুপুর আমোদ-আহ্লাদে কাটিয়াছে। শ্যামলবাবুর লোকটি আগামী মাসে দোকান কিনিবার টাকা আনিবে।

১৬ই জুলাই—Business আরম্ভ করিয়া বাড়ি যাওয়া 9-30 a.m. মন ভাল নাই।

10-45 a.m. ইংরাজী কাগজ পড়া। একটি পিয়ানো বিক্রয় হইবে। মূল্য ১১০০ টাকা।

দেবতা পুজা। বিকালে ঘুম হইতে উঠিয়া কোন কাজ হয় নাই। কারণ, শরীরটা ভীষণ খারাপ। যাই হোক্। খালি গলায় সঙ্গীত করিয়া ঠোঙ্গা করা।

12 a.m. (22শে জুলাই)—তারপর বাজার যাওয়া। 4-30 a.m. প্রথমে উঠিয়া কোন কাজ হয় নাই। কারণ শরীরটা ভীষণ দুর্বল। সেই জন্য কাজ হয় নাই যাই হোক্। Account লেখা—ঠোঙ্গা করিয়া পশম কাটা তারপর বাড়ি যাওয়া।

অঙ্ক ও সঙ্গীত। পশম কাটা। খালি গলায় গান ও ইংরাজী কাগজ পড়া। আজ একটি ছাগল দোকানের সম্মুখে আসিয়াছিল। রাম নয়। রামের বংশধর কি না কে বলিতে পারে? সেও ত অনেক দিন হইল নাই। দেবতা পূজা, Business আরম্ভ।

আজ স্বাধীনতা দিবস। শ্যামলবাবুর লোকটি দর কমাইবার চেষ্টায় আছে। শ্যামলবাবু বলিতেছে—ছাড়িয়া দিন—এরপর দর কিন্তু আরও নামিয়া যাইবে। ঠোঙ্গা করিয়া বাড়ি যাওয়া।

মাঝে একটি ছবি ছিল। নাম ফিশারমেন।

12 a.m. শোকেস রং করিয়া বাড়ি যাওয়া। কাল টিনের কৌটায় রং দিব। 4 p m. ভাইপোদের জামা কাপড় কেনা। তারপর কাঠ কিনিতে যাওয়া—কয়লা পাওয়া যাইতেছে না।

সন্ধ্যায় Business করিয়া দেবতা পূজা। শ্রীকৃষ্ণের মালা গাথা—তারপর ঠোঙ্গা করিয়া বাড়ি যাওয়া।

আর একদিন—

দুপুর বেলায় শো কেস রং করিয়া বাড়ি যাওয়া।

5-35 p m. প্রথমে ঐ কাজ হইয়াছে।

5-50 p.m. প্রথমে ঐ কাজ হইয়াছে।

শ্যামলবাবুর ডাইরির ছবিগুলি ভাল। একটি মেয়ে ব্লাউজ পরে নাই—ডান হাতে দড়িতে একটি নধর ছাগল। ছবির নীচে লেখা ডি পি. দালাল। ছবির নাম বোঝা যায় না।

পরে ডাইরির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেছে ছবিটির নাম 'মুগ্ধ'।

5-30 a m. প্রথমে উঠিয়া exercise ও ঐ কাজ।

5-43 a m. প্রথমে উঠিয়া কোন কাজ হয় নাই কারণ আমার শরীর খুব ভাল নয় যাই হোক্। 7 a m. Business আরম্ভ ও চায়ের টিন রং করা ও তারপর বাড়ি যাওয়া।

5-50 p.m. প্রথমে উঠিয়া exercise এবং ঐ কাজ।

6 p.m. প্রথমে উঠিয়া দাড়ি কামান ও ঐ কাজ।

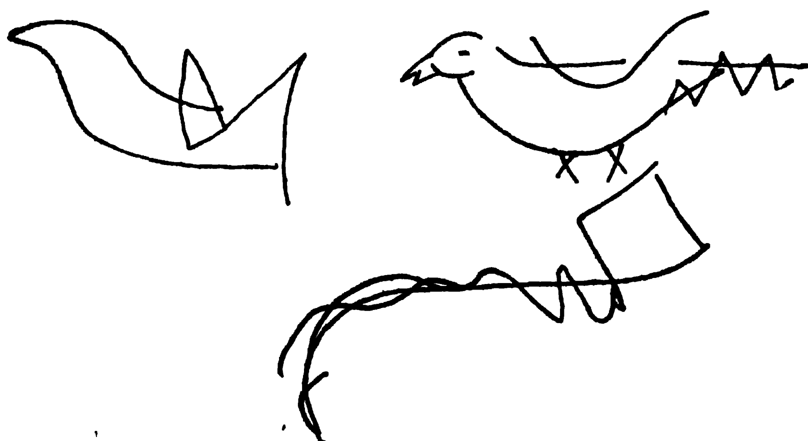
২৫শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার—5-a.m. প্রথমে উঠিয়া গল্পের বই পড়িয়াছি কারণ সারাদিন বৃষ্টি এবং হরতাল হইয়াছে যাই হোক্।

২৮শে সেপ্টেম্বর—5 a.m.—প্রথমে উঠিয়া রান্না ঘরের টিন দেওয়া

করিয়া খালি গলায় গান। শ্যামলবাবুর লোক অবনী দত্ত দোকান কিনিতেছে। দর এক হাজার নামিয়া গিয়াছে। পাশের ছবিতে একটি অল্পবয়সী ঘোড়া বড় ঘোড়ার পেটে ঢুসাইয়া ঢুসাইয়া দুধ খাইতেছে। শ্যামলবাবু ছবিটি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ঘোড়ার দুধে দৈ পড়ে না। এইবেলা দোকানটা বেচে দিন।

১২ই অক্টোবর শুক্রবার—4-15 a.m. প্রথমে উঠিয়া কালীঘাটে পূজা দেওয়া। আজ হইতে অবনীবাবু মালিক। তিনি আমাকে শ্যামলবাবুর সঙ্গে মিশিতে নিষেধ করিয়াছেন। অথচ কাল দুপুরেও দুই প্যাকেট সিগারেট বাকি দিয়া ফেলিয়াছি।

6 p.m.—আজ Translation আরম্ভ করিলাম। টানা করিয়া গেলে ইংরাজী বশ হইবে।



১৯শে অক্টোবর শুক্রবার—5-10 a.m. প্রথমে উঠিয়া ইংরাজী কাগজ পড়া। অবনীববু ভিতরে বসেন। আমি পান-সিগারেটের কাছে টুলে বসি। আজ কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা—সেই জন্য আজ বিকালে দোকান বন্ধ থাকিবে। দোকানে প্রথমবার লক্ষ্মীপূজায় পূজা হইয়াছিল।

২০শে অক্টোবর 5-10 a.m. প্রথমে উঠিয়া কুকুরের সেবা করা তারপর কিছু ঘুম। সরকারী ধার শোধ হইতে চলিয়াছে। শ্যামলবাবু পরশু অবনীর নিন্দা করিলেন। লোকটা চামার।

১৫ই নভেম্বর—আজ সম্পূর্ণ বন্ধ।

২৪শে—ডাকঘরে গিয়া টাকা রাখার নিয়ম জানা—৩০০০ টাকার ৪২ টাকা সুদ। অবনী জানিতে বলিয়াছিল। আমার যদি থাকত—দোকান করিতাম।

২৫শে অক্টোবর—আজ ভাইপোদের দেখিতে যাইব Business করা ও Stock নেয়া করিয়া বাড়ি যাওয়া।

ডাইরিতে এরূপ আঁকা আছে। আমি আঁকিলাম। ছবিটির নীচে লেখা Birds.

১লা নভেম্বর—আজ দোকানের জন্মদিন। তাং ১২৫৭ সাল। 5 a.m. প্রথমে উঠিয়া কালীঘাটে যাওয়া—তারপর খাতা লেখা। অবনীবাবু বিশ্বাস করে আমাকে। কিন্তু কালীঘাটে যাওয়ায় বকিল, তার মতে দোকানের জন্মদিন সেইদিন যেইদিন সে কিনিয়াছে। ভোম্বলের দুরবস্থা যাইতেছে। কিছু টাকা লইয়া গিয়াছে কাল। এখন খিদিরপুর ছাড়িয়া উহারা বেহালায় আসিয়াছে।

Nov. 4. আজ ভাইফোঁটা। প্রথমে উঠিয়া টাকা গোনা। দুপুরে অবনীকে বুঝাইয়া জমা দিতে হইবে।

Nov. 8. মাখনের জন্য কেস ফাইল হইয়াছে। অবনী নিজে চর্বি মিশাইল—এখন আমার নাম নিজেই পুলিসকে দিতেছে। 9-11-57 কেসের দিন।

5 p.m. আজ মাখনের লাইসেন্স দেওয়ার কথা ছিল! দেয় নাই। আজ চূড়ামণিযোগ ও সূর্য গ্রহণ। শ্যামলবাবুর ডাইরি শ্যাম .াবুকে দিয়া দিব। 9-30 p.m. শুনিলাম দেশে আমার বুড়া দাদু মারা গেছে।

পরদিন 6-15 p.m. প্রথমে উঠিয়া কোন কাজ হয় নাই। কারণ আমার পেটে বেদনা করিতেছিল। অবনীবাবুর জামাইবাবুর কাছে লাইসেন্সের খবর নিব। আমি এখন ৪০ টাকা মাহিয়ানা পাই। অবনীবাবু দেয়। অবনী কোষ্ঠের বেদনা সম্বন্ধে আলোচনা করিল।

শরীর খুব ভাল নয়। টাটা কোম্পানী বড় কোম্পানী।

মোটামুটিভাবে কয়েক বছর আগের শ্রীযুক্ত বিদ্যুৎচন্দ্র পাল এরকম ছিলেন। এখনও তিনি সে রকম কি না তা এইবার বলার মত অবস্থা হয়েছে। এখনও তিনি দোকানে বসেন। বেতন এখন মাসিক ৬০ টাকা। পালস্ ট্রেডিং কোং নামও এখনও আছে। মালিক অবনী দত্ত।

শ্রীযুক্ত পালকে জানার জন্যে—যারা তার কাছে যেতে পারেন বা যাদের যেতে হতে পারে তাদের জন্য পাড়ার কজনে মিলে আমরা একটা খসড়া নিয়মাবলী তৈরী করি: 'বিদ্যুৎচন্দ্র পাল সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়।' সাইক্লোষ্টাইল করে তার কপিও বিতরণ করা হয়। মূলতঃ এ পাড়ায় যারা নতুন আসবেন তাদের জন্যেই এটি লেখা হয়। কিন্তু আমার আশঙ্কা, যার ওপর ওগুলো বিলোবার ভার ছিল তিনি শেষ অব্দি তা করে ছিলেন কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

যদিও এখানে সেই নিয়মাবলী অবিকল উদ্ধৃত করতে পারছি না তবু আমার মনে হয় তার থেকে কিছু মনে করে এখানে প্রকাশ করলে জনসাধারণের উপকার হবে। যেমন—

I. বিদ্যুৎচন্দ্র পাল কে ?

শ্রীযুক্ত বিদ্যুৎচন্দ্র পাল একজন দোকানদার। তিনি যে কোন জিনিস একই দামে বেচেন। মোটামুটিভাবে খুচরো সম্পর্কে ক্রেতাকে ব্যতিব্যস্ত করেন না। এ পাড়ায় যে নতুন আসবেন তার কোন না কোন সময়ে শ্রীযুক্ত পালের মুখোমুখি হতে হবে। সেই জন্যে যথাবিহিত কারণেই তাদের প্রত্যেককে নীচের প্রশ্নোত্তর গুলোতে মনোনিবেশ করতে বলা হচ্ছে।

II. বিদ্যুৎচন্দ্র পালকে কি করে চেনা যাবে ?

শ্রীযুক্ত পালের ধুতী মিল-এ তৈরী, কিন্তু গায়ের ফতুয়া নয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে—ধরেই নেওয়া যেতে পারে, তার মত তিনজনের পক্ষে মানানসই হলুদ রঙের একটা ফতুয়া তিনি পরে থাকবেন। এই জামাটি তার বিভিন্ন কাজে আসে। বার্ষিক দোল উৎসবে সেটি পুনর্জন্ম লাভ করে থাকে। এমনও দেখা গেছে, একদিক ভিজে যাওয়াতে তিনি অন্যদিক গায়ে দিয়ে আছেন। আমাদের পাড়ায় ঐ জামা গায়ে কাউকে যদি দেখা যায় তাহলে তিনিই তিনি কি না সেজন্যে সনাক্তকরণের অন্যান্য পরীক্ষা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

যেমন, মাথার পেছনের চুল পালথ-এর মত খাড়া খাড়া হলে (ইতিপূর্বে চিত্রে বর্ণিত) মাথা ঝাড়ার পর সদ্য চুল গজানো কোন পেসেন্টের সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি, শ্রীযুক্ত পালকেই আপনি খুঁজে পেয়েছেন। এবারে তিনি চোখে হাত দিয়ে চোখের ওপরের দিক্কার ঢাকনায় যদি টান দেন তাহলে নির্ঘ্যাৎ তিনি।

III. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে উৎসাহদান শাখা ও বিদ্যুৎচন্দ্র পাল।

এই শাখার কর্তা থেকে কর্মচারী সকলেরই সব ব্যাপারে বিভাগীয় নাম অনুযায়ী উৎসাহী হওয়ার কথা না। কোন বৃহস্পতিবার ওই বিভাগের লোকজনের কাছে গ্যারাণ্টার ছাড়াই লজেন্স-বিস্কুট ইত্যাদির দোকান করার জন্যে মৌখিক প্রতিশ্রুতির ওপর ধার চাইতে যদি কাউকে দেখা যায়—যদি দেখা যায় যে, তাকে বসতেও বলা হচ্ছে না—অফিস ছুটির সময় যদি তিনি অফিসের সিঁড়ির ওপর বসে থাকেন তবে তিনিই তিনি। দোকান আইন অনুযায়ী পলস্ ট্রেডিং কোং বৃহস্পতিবার পূর্ণ দিবস বন্ধ।

IV. বিদ্যুৎচন্দ্র পাল কোথায়?

তাকে যদি দেখতে পাওয়া না যায় তবে তিনি হারিয়ে গেছেন। কোথায় কোথায় তিনি যেতে পারেন আগে সে সব জায়গা খুঁজে নেওয়াই ভাল। হিজড়েদের আড্ডায় চোরাই জিনিসপত্রের আড়তে কিংবা মেটেবুরুজে পাঁঠা-খাসির সেন্ট্রাল গোলায় তার মত দেখতে কাউকে যদি দর দামও করতে না দেখা যায় তাহলে পলস্ ট্রেডিং কোং-এর উল্টোদিকে তাকে দাঁড়ান অবস্থায় পাওয়া যেতে পারে।

উল্টোদিকে এক ডাক্তারখানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে যদি কেউ একমনে পলস্ ট্রেডিং কোং-কে দেখে, যদি তার চোখে গোলাপ বাগান দেখার ছাপ পড়ে তবে তিনি শ্রীযুক্ত বিদ্যুৎচন্দ্র পাল। সেই অবস্থায় তাকে একটু ধাক্কা দিয়ে চালিয়ে দিতে হয়, তাহলেই শ্রীপাল ভাবন্ত অবস্থায় ঠিক দোকানে পৌঁছে যাবেন—কাছে গিয়ে নাক দিয়ে প্রায় গোলাপের গন্ধ শুঁকবেন।

V. বিদ্যুৎচন্দ্র পাল দোকানে কেন দাড়ি কামান?

কেউ জানে না। তবে মনে হয় যেদিন তিনি দাড়ি কামান সেদিন তার তাড়াতাড়িতে মাখনের লাইসেন্স আনার কথা থাকে। তবে, মনে হয়, এ ব্যাপারে কারও কিছু করারও নেই। ইতিমধ্যেই তাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। কেউ যেন সাইকেল চালাতে চালাতে হ্যাণ্ডেলের ওপর বসান হারমোনিয়ম বাজাচ্ছে—এমনি ধারায় তিনি অনায়াসে দাড়ি কামান। মুস্কিল হল তিনি ক্ষুর ব্যবহার করেন, বাগানে জল দেওয়ার মত মুখ-খোলা ঝারির মত বড় একটা মগে জল থাকে -আর তার সাবানে ভীষণ ফেনা হয়।

দাড়ি কামান তার কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না। কোন কোন

মহল মনে করেন, দাড়ি কামাতে কামাতে তিনি অন্য সময়ের চেয়ে তাড়াতাড়ি খদ্দেরকে দেখাশুনো করতে পারেন। এ এলাকায় নতুন যারা আসবেন তারা যেন ক্ষুর আর জলের বালতি বের করতে দেখে না ভাবেন, অবিবাহিত কোন প্রৌঢ় বড় কাঁচা পেপে কাটতে বসছেন। কথাবার্তার মধ্যে তিনি ফতুয়া খুলে ফেলে জলের বালতিটা টেনে নেন তাহলেও কারও ভাবার দরকার নেই যে, তিনি এখন তার হাত পায়ের পুরনো আঙুলগুলো কেটে কুটে জলে ধুয়ে কেচে নতুন করতে বসছেন। ·দাড়ি কামানোর ব্যাপারে তিনি আয়না ব্যবহার করতে ভাল বাসেন না—ভাবখানা, এ পথে কতবার এসেছি, আলো লাগবে না। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে—তিনি যেন কানের পাশে জমাট আইসক্রিমের মত সাবানের ফেনা নিয়ে ঘুরে না বেড়ান—বলতে হবে, মুছে নিন।

VI. বিদ্যুৎচন্দ্র পালের হিসেবের দেওয়াল।

গত ষোল বছরে কেউ ধার চাইলে তিনি তাকে ফেরান নি। এমন কি দোকানের কর্মচারী হওয়ার পরেও তিনি এ রীতি বজায় রেখেছেন। ফলে যে জায়গাটায় তিনি বসেন তার পেছনে মাথার ওপরের দেওয়াল যতদিন না চুনকাম করা হয় ততদিন আদ্যোপান্ত সোডা, মাখন, পান, সিগারেট, রিবন এই সব কথায় দু-মাসের মধ্যে ভর্তি হয়ে যায়। যে নেয় তার নামও থাকে। দামও থাকে। শেষ দিকে জায়গা কম পড়ার দরুন তাকে জায়গা করে নিয়ে লিখতে হয়। ফলে দেখা গেছে—কেউ শোধ করতে এসে পানের দামে মাখনের দাম দিচ্ছে—কেননা, জায়গার অভাবে শ্রীপালকে মাখনের পাশেই পানের কথা লিখতে হয়েছে। অবনী দত্ত পলস্ ট্রেডিং কোং-এর মালিকানা পাওয়ার আগে শ্যামলবাবু নিজেই অগ্রণী হয়ে তাকে কলি ফেরানোর রাজমিস্ত্রী যোগাড় করে দিয়েছিল। হস্তান্তরের সেই সময়টায় শ্রীপাল কিছু বিমর্ষ থাকিতেন। সেই সময় রাজমিস্ত্রীরা কোং-এর সব ক'টা দেওয়ালেরই কলি ভাল করে ফিরিয়ে দেয়। বলা দরকার, শ্যামলবাবু যেহেতু বড় বন্ধু সেজন্যে তার ব্যাপারে দোকানের ভেতরে সবচেয়ে বড় দেওয়ালটা তার নামে বরাদ্দ ছিল।

এখন দেওয়ালের হিসেব খাতায় তুলে যোগ দেওয়ার পর অবনী দত্ত রাজমিস্ত্রী ডাকে। সেই সব দিন শ্রীপালকে চিন্তিত দেখায়! নিষেধ সত্ত্বেও দেওয়ালে হিসেব রাখায় অবনী দত্ত তার কাছে নাম, ধাম, দাম এসব জানতে

চায়। কেননা, হিসেব মত সাজা পানের দামে মাখন এবং মাখনের দামে সাজা পান বিক্রি হয়েছে—অবশ্য ক্যাশে পয়সা আসে নি। তাই সেই সব চিন্তিত অবস্থায় শ্রীপাল অবনী দত্তকে স্মৃতি থেকে সাহায্য করেন।

শ্যামলবাবুর নামে দেওয়াল বরাদ্দ করা বারণ।

VII. বিদ্যুৎচন্দ্র পাল ও আয়না।

দাড়ি কামানোর সময় ছাড়া অন্য সময়ে শ্রীপালকে আয়নার দিকে তাকাতে দেখা গেছে। আয়নায় তাকালেই কেবল তিনি চিন্তিত হন না, বিমর্ষ না—বিস্মিত হন। আয়নায় তিনি দেখতে পান যে, তার মুখ বিস্ময়করভাবে গতিশীল। তখন তিনি মুখের উন্নতি করার চেষ্টা করেন। দেখা গেছে, আয়নায় তাকিয়ে তিনি মিনিট পনের ধরে নানারকম মুখ করে যাচ্ছেন—পছন্দ মত একখানা মুখ বেছে নিয়ে তিনি আয়না বন্ধ করছেন।

অবনী দত্তর দোকানে সব বিক্রি হয়—আয়না হয় না।

VIII. ট্রামে বিদ্যুৎচন্দ্র পাল

যেখান থেকেই তিনি উঠুন না কেন, কোন স্টপে কাউকে নামতে দেখলে তিনি নিজেকে ঠেকাতে পারেন না। তাকেও নেমে পড়তে হয়। ফলে, ট্রামে তার সঙ্গে কোথাও যেতে হলে সব সময় তার আগে বসা উচিত। তাহলে সময় মত জায়গায় পৌছোন যায়। কেননা, তাকে নেমে পড়তে দেখলে পেছন থেকে তাড়াতাড়ি টেনে ধরার সুবিধে হয় আগে বসলে।

IX. বিদ্যুৎচন্দ্র পাল ও নাক-মুখ-চোখ-কান।

কখনও যদি শ্রীপালকে দেখা যায় যে, তিনি দুহাতে নাক-মুখ-চোখ-কান চেপে ধরে রাখবার চেষ্টা করছেন তাহলে বুঝতে হবে শ্রীপাল তার বিপদের দিনের সম্মুখীন হয়েছেন। তার বিশ্বাস—তখন তার নাক-মুখ-চোখ-কান ফাঁকি দিয়ে জায়গা বদলাচ্ছিল বা সরে সরে মুখেরই অন্যত্র গিয়ে বসবার ফিকিরে ছিল। সুখের কথা, বছরে এরকম বিপদের দিন খুব কদাচৎ আসে। সেইসব দিনে অবনী দত্তও তাকে ছুটি দেয়।

X. বিজনেস্ ম্যাগনেট বিদ্যুৎচন্দ্র পাল।

পলস্ ট্রেডিং কোং-এর স্বত্বাধিকারী থাকাকালীন শ্রীপাল কখনো কখনো এই ভূমিকা নিতেন। এখনও যদি হঠাৎ কেউ তাকে দুপুরের দিকে টাটা কোম্পানীর বিভিন্ন ব্যবসায় উদ্যোগের কথা গড় গড় করে বলতে দেখে—

কিংবা কোটি কোটি টাকায় অঙ্ক মুখে মুখে যোগ দিতে শোনে তবে তার ঘাবড়াবার কিছু নেই।

শ্যামলবাবুর দেওয়া ডাইরির যুগে ফিরে গেলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

স্বত্বাধিকারী থাকাকালীন একটি দুপুর :

১৯৫৬ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্রীপাল জলবিদ্যুৎ সরবরাহ ও লৌহখনিসমূহের শেয়ারের সিংহভাগের অধিকারী বলে নিজেকে মনে করতেন।

সেই সময় শ্যামলবাবু একদিন দোকানে ঢোকামাত্র শ্রীপাল বলেছিলেন, 'আমি জামসেদজি টাটা। আমি গরুমহিষাণি পাহাড়ে লোহা তুলতে যাচ্ছি। ঐ যে ক্রেন। এখন প্রমথ বসু কোথায়? সেই বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার কোথায়? আপনিই শ্যামলবাবু, আপনিই প্রমথ বসু। এই জনমানবশূন্য পাহাড়ি এলাকা একদিন তিন লক্ষ লোকের শহর হয়ে উঠবে।'

শ্যামলবাবু ক্রেনের জায়গায় লজেন্সের বয়মগুলো দেখতে পেয়েছিলেন। জায়গাটা জনমানবশূন্য করার জন্যে পুরো এক র‍্যাক সাবান, বিস্কুট, ঘুড়ির আলমারিতে সরান হয়েছিল।

আর একদিন :

'আমি রাজস্থানের রাজা বলদেও দাস—বিড়লাদের বাবা। এখন আমি বোম্বাই-এ তুলাপট্টিতে। ঐ যে আমার প্রথম কাপড়ের কল। এই যে আমার শত্রু ব্রিটিশ বিজনেসম্যানরা। এখন প্রশ্ন হল আমি আছি সেখান থেকে আমার শত্রুদের আমি দেখতে পাচ্ছি কি পাচ্ছি না?'

সেইদিন দোকানের সব কিছু স্থানচ্যুত হয়েছিল। পুরোপুরি একটা ব্যবসায় সাম্রাজ্যের উত্থানের গোড়ার দিকের কাহিনী।

তখন শ্রীপাল যদি দোকানের প্ল্যাস্টিকের ঝোলাগুলো একত্র করতেন তাহলে তিনি তখন কয়লা শিল্পে নিয়োজিত—ব্যাগে করে পাতাল থেকে কয়লা তুলছেন—ঝরিয়া কোলফিল্ডের প্রথম দিক্‌কার ইতিহাস গোড়া থেকে সুরু হত সেদিন।

অবনী দত্ত পলস্‌ ট্রেডিং কোং-এর মালিক হওয়ার মুখে মুখে শ্যামলবাবুর সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করেন—এসব পরে এ্যালাউ করা হবে কি না? স্থির হয়—হবে।

তবে, ভবিষ্যতের ক্রেতাদের মুখ চেয়ে কতগুলো বাধা নিষেধ অবনী দত্ত আরোপ করে।

A. তিন বয়স উঁচু ক্রেন শ্রীবিদ্যুৎচন্দ্র পাল যেন আমদানী না করেন।

B. অতিরিক্ত কয়লা উত্তোলনের ফলে প্লাষ্টিকের ব্যাগগুলো যাতে ময়লা না হয় সেজন্যে দুটোর বেশী ব্যাগ এক সঙ্গে একদিনে ঐ কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

C. বাণিজ্য সাম্রাজ্যের পতনের দিনে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় মেঝেতে শুয়ে দুঃখ করা যাবে না। বাড়িটা পুরনো—ড্যাম্প লেগে বুকে সর্দি বসতে পারে।

D যেসব ডাইরির পেছনে বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিবরণ থাকে সেসব ডাইরি শ্রীপাল উপহার নিতে পারবেন না। কারণ, ঐসব বিবরণে অতিরিক্ত পরিমাণে টাকার অঙ্ক থাকায় শ্রীপাল নতুন কাগজের দিস্তে নামিয়ে তাতে যোগ দিতে বসতে পারেন।'

আন্তর্জাতিক সাবান কোম্পানীর সেলসম্যান তাঁকে একখানা নোটবই দিয়েছিল। তাতে এত বড় সব অঙ্ক ছিল যে শ্রীপাল কাগজ ছেড়ে শেষ অব্দি নতুন স্লেটগুলো ভর্তি করে ফেলেছিলেন যোগে যোগে।

E. বিজিনেস টাইকুনদের পাল্টা আক্রমণে, বিশেষতঃ শেয়ার মার্কেটের যুদ্ধে দয়া করে 'পানিহাটি জুট মিলের' নাম অথবা অন্য কোন পাটের শেয়ারের কথা বলবেন না। ফলে, শ্রীপাল ঐ শেয়ারটি অধিকারের জন্যে লাফ দিয়ে পড়তে পারেন। দোকানে বেশী দামের অনেক ফ্যান্সি জিনিস থা... ।

XI. বিদ্যুৎচন্দ্র পালকে নিয়ে আমরা কি করতে পারি?

পলস্ ট্রেডিং কোং-এ কারও চাকরী যাক্ ক্রেতাসাধারণ তা চান না। বিশেষতঃ, কর্মচারী যখন একজন এই এলাকায় উপকথার মহিমা অর্জন করেছেন—তখন, তার সঙ্গে কথা বলার জন্যেও পাড়ার দু'চারজন দোকানে আসবেনই। ফলে, এই বিপণীতে বিক্রয়ের হার ন্যূন নয়। অবনী দত্তও ব্যাপারটা বোঝে।

তাছাড়া, কর্মচারী হলেও শ্রীপাল এখনও হিসেবের দেওয়াল রাখার রীতি বজায় রেখেছেন। অবশ্য শ্যামলবাবুর জন্যে আর কোন দেওয়াল বরাদ্দ নেই।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়



নিদ্রিত রাজমোহন

ওই ঘুমুচ্ছে রাজমোহন। না, না! মরে যায় নি। কাল সকালেই আবার জেগে উঠবে। অবশ্য ঠিক কখন, ভোরের দিকে না বেলা-করে, তা আমি বলতে পারি না। জানিনা সে ছেঁড়া ধনুকের মত লাফিয়ে উঠবে, নাকি জেগে উঠে বহুসময় লেপ্টে থাকবে বিছানায়। এতে তার কোনো হাত নেই। এ-টুকুও আগে থেকে জানার উপায় নেই। রাজমোহন জানে না। তবে, একটা কথা, মানুষমাত্রেই ঘুমুতে ভালবাসে। রাজমোহন তাই ঘুমুচ্ছে। পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে তার মেয়ে ও বৌ। এই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সময় রাজমোহনের -কথা বলার, সে এখন ঘুমুচ্ছে বলে। এবং বিশেষত, সে আজ-কাল এ-ঘরে একা ঘুমুচ্ছে।

আজ বেশ তাড়াতাড়ি রাত ১০-টা নাগাদ মশারির ভেতর এ্যাশট্রে ও সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে সে ঢুকে পড়ে ও মাত্র প্রথমটি আধাআধি পৌঁছবার আগেই ঘুমে ছিঁড়ে যায় তার মাথা; সেই থেকে ঘুমুচ্ছে। তা'র আগে অফিসফেরৎ সে গিয়েছিল রমার দাদার কাছে। উনি তখন সারিবদ্ধ আইনের আলমারির মাঝখানে অ্যাডজাস্টেবল টেবল-ল্যাম্পটা টেনে কাছাকাছি নামিয়ে খোলা ব্রীফের ওপর রেখে পেরী ম্যাশন পড়ছিলেন। তখনো মক্কেলদের আওয়াস সুরু হতে দেরি, কেউ কেউ বাইরে বসে ছিল। গরমকালে খালি গায়েই মক্কেলদের সঙ্গে আলাপ করা ওঁর রেওয়াজ। স্নান করে আসার জন্যে সেই সোনালি-বর্ণা সম্ভ্রান্ত চামড়া আজো রাজমোহনের চোখে পড়ে। প্রথম-প্রথম এর মাহাত্ম্য সে বুঝত। চাঁচা ঝুলপির ওপর লাইব্রেরী-ফ্রেম চোখে পড়ত। আজ গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে গত ৭-বছরে দু'হাতের অধিকাংশ আঙুলে নানান ধাতুর আঙটি, আজ দু-একটি আঙুলে

একাধিক করে, সে দ্যাখে। রাজমোহনকে দেখে মুখ তুলে বরাবরের মত বিশ্বাসযোগ্য আন্তরিক গলায় উনি বলে উঠলেন, "আরে! এসো, এসো," চেয়ার দেখিয়ে দিলেন, "তারপর···খবর কি তোমাদের, এ্যাঁ? টুকিসোনার খবর কী? রমা স্কুলে যাচ্ছে? চঃ, চঃ," আপশোস করলেন, "একটা ফোওন পর্যন্ত তোমরা করো না। আর আমিও—মানে এ্যাত্তো ব্রীফ নিয়ে ফেলেছি—" বলে হেসে পেরী ম্যাশন তুলে ব্রীফ দেখালেন। ওঁর এই ভরাট গলা, প্রতি শব্দে তার প্রয়োজনীয় ওঠা-নামা, একদিন ছিল যখন এ-সব লক্ষ্য করে রাজমোহন না ভেবে পারত না যে তার এ-রকম একটা গলা নেই। বাস্তবিক, দুপুরের ঘুম সন্ধে পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারলে তারপর নিজের গলা শুনে তারও একসময় কত-না ভাল লাগত। বাসে উঠে পয়সা বাড়িয়ে দিয়ে নিজের ঘুম-জাগা গলায় শুধু 'টেরিটি বাজার' শব্দটা পর্যন্ত ছিল শোনার মত। দিব্যি কয়েকঘণ্টা থাকত ও-রকম, গলার আওয়াজ, অবশ্য ক্রমেই মিইয়ে আসত তার দার্ঢ্য—কৃত্রিম বই কিছু তো আর নয়। রমার দাদার গলা কিন্তু সারাদিন এ-রকম, রোজ, প্রায় প্রতি শব্দে। এ-সব আগে খুব লক্ষ্য করত রাজমোহন।

সত্যি বেশ কয়েকমাস খবরাখবর নেই, শেষ এসেছিল রমার দাদার বিবাহের রজতজয়ন্তীতে। ফ্ল্যাট থেকে রাস্তায় নেমেই, ২৫-গোলাপের তোড়া ও টুকিকে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে, "দাঁড়াও, একমিনিট" বলে, বিয়ের আগে তার কিনে-দেওয়া চান্দেরি পরে রমা এগিয়ে গিয়েছিল ডাস্টবিন অব্দি ও তার মধ্যে আলতো করে ছুঁড়ে দিয়েছিল খবরের-কাগজ দিয়ে পুঁটুলি প্যাক-করা একটা প্যাকেট। বিয়ের প্রথমদিকে কিছুই বুঝতে পারত না, বাথরুমে একের পর এক জমে উঠত ছোট ছোট গম্ভীর প্যাকেট, তারপর হঠাৎ আর দেখতে পেত না। তখন রমা তার অবর্তমানেই কাজ সেরে রাখত। অথচ সন্ধের ঝোঁকে ফেলে দিতে প্যাকেট-হাতে রমাকে ডাস্টবিন পর্যন্ত যেতে দেখে প্রথমদিন এক নজরেই সে বুঝেছিল কী; রাজমোহন বুদ্ধিমান। তাদের সাউথ কুশিয়া রোডের লোয়ার মিডলক্লাস পরিবারের সঙ্গে নেবুবাগানের প্রসিদ্ধ ঘোষ পরিবারের সে তফাৎ করতে পেরেছিল। পেরে কিছু তৃপ্তি পেয়েছিল।

যাইহোক রমার দাদার সঙ্গে কিছু উত্তর-প্রত্যুত্তর শেষ করে আজ রামমোহন তার অবিকল অফিসফেরৎ গলাতেই যার-পর-নেই বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রথমে বলল, "দেখুন মেজদা, আমি আজ শেষদিন বাড়ি ফিরছি এবং কাল

থেকে ভাবিষ্যতে কোনোদিন আর বাড়ি ফিরব না।" বলে স্তব্ধ হ'য় গেল রাজমোহন। আমি ভাবলুম, ব্যাস, খেলা খতম, এই বুঝি বুকের ওপর ঝুলে পড়ল তার মুণ্ডু, আর বোধহয় মুখ খুলতে পারবে না। কিন্তু সাবাশ রাজমোহনকে, চেয়ার ছেড়ে ওঠার শুধু ভঙ্গিটুকু করা মাত্র, "কী বোওল—" পর্যন্ত বলতে দিয়ে তর্জনী তুলে তাকে বাধা দিতে দেখলুম, "না!" রাজমোহন উঁচু গলায় জানাল। "না, আজ কিছুই হয় নি," বলতে বলতে শক্ত হয়ে গেল তার পড়-পড় ঘাড়, নম্র হয়ে এল গলা; একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস প্রচণ্ডজটিল দাড়ি ছুঁয়ে তার বোতাম-খোলা বুকে এসে লাগল। রাজমোহন বলল, "অনন্ত, আজ, কিছুই হয় নি। ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি বা এ-ধরণের।...দেখুন মেজদা, আমি সব ভেবেছি। মেয়ে, রমা, ভবিষ্যৎ—আমাদের গুরুজন বা আত্মীয়-স্বজনের কথা—দাঁড়ান, আমাকে বলতে দিন—এএএ, কী বলছিলুম, হ্যাঁ, বিশেষ করে আপনার কথা। কিন্তু দেখুন, একটা সর্বনাশ হয়ে যাওয়ার চেয়ে দু'জনের আলাদা হয়ে যাওয়া ভাল। সর্বনাশ বলতে ধরুন খুন বা আত্মহত্যা? আমরা প্রতিমুহূর্তে তিল তিল করে নিজেদের খুন করছি এটা কেমন নাটুকে শোনায় যদিও আমরা তাই করছি। কিন্তু খুন বলতে আমি বলছি আর-একবার যদি আমি রমার গলা টিপে ধরি, মানে ধরলে, এবার হয়ত আমি ছাড়তে পারব না। আগে দু-একবার ধরেছি (হেসে) জানেন তো আপনি? সেও তো কেলেঙ্কারি, আমাদের বংশে কলঙ্ক, আপনাদের লোকাল প্রেসটিজ, লোকজানাজানি। বা আত্মহত্যা! শী শু'ল অ্যাটেমপ্ট (মাথা নেড়ে) নো ডাউট! এক্ষেত্রে আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়া কী উচিত নয়, আলাদাভাবে হলেও অন্তত দু'জনে বাঁচব তো। প্লাঈজ, এটা বুঝুন। টুকিও বাঁচবে, রমার অবলম্বন হতে পারবে। তার কাছে, আপনারা যদ্দিন আছেন আপনাদের কাছে, মানুষ হতে পারবে। এ ছাড়া," এই নিয়ে তৃতীয়বার রাজমোহন ওঁকে চেয়ারে বসিয়ে রাখল, ও কথা বলতে দিল না, "এ-ছাড়া আমার মুখের কথার দাম দিতে হবে না। আপনি একটা ডীড তৈরী করুন। আমি যদ্দিন চাকরি করব বা বেঁচে থাকব আমার আয়ের অর্ধেক আমি, রমার যদি নিতে প্রেসটিজে লাগে, মেয়েকে দিয়ে যাব। রমাও চাকরি করে। আমি শিগগিরই এফিসিয়েন্সি বার ক্রশ করব। আমার আর কোনো উন্নতি না হলেও, এই পে-স্কেলে রমা আমার কাছ থেকে ২৪০ থেকে ৪৪০ পর্যন্ত মাসে মাসে পেয়ে যাবে।

আমি ভেবেছিলুম রাজমোহন পারবে না। ধন্যবাদ রাজমোহনকে যে সে কোনো অ্যাডভাইস চায়নি। ভাগ্যিস রাজমোহন রমার দাদাকে সস্নেহ "আবার ঝগড়া করেছ তোমরা," বা হতভম্ব "প্রবলেম কী তোমাদের" গোছের কোনো প্রশ্ন করতে দেয়নি! ধরা যাক, 'গ্রিনিং গোরিলা'র মলাটের ওপর চশমা নামিয়ে রেখে যদি উনি জিজ্ঞেস করতেন, "তাহলে তোমরা বিয়ে করেছিলে কেন?" ভাবা যায়! কী উত্তর দিত রাজমোহন? "এ কী বলছেন আপনি? এ তো যে মরে যাচ্ছে তাকে 'তবে জন্মেছিলে কেন, জিজ্ঞাসা করার মত, ভুল," বলতে পারত কি সে? না। তার সব গুলিয়ে যেত। আর, তার গুলিয়ে গেলে যা হয়, সে চুপ করে যেত। চিনি তো আমি রাজমোহনকে। কিম্বা ধরো, উত্তর যদি তাকে বলতে হত, গেল-বছরে আমরা একটাও চুমু খাইনি অথচ যৌনাঙ্গদুটি ব্যবহার করে গেছি, এই আমাদের প্রবলেম, তাহলে? সন্দেহ নেই যে তাহলে রমার দাদা পরিশ্রমিকে তাও সল্ভ করে দিতেন। খাওনি কেন? কেন যৌনাঙ্গদুটি শুধু? কে দায়ী? দু'জনেই সমানভাবে? বেশ—কিন্তু কে সুরু করেছিল? সামলাও! রাজমোহন, আমি জানি, সামলাতে পারত না। ওদের ফ্ল্যাটের সিঁড়ির দরজার ছিটকিনি নিচের দিকে। রাজমোহন চটি থেকে বের করে পা দিয়ে তা খোলে। দেখছি তো, কখনো নিচু হয় না। খামে ৬-মাস ধরে ঠিকানা লেখা. চিঠি লেখে না। এর মধ্যে রাইটিং-প্যাড নিয়ে তাকে কখনো বসতে দেখিনি কী? তা নয়, গত শীতেই তুষের চাদর মুড়ি দিয়ে মধ্য-রাতে তাকে আধ ঘণ্টাটাক বসে থাকতে দেখেছি যার মধ্যে দ্বিতীয় সিগারেটের আগুন থেকে সে ধরিয়ে নিয়েছিল তৃতীয়টি, ও, সত্যের খাতিরে, ডানহাতের রিস্টের ওপর, কলম নামিয়ে রেখে, মেরেছিল বাঁ-হাত দিয়ে একটা মশা। এ-ভাবেই স্নান করতে ঢুকে বাথরুমের টুলে বসে থাকতে তাকে কত দেখা গেছে। নগ্ন শরীর থেকে ঝুলে রয়েছে তার লম্বালম্বি হাত, হাতে ঝুলছে টিনের তোবড়ানো মগ, মাথা ভর্তি-চৌবাচ্চার পাড়ে নামানো। উপচে জল বহে গেছে কত। রাজমোহন এ-রকম। সে আজকাল হাত বুলোয়, বই পড়ে না। হাতের নাগালের একটু বাইরে সিগারেটের প্যাকেট, শুয়ে শুয়ে রাজমোহন মেয়ে বা ঝি-কে ডাকে। রমাকেও ডাকত। শীতকালে খাটের সামনে চটিজোড়া রেখে তবে সে বিছনায় ঢোকে, ভোরে তার প্রয়োজন হয়। শীতশেষে যখন কয়েকদিন আবহাওয়ার ঠিক থাকে না, রাজমোহন লেপ ও কাঁথা দুই-ই

নিয়ে শোয়। অর্থাৎ, রাত্রে কাঁথা ও ভোরে লেপ। এতটা বয়স হয়ে গেল আজো নিজের পেনে নিজে কালি ভরা তার অভ্যাস হল না, ব্রাশে পেস্ট তাকে নিজে লাগিয়ে নিতে হয়। এমনি রাজমোহন। মশারি খাটাতে গিয়ে বা নিজে দাড়ি কামাতে বসে তার অন্তর-আত্মা হায় হায় করে ওঠে, তার অস্তিত্ব প্রতি-বারেই অতি বিপদজনকভাবে টলে যেতে দেখেছি। বছর ঘুরতে চলল সে আর দাড়ি কাটে না। দাড়ি কাটা সে ছেড়ে দিয়েছে। এই যে মশারি, যা আজ-কাল সে নিজেই খাটিয়ে নিচ্ছিল, এই মশারি খাটানো নিয়ে বহু ব্যাপার আমার জানা আছে। এ নিয়ে একটা স্বতন্ত্র রচনা হয়। উদাহরণস্বরূপ একটা বলি ? এই যে মশারি, এর ৪টে দড়ির প্রত্যেকটিতে ঠিক জায়গায় একটা করে গিঁট দেওয়া আছে। রাজমোহন মশারির আঙটায় স্রেফ দড়ি গলিয়ে দেয়, তারপর গিঁট অব্দি পৌঁছে দাও চোখ বুজে ফাঁস। মশারির সঠিক উচ্চতা নিয়ে প্রতিদিন উৎপীড়িত হওয়ার হাত থেকে এ-ভাবেই সে নিজেকে চিরতরে মুক্তি দিয়েছে। এ রাজমোহনেরই বুদ্ধি। গত বছরে মাত্র একবার মাইনের দিন স্ট্যাম্প নিয়ে যেতে সে ভুলে যায়। দেখলুম ব্যস্ত হল না। ইতিউতি চেষ্টা করল না। কাজ করে গেল। পরে বাথরুম যাবার পথে সে দেখল একটা বেঞ্চে একঝাঁক বেয়ারা বসে আছে। তা জনপনেরো হবে। দাঁড়িয়ে পড়ে সে ঐ একঝাঁক-বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করল, "স্ট্যাম্প আছে নাকি ?" ২।১ জন বলল, "না।" কেউ, "হ্যাঁ" বলল না। দ্বারিক বেশি চেনা, "দ্বারিক তোমার কাছেও নেই বলো কী হে", বলে সে হাসল। একসঙ্গে অন্তত ১৫-জন লোকের কাছ থেকে খবর পাওয়া, আলাদা-আলাদা করে জিজ্ঞেস করার পরিশ্রম বাঁচানো, এও রাজমোহনের বুদ্ধি। সে কুঁড়ে, এইজন্যেই বাধ্যত বুদ্ধিমান। প্রায় ৩৬-বছর এভাবেই তো কাবার করে আনল, হিসেবমত প্রায় আধাআধি মেরে এনেছে—নয় কী। অলস অথচ বোকা, এ হলে আর এ্যাদ্দিন টিকতে হত না। তো, এই হচ্ছে রাজমোহন। অন্তত এই হচ্ছে তার একটা দিক, কিম্বা কে জানে তার ৩৬-বছরের জীবনের এই-ই ফলাফল। রমার দাদার সঙ্গে সে পারবে কেন, পারে কখনো। তাই ধন্যবাদ রাজমোহনকে যে সে রমার দাদাকে, "সমস্যা কী," এটা জিজ্ঞেস করতে দেয়নি। বস্তুত সে কোনো কথাই বলতে দেয় নি তাঁকে যা আরো ক্রেডিটেবল। সে যা জানিয়েছে তা হল শেষ, বা উপসংহার। শেষ থেকে শুরু হয় কি ? সত্যিই, রাজমোহনের দিক থেকে অন্তত, তার ও রমার

মধ্যে আর-কোনো সমস্যা নেই। কেননা, সমস্যা কী? যার একটা-না-একটা সমাধান আছে তাই-ই সমস্যা। রমার দাদা পারেন সমস্যামাত্রেরই সমাধান করে দিতে যদি তা প্রতীয়মান হয়। রাজমোহন তাই ভালো করেছে গড়গড় করে শুধু উপসংহারটুকু বলে গিয়ে, যা সমস্যা নয়। আমি রাজমোহনকে জানি। তাই বলছি।

সে অপর কোনো মহিলার সঙ্গে প্রেম করে না এটা মেজদাকে খুলে বলেনি বলে কোনো ভুল করেছে রাজমোহন এ-রকম আমি মনে করি না। কারণ আর অফিস ফেরৎ গলা একবারও পরিষ্কার করার প্রয়োজন না বোধ করে, ঈষৎ ঝুঁকে এমন অহংহারা গলায় কথাগুলো সে বলে যায় যে গোটাটা শোনাচ্ছিল স্বীকারোক্তির মত সরল, এতে ভুল-বোঝাবুঝির কোনো সুযোগ থাকতে পারে না। সত্যি অদ্ভুত শোনাচ্ছিল তার গলা। ঠিক, অবিকল, রাজমোহনের গলার মত শুনতে লাগছিল।

যাই হোক; এখন ঐ ঘুমুচ্ছে রাজমোহন। পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে তার ৭-বছরের বউ ও ৬-বছরের মেয়ে। আর তার মশারিতে একটাও মশা নেই। আজ বাড়ি ফিরে, তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে, সে চলে গিয়েছিল অদূরে—লেভেলক্রশিং-এর ওপারে। সম্পূর্ণ অচেনা সেলুনে সহসা ঢুকে শান্ত ও নিস্তব্ধভাবে সে কামিয়ে নিয়েছে তার শেষ কয়েকমাসের সর্বনাশা দাড়ি। ইদানীং দ্রুত পাকতে শুরু করেছিল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ঘুমে ইতিমধ্যেই ফুলে উঠেছে তার পরিতৃপ্ত ও চকচকে মুখ। না-জানি কাল ঘুম-জাগা গম্ভীর 'টেরিটিবাজার' তার গলায় কত জমকালো শোনাবে। জানি না কাল কখন উঠবে রাজমোহন। কীভাবে উঠবে। তবে কাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে আর বাড়ি ফিরবে না। শুধু, যদি রমা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করে, ডীডটা করার জন্যে মাঝে মেজদার সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করবে।

কনগ্র্যাচুলেশান্‌স্‌, রাজমোহন রায়চোধুরী। সাবাশ!

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়



সাদা অ্যাম্বুলেন্স

'প্রথম ফুস্কুড়িটা সে গোপনে দেখল। জানলা খুলে, হাতটা সূর্যের আলোতে রেখে দেখল। মনে হয় শ্বেতচন্দন দিয়ে কে ফোঁটা দিয়েছে। গায়ে জ্বর। সে জ্বর নিয়ে সারা বাড়ির কাজ করেছে। মেঝে মুছে রেখেছে। ড্রইং রুমের সোফা-সেট, বাতিদানের আধার এবং আলমারির কাচ ও জানলার শার্সি ঝেড়েমুছে তকতকে করতে গিয়ে তার মনে হয়েছে শরীরে ব্যাথা, ভয়ঙ্কর রকমের ব্যথা, সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কপাল টান ধরে আছে এবং কেমন একটা বমি-বমি ভাব। সে ঠিক করেছে এখন মাদুর পেতে এই ছোট্ট ঘরটিতে—(সে ঘরটাতে একাই থাকে)--গ্যারেজের উপরে এই ছ-ফুট বাই আট ফুট ঘরে শুয়ে পড়বে। ফুস্কুড়িটা দেখেই ওর জল তেষ্টা পাচ্ছিল তীব্র। এখনই হয়ত ছোট দিদিমণি চিৎকার করবে, ওর কুকুরটা নিচে নেমে গেছে, কথা শুনছে না, ধরে আনতে হবে কুকুরটাকে। নীল রঙের কুকুর, লম্বা জিভ এবং বকলস পরালে বাঘের মতো—কুকুরটা তাকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না। তাকে দেখলেই ওটা বেশি ছুটো'ছুটি শুরু ক'রে দেয়। সে এখন এ-সব পারে না। বয়স হয়েছে। সেই কর্তা-বাবার আমলে সে এক কাপড়ে এখানে এসে উঠেছিল। এখন কর্তাবাবা নেই। ছোটবাবু আছেন। তাঁর দুই মেয়ে। মিলি আর লিলি। লিলি দিদিমণি ঘুম থেকে বড্ড দেরি ক'রে ওঠে। ওর ঘরের জানালা খুলে দিলে সে দিদিমণির লম্বা শরীর কতদিন প্রায় উলঙ্গ দেখেছে। লিলিদিদি ওকে আর মানুষের মতো গ'ণ্য করতে চায় না। কুকুরটা শুয়ে থাকে খাটের নিচে। উপরে লিলিদিদি। সিল্কের গাউন এবং চুলের ফিতে সাদা রঙের। আশ্চর্য রক্ত লিলিদিদির শরীরে। কুকুরটার যেমন ঢুকে যাবার নেই মানা ওরও তেমনি

মানা নেই। সে যেন কিছু দেখে না, ঘর সাফসোফ ক'রে দেয়, ঘরের বইপত্র সাজিয়ে রাখে, ফুল দানিতে ফুল দিয়ে যায় ভোরে এবং অলস সূর্য জানালায় নেমে এলে সে শুধু ডাকে—লিলিদি তোমার কফি। সকালে কফি না খেলে লিলিদির ঘুম ভাঙে না। বিছানা ছেড়ে উঠতেও পারে না

সুতরাং এক্ষুনি ডাকবে তাকে। লিলিদি ডাকলে আর নিস্তার নেই। সে যে জ্বরে ভুগছে, একথা এখন বলতে পারছে না। সে একটা ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে দিল। ছোটবাবুর যা কিছু পুরনো ছেঁড়া পাঞ্জাবি, কাপড়, যা আর গায়ে দেওয়া যায় না—তার দুটো একটা তাকে দিয়ে দেন। সে সেই পাঞ্জাবি শরীরে গলিয়ে নিয়েছে। হাতটা ঢেকে রেখেছে। কারণ সকাল থেকেই সে লক্ষ করছে দুটো-একটা ফুসকুরি দেখা দিচ্ছে। জল নিয়ে বেশ টসটসে। সে সবই ঢেকেঢুকে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এখন লিলি দিদিমণি ডাকলেই ভয়। বাইরে বোগেনভেলিয়ার ডালাপালাগুলি বাতাসে নড়ছে। কুকুরটা সেই ডালাপালায় কি যেন শিকার খুঁজছে। সে ভাবল, দিদিমণি ডাকলে সাড়া দেবে না। বরং শরীরের যা অবস্থা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লে ভাল। কিন্তু ভয়—সে যেন শুয়ে পড়লেই ধরা পড়ে যাবে! তোমার কি হয়েছে সুবল দাদা। তুমি শুয়ে আছ কেন! ডলি (কুকুরের নাম) কি দুষ্টুমি করছে ন্যাখো। একেবারে সারাটা দিন লিলি দিদিমণি কচিখুকির মতো থাকে। যেন শরীরে কিছুই গজায় নি। কিছু বোঝে না জানে না মতো। অথচ সাজ-পোষাকে শরীরের সব উঁচু ক'রে রাখার বাসনা। এসব ভাবতেই সে কেমন জিভে কামড় দিল। সে কর্তাবাবার আমল থেকে আছে, বিশ্বাসী মানুষ। ওরা যখন সবাই উটি চলে যায় হাওয়া বদলাতে তখন সে বাড়িতে একা থাকে। কুটোগাছটি পর্যন্ত কেউ সরাতে পারে না। সুতরাং বিরক্ত মুখে সে লিলি দিদিমণির অথবা মিলি দিদিমণির সম্পর্কে কিছু অশ্লীল চিন্তা ক'রে ফেলে নিজেই জিভে কামড় দিলে শুনল, ডাকছে লিলি দিদিমণি, না কি ছোট মা ডাকছে, গলার স্বরটা সে কেন জানি বুঝতে পারল না, জ্বরের জন্য হয়ত হবে কারণ তার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, চোখমুখ লাল, সে সকাল থেকেই দুরে দুরে থেকেছে। তার কোনোদিন কোনো অসুখ হয় নি, হলে সে নিজেকে বড় ছোট ভাবত, অসুখ হওয়াটা ওর পক্ষে কৃতিত্বের ব্যাপার নয় সে জানে। আজ এই যে এত বছর পর শরীরে জ্বর এসে গেল—এবং দু-একটা ফুসকুরি ভেসে উঠেছে শরীরে, কোমড়, হাত পা ভীষণ কামড়াচ্ছে, সে দাঁড়াতে পারছে

না ভালমতো, এখন যে সে কি করে! ছোট মা না লিলি দিদিমণি ডাকছে তা পর্যন্ত সে বুঝতে পারছে না। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে তার কি করা কর্তব্য এখন, বাতাসে ফুঁ দেবে না দূর থেকে সব কথা শুনে চলে আসবে! সে যাই হোক কিছু ভাববার আগেই ছোট মা কেমন সিঁড়ির মুখে তড়তড় ক'রে নেমে এল; এই সুবল তোমাকে যে ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না।

—হ্যাঁ মা শুনতে পাচ্ছি, বললেই শুনতে পাব।

—বাজার থেকে এক কিলো মুরগির মাংস নিয়ে আয়।

—আর কি লাগবে?

ছোট মা বললেন, দাঁড়া। বলে উপরে উঠে গেলেন, ফ্রিজ খুলে কি দেখলেন, তারপর বললেন, না আর কিছু লাগবে না

সুবল মার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে উপরে গেল, টাকা নিল এবং নেবার সময় দেখল মুখের দিকে তিনি হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছেন। হ্যাঁরে সুবল, তোর অসুখ করেছে!

—না মা অসুখ করে নি।

—চোখ মুখ এত লাল!

—রাতে ভাল ঘুম হয় নি।

—কুকুরটা বুঝি জ্বালিয়েছে?

—না মা কুকুরের দোষ কি। সে আমার ঘরে শোবে না লিলি দিদিমণির ঘরে শোবে ঠিক করতে পারে না। দিদিমণি দরজা খুলে শোয়, আমার শুতে ভয় করে।

ছোট মা হেসে দিলেন। সুবল হাবাগোবা লোক। বয়স হয়েছে। প্রৌঢ় বলা চলে। মিলি-লিলির সে জন্ম দেখেছে। সে ওদের কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করেছে। তবু যে কেন সুবল ভয় পায়!

ছোট মা বললেন, তোর তো কোনো অসুখ করে না জানি।

—হ্যাঁ মা, আমার অসুখ করে না মনে পড়ে না—

—অসুখ হয় না তোর, কি যে হিংসে হয় না তোকে!

—তা মা আমার এইটা আছে হিংসা করার মতো। কোনো অসুখ হয় না।

—আর আমায় ছাখ…এই বলে ছোট মা আর কিছু দেখালেন না। কথা অর্ধেক পথে বন্ধ ক'রে দিলেন। এত বেশি কথা তিনি কখনও সুবলের সঙ্গে

বললেন না। বলে ফেলে তিনি নিজেই কেমন তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত ক'রে নিলেন।…তাড়াতাড়ি ফিরবি।

—ফিরব মা।

—তোর এই একটা অসুখ আছে। বাড়ির বাইরে গেলে আর ফিরে আসতে চাস না!

—তা মা আমার এই একটা অসুখ কি ক'রে যে হয়ে গেল!

সত্যি ওর এই একটি মাত্র অসুখ। বাইরে বের হলে ফিরে আসতে ইচ্ছে হয় না। কতলোকের সঙ্গে তার পরিচয়। সকলের সঙ্গে সে একটা যেন সম্পর্ক পাতিয়ে বসে আছে। রাস্তার মোরে নন্দী মশাইয়ের কাপড়ের দোকান, পরে পালবাবুর চায়ের দোকান, এবং বড় পথ ধরে গেলে কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে একটা মানুষ বসে থাকে, চুল দাড়ি কামায়—তার সঙ্গে দেখা হলেই—এই যে সুবল দা, মুরগির মাংস আনতে যাচ্ছে। কেবল ওদের খোঁটা দেবার স্বভাব —এত মুরগি খায় কি ক'রে? দুবেলা মুরগি, তাজা মুরগি—আহা ওরা যেন সুবলের মুখ দেখলে বড় বাড়িটা যে সুন্দর সুন্দর মুরগির কলিজা সিদ্ধ ক'রে খায় তা টের পায়। পরে বের হলেই সুবলকে এ ও ডাকবে, কথা বলবে, মেযে দুটোর খবর নিতে চাইলে সে জিভে কামড় দেবে—ওদের কিছু বেলাল্লাপনা, অথবা চুটল চালচলন এইসব মানুষের চোখে লাগে—ওরা যেন সুবলকে কাছে পেলে—সব রাগদুঃখ উজার ক'রে দিতে চায়। সে সেজন্য যতটা পারে ওদের কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করে—অথবা কোনোদিন কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে বসে থাকলে তার কেন জানি একটা আবাসের কষ্ট। মনে হয়, সে তার পুত্র সন্তানটিকে যে কোথায় কার কাছে গচ্ছিত রেখে চলে এসেছিল এখন যেন সব মনে করতে পারে না। বৌটা পালিয়ে গেলে সে উন্মাদের মতো হয়ে গিয়েছিল—সে এ-দেশে এসে অভাবের সঙ্গে লড়তে পারে নি। বৌটা তার স্বজন ফেলে একা বাউণ্ডুলে মানুষের সঙ্গে ভেগে গেল। সুতরাং সে মুরগির মাংসের জন্য অথবা অন্য কোনো কাজে বের হলে চুপচাপ হাঁটে—হাঁটতে হাঁটতে সে তার স্মৃতিতে ফিরে যায়। এবং কি ক'রে যেন দশটা পাঁচটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওর দেরি হয়ে যায়—সে টের পায় না কত আগে বের হয়েছে! বাড়ি ফিরে গেলেই ছোট মা একেবারে রণমূর্তি। মায়ের আঁচল পর্যন্ত তখন ঠিক থাকে না। কুকুরটা শুয়ে কুঁই কুঁই করতে থাকে। সুবল একেবারে নির্বিকার। যেন এই চিৎকার চেঁচামেচি সে আদৌ

শুনছে না। সে তার কাজ ক'রে যাচ্ছে। কারণ এ-বাড়িতে ছোটবাবু তার আপনার জন। একমাত্র তিনিই তার দুঃখটা ধরতে পারেন। বের হবার সময় সে মুরগির মাংস কিনে তাড়াতাড়ি ফিরবে এমন ভাবল।

কিন্তু পথে বের হতেই ওর ভেতরে একটা ভয় লেগে গেল। সে এতক্ষণ ঘরের ভিতর ছিল। ছায়া ছায়া অন্ধকারে বোঝা যায় নি, ওর মুখে মুসুরির মত দুটো-একটা গোটা দেখা দিচ্ছে। সে যে এখন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে চাদর গায়ে দিলে পারত। এবং অর্ধেকটা মুখ তবে ঢেকে রাখা যেত। এই গরমে চাদর গায়ে দিলেই অবিশ্বাস বাড়বে। আরে তুমি কি পাগল, চাদর গায়ে, এই সকালের রোদে বের হয়েছ! না কি তোমার জ্বরটর আছে শরীরে! অসুখ হয়েছে তোমার! সে সুতরাং চাদর গায়ে দিতে পারে না। সে প্রায় হনহন ক'রে হাঁটতে থাকল। যদি বলে কেউ, অ সুবল, তোমার মুখে ও-সব কি উঠেছে!

সে বলবে, আর কবেন না কর্তা মুখে আমার ব্রনো উঠেছে।

—এই বয়সে ব্রনো, তুমি কি বাবা রাত জেগে ছোট দিদিমণির হালকা শরীর স্বপ্নে ছাখো না কি?

—ছি ছিঃ, কি যে বলেন! ওদের আমি কাঁধেপিঠে মানুষ করেছি। ওরা আমার···

—ওরা তোমার কি?

সে আর যেন মনে মনে কোনো উত্তর পায় না। সে শুধু হনহন ক'রে হাঁটে। ওকে তাড়াতাড়ি মাংস নিয়ে ফিরতে হবে। মুরগির সাধু ভাষায় কি বলে, কুক্কুট। কুক্কুটের মাংস!

সে বাজারে ঢুকলেই লোকগুলি ওর দিকে বেশি ক'রে তাকাতে থাকল। শরীরে কি যে কষ্ট! চোখমুখ ফেটে যাচ্ছে মতো। মনে হয় শররীটা তার ফুলে যাচ্ছে, এত বিষ ব্যাথা। সে আহা-উহু করতে পারলে কিছুটা আসান পেত। কিন্তু যেভাবে লোকগুলি ওকে দেখতে আরম্ভ করেছে, তাতে তাকে নির্বোধের মতো দেখাচ্ছে। নির্বোধ না হলে এমন মুখ নিয়ে কেউ বাজারে আসে!

সে মুহূর্ত দেরি করল না। যতটা তাড়াতাড়ি পারল, যেন এখন সে বাজার থেকে চুরি ক'রে পালাচ্ছে, হাতে কুক্কুটের মাংস, গায়ে বসন্ত ফুটে ফুটে বের হচ্ছে। এবং এখন মুখে চার-পাঁচটা মাত্র গোটা, একটু বেলা হলেই ওগুলো বেড়ে যাবে সংখ্যায়—সে তাড়াতাড়ি একটা নিমগাছের নিচে এসে

দাঁড়াল। কিছু নিমের পাতা পকেটে পুরে হাতে কুক্কুটের মাংস নিয়ে হাঁটতে থাকল। তখন সে দেখল একদল মেয়ে-পুরুষ, হাতে তাদের লাঠি সড়কি, এবং লাল নিশান—ওরা বিপ্লবের ধ্বনি দিতে দিতে চলে যাচ্ছে। ওর ইচ্ছা হল কুক্কুটের মাংস হাতে নিয়ে সেও সেখানে ভিঁড়ে যায়। গনগনে রদ্দুরে ওর শরীরে মুখে যা সব বের হচ্ছে তা বিষের মতো সারা শরীরে গলেপড়ুক। হাফ্-ডেড হয়ে বেঁচে থাকতে আর ওর ভাল লাগছে না। সে দিদিমণিদের মতো ইংরেজি উচ্চারণ করল।

বাড়ির ভিতর ঢুকেই সে সদর বন্ধ ক'রে দিল। দুপাশে নানারকমের মৌসুমি ফুলের চাষ। টবে সুন্দর সুন্দর গোলাপ ফুটে আছে। ব্যালকনিতে হাল্কা পোষাকে লিলি দিদিমণি চুলে ক্রিম মাখছে। অথবা এই যে বাগানে এতসব ফুল ফুটে আছে, বড় রাস্তায় বাসট্রাম যাচ্ছে এবং নির্বোধের মতো মুখ নিয়ে সুবলদা ফিরছে কুক্কুটের মাংস নিয়ে—তার কাছে এসব অর্থহীন। শরীরে কোমল নীল রঙের এক মৌমাছি কেবল হুল ফোটায়। বড় আকাশ মাথার উপর থাকলেই লিলি দিদিমণির অন্যমনস্ক হতে ভালো লাগে।

সুবল সিঁড়ি ধরে দোতালায় উঠে যাচ্ছে। সিড়িতে কি সুন্দর কার্পেট। দুপাশে পেতলের ভাসে সব নানা বর্ণের মানি প্ল্যান্ট এবং পরিচ্ছন্ন সংসার, সুবল হাতে ক'রে মানুষ করছে। সে যেতে যেতে দেখল দুটো পাতা শুকনো মানি প্ল্যাণ্টের, পাতা দুটো ছিঁড়ে ফেলল। সুবলের জন্য এই বাড়িতে তকতকে কুটোগাছটি পড়ে থাকবার জো নেই। সে সব ঝেড়েপুঁছে তকতকে ঝকঝকে ক'রে রাখে। বরাবরের এটা অভ্যাস সুবলের, বাবু অথবা ছোট মা বাড়ি থাকুক আর না থাকুক, সে বাড়ির এইসব মানি প্ল্যাণ্টের মতো চুপচাপ এখানে দীর্ঘকাল পড়ে আছে। ওর কোনো নালিশ ছিল না। কোনো অসুখ ছিল না, কি যে বিড়ম্বনা হয়ে গেল—এই অসুখ নিয়ে সে এখন কি করবে—তার এত কাজ, শুয়ে থাকলে চলবে কেন, আর সে পরম বিশ্বাসী মানুষ, অসুখ নেই বলে সংসার তাকে নানারকম সুযোগসুবিধা দিয়ে থাকে—সে দুপুরের পর একটু ঘুমোতে পায়। কেউ তখন ওকে জ্বালাতন করে না। কুকুরটা পর্যন্ত ঘরে ঢুকতে ভয় পায়।

দোতালায় বারান্দায় ছোটবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। সে একটু ঘুরে গেল, যেন ওদিকটায় সে ছোটমার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছে—কুক্কুটের মাংস, দাম এবং পয়সা এসব সম্পর্কে সামান্য কথাবার্তার জন্যে। সে মুখটা ঘুরিয়ে হেঁটে

হেঁটে ছোটবাবুকে পার হয়ে গেল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখতেই মনে হল, ছোটবাবু তাকে তখনও দেখছে। সে একেবারে ছুটে এবার বাথরুমের পাশে ঘরটায় এখন লিলি দিদিমণি কাপড় ছাড়বেন তার পাশে গিয়ে ব্যাগটা রেখে দিল। সে আর এই ঘুপ্‌চি-মতো জায়গা থেকে নড়ল না। দিদিমণির হয়ে গেলে সে একেবারে সায়া ব্লাউজ কাপড় সব ধুয়ে নিচে গিয়ে শুয়ে পড়বে। নতুবা মাথা ঘুরে পড়ে গেলে সে হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবে।

ছোটবাবু ব্যালকনির দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন—তাঁর মনে হল সুবল কেমন তাঁকে আজ এ ড়য়ে চলছে। মুখটা ভার-ভার, লাল্‌চে মতো। যেন কিছু হয়েছে। তিনি আজ ছুটির দিন বলে কোর্টে বের হন নি। বিচারক মানুষ। মনটা সহজেই খুঁতখুঁত করতে থাকল। সে কি কোনো অপরাধ ক'রে ফেলেছে—যা আজকালকার দিন, কিছুই বিশ্বাস নেই, লুকিয়ে লুকিয়ে থাকছে, ডাকলে কাছে আসছে না, দূর থেকে জবাব দিচ্ছে—চোখ মুখ ফোলা ফোলা দেখাচ্ছে—কি যে করবেন এখন, কি করলে বিচারকের মতো দৃঢ়তা দেখানো হয়—ভেবে তিনি ডাকলেন, সুবল, সুবল আছিস!

—আজ্ঞে যাই, ছোট হুজুর। বলেই সে এক দৌড়ে দরজার পাশে নিজেকে আড়াল ক'রে দাঁড়াল। যেন ছোটবাবু ওর ভাসুর ঠাকুর। সে গ্রাম্য বিধবা বৌয়ের মতো জড়োসড়ো হয়ে শরীর ঢেকেঢুকে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

সুবলের সহসা এ সংকোচবোধ দেখে ছোটবাবু না হেসে পারলেন না। তিনি বললেন, কিরে তুই ওখানে দাঁড়ালি কেন?

—আজ্ঞে।

—কাছে আয়।

সুবল নড়ল না।

—তোর মুখটা এমন দেখাচ্ছে কেনরে?

—কেমন দেখাচ্ছে ছোট হুজুর!

—কাছে আয় বলছি।

সে আর পারল না। সে হুজুরের পায়ের কাছে একেবারে ভেঙে পড়ল—হুজুর আমার শরীরে গোটা উঠেছে।

কেমন আঁৎকে উঠলেন তিনি! বলিস কি!। টিকে নিস নি?

—নিয়েছি হুজুর।

—দেখি মুখটা। বলে ভাল ক'রে আলোতে নিয়ে দেখলেন।—তুই এই নিয়ে বাজারে গেলি! হাওয়া লাগাচ্ছিস শরীরে!

—হুজুর আস্তে। ছোট মা জানলে কুরুক্ষেত্র করবে।

রাখ তোর কুরুক্ষেত্র! চুপচাপ গিয়ে শুয়ে থাক। মশারি টানাবি। একদম বের হবি না।

—কে একদম বের হবে না! ছোট মা শুনে একেবারে ছুটে এলেন।

—তোমাদের সুবল।

—কেন কি হয়েছে?

—পক্স হয়েছে।

মানে!

—মানে পক্স। পক্স বোঝ না! মুখে ত্মাখো না—এই সুবল একটু ঘুরে দাঁড়া।

—অমা…তবে কি হবে!

মিলি মায়ের চিৎকার শুনে ছুটে এল। ছোট মা দুহাতে মিলিকে ঘরে ঢুকতে বাধা দিলেন। সর্বনাশ! এখন কি হবে!

মিলি বলল, কি হয়েছে মা?

চোখ লাল ক'রে ছোট মা বললেন, তুমি যাও। যা করছিলে করগে।

মিলি এখন কাপড় ছেড়ে এসেছে। সে স্নান করেছে। শরীরে সর্বত্র ঠাণ্ডা ভাব। চন্দনের গন্ধ শরীরে। চোখেমুখে কমনীয় ভাব। এবার গিয়ে মিলি আয়নায় বসবে। মুখে পাউডার দিয়ে শুয়ে বের হলে সে দেখতে পাবে, তার মুখেও গুটি উঠে গেছে! সে শুনেছে, শুনে ফেলেছে, শুনে ছুটে গেছে লিলির ঘরে, ওঠ দিদি, এখনও তুই গল্পের বই পড়ছিস—কি হয়েছে জানিস না! সুবলদার পক্স হয়েছে।

এই এক ব্যাপার—যেন প্রায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে—ছুটোছুটি, এমন সুন্দর সুন্দর সব মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—আয়নার পাশে দাঁড়ালেই মনে হচ্ছে গুটি উঠে এমন সুন্দর ভালোবাসার জন্য উদাস মুখ এবং এমন চোখের নিচে কাজল সব নষ্ট ক'রে দেবে—এই তিন যুবতী, ছোট মা এই বয়সেও নিজেকে যুবতী ক'রে রেখেছেন—যেন বয়স বাড়ে না তাঁর, মুখে রেখা পড়ে না, কেবল খুকি খুকি, ওলো সখি ভাব—সে যে এখন কি করবে, সুবল ছোট মার দিকে তাকাতেপারছে না—চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এতদিনের

বিশ্বাসী মানুষটা, এই বাড়িতে সে এতদিন আছে—কোনোদিন কোনো অবিশ্বাসের কাজ সে করে নি, আজ সে যে এটা কি ক'রে বসল! ছোটবাবুর জোড়ে জোড়ে পা ছড়িয়ে প্রথম কাঁদতে ইচ্ছে হল। না এখন কাঁদার সময় নয়, একটা বিহিত করতে হবে—কুকুরটা এদিকে নেই—যা লোভ এই কুকুরের, সব মুরগির মাংস না আবার খাবলা খাবলা খেয়ে নেয়—কুকুরটা কোথায় রে?

লিলি বলল, সুবলদার ঘরে।

—ওটাকে ওর ঘর থেকে নিয়ে আয়।

—যাচ্ছি। দূর থেকে জবাব দিল লিলি।

—মাংস ফ্রিজে তুলে রাখ।

—রান্না হবে না মা? লিলি বই ভাঁজ ক'রে চিৎকার ক'রে জানতে চাইল।

—রাখ তোর মাংস। এখন তোমাদের বাঁচাতে পারলে হয়।

—কি আরম্ভ করলে তুমি! ছোটবাবুকে ধমক না দিয়ে পারলেন না।

—এত বড় সর্বনাশ! আর তুমি বলছ আমি কি করেছি!

—মানুষের তাই বলে অসুখ বিসুখ করবে না!

—তাই বলে এই অসুখ! যার কোনো ওষুধ নেই। যা এত সংক্রামক, বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। সে আর অন্য অসুখ খুঁজে পেল না। পষ্ট পষ্ট ক'রে বলেছি বাইরে বেশি সময় কাটাবি না!

—তুমি সর। ওকে যেতে দাও। ওর ঘরে চলে যাক। বেচারা দাঁড়াতে পারছে না। কাল থেকেই দেখছি কেমন সব সময় লুকিয়ে লুকিয়ে থাকছে।

—কাল থেকেই হয়েছে! তবে ত সোনায় সোহাগা! সব জড়িয়ে এখন তিনি আমায় উদ্ধার করতে যাচ্ছেন।

—তুমি সর বলছি!

—আমি সরছি। কিন্তু সুবল ঘরে থাকবে না।

—তার মানে!

—মানে সোজা। কে ওর পচা গলা শরীর দেখাশোনা করবে!

—কেন তুমি!

—আমি পারব না।

—লিলি মিলি!

- ওদের বিয়ে দিতে হবে না!

—ঠিক আছে আমিই করব।

এত বুঝি সোজা!

—ছোটবাবু সামান্য হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকলেন। ছোট বৌয়ের চোখের দিকে তিনি তাকাতে পারছেন না। ভয়, ভীতি এবং বিস্ময়ে চোখ দুটো কেমন ছোট হয়ে গেছে। তিনি যে দৃঢ়তাটুকু দেখাবেন স্থির করেছিলেন, স্ত্রীর এমন ভয়াবহ চোখ দেখে তা আর দেখাতে পারলেন না। তিনি শুধু ধীরে ধীরে বললেন, ঠিক আছে, এখন তুই সুবল গিয়ে শুয়ে থাক। দেখি কি করতে পারি।

সুবল বলল, ও ঠিক আছে বাবু। আমার খাবারটা জলটা বাইরের ঘরে রেখে যাবেন—আমি সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাব। এই বলে সুবল নেমে যাচ্ছে এমন সময় ছোট বৌ ডাকল, সুবল তুমি ও-ঘরে ঢুকবে না।

—আমি কোথায় যাব তবে মা।

—কটা ত দিন। কোথাও গিয়ে থাক। তোমার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই?

—সে তো সবই জানেন।

—তার জন্যে অসময়ে কোনো আত্মীয়স্বজন থাকবে না সে কি ক'রে হয়! তুমি বরং সুবল, তোমার বিছানা নিয়ে কিছুদিন আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে এস।

সুবল বুঝতে পারল, ছোট মা সাহস পাচ্ছেন না। সে বলল, ঠিং আছে মা। আমি রাস্তায় গিয়ে নিমগাছের নিচে শুয়ে থাকব।

—সেই ভাল মানে! ছোটবাবু আর নিজেকে সংযত ক'রে রাখতে পারলেন না। কিন্তু সুবল জানে ছোটবাবু ভীতু গোছের মানুষ। যখন ছোট মা কোনো রকমে পারবেন না—তখন কেমন একটা অসুখের ভান করে বিছানায় সারাদিন শুয়ে থাকেন, চোখমুখ বসে যায়—অদ্ভুত রহস্যজনক এক অসুখ ছোট মা ভিতরে তখন পুষে রাখেন। ছোটবাবুর আর তখন চিন্তার শেষ থাকে না—তিনি আর ছোটমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে সাহস পান না। তখন শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, ভালোবাসার কথা বলেন, পৃথিবীতে এই ছোট বৌ বাদে তাঁর আর কে আছে—একেবারে মলিন মুখ তখন সহসা নির্মল হয়ে যায়। ছোট বৌয়ের ঠোঁটে সামান্য হাসি ভেসে

উঠলে তিনি নিশ্চিন্ত। সুতরাং সুবল বুঝতে পারল শেষপর্যন্ত ছোটমা-ই জয়ী হবেন—সে আর দাঁড়াল না—মাদুর বগলে ক'রে রাস্তায় নেমে একটা বড় গাছের উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকল।

সুবল হাঁটতে থাকল। বগলে মাদুর, হাতে একটা পেতলের ঘটি আর ছেঁড়া বালিশ। সে হাঁটছে। খর রোদে ট্রামবাস পার হয়ে যাচ্ছে। রাস্তার লোকগুলি ওর মুখ দেখে আঁৎকে উঠছে—অথচ কিছু বলছে না—যে যার মতো বাড়ি ফেরার তালে আছে—অথচ অফিসে কাচারিতে গিয়ে গল্প করবে, শালা কলকাতায় আর বসবাস করা যাবে না, রাস্তায় এখন লোকজন মুখে শরীরে পক্স নিয়ে চলাফেরা করছে। মানুষজন যা হয়ে যাচ্ছে—ফুটপাথে বাচ্চা দিচ্ছে, এসব যে দিনেদিনে কি হচ্ছে, কি হচ্ছে শালা—বলে ওরা হয়ত গপ্‌প ক'রে পান খাবে এবং বাড়ি গিয়ে বিবি নিয়ে শুয়ে থাকবে।

সুবল একটা ছায়ামতো জায়গা খুঁজছে। তার আত্মীয়স্বজন বলতে ছায়ামতো জায়গাটা এবং নিচে শুয়ে থাকলে গাছের পাতা মুখের উপর ঝরে পড়তে পারে—নিমগাছ হলে ভাল হয়, মারিমড়কের দেবী নিমগাছের হাওয়া সহ্য করতে পারে না। বাড়ির কাছে একটা নিমগাছ আছে, কিন্তু সেখানে শুয়ে থাকলে পাড়ার লোকেরা চিনে ফেলবে এবং ছোটবাবুর ওপর গিয়ে হামলা করতে পারে—সে সেজন্য রেলিং দেওয়া পুকুর পার হয়ে এল, বড় বড় দালান কোঠা পার হয়ে এল, বাগানে নানারকমের ফুল ফুটে আছে, গ্রীষ্মের দিনেও নানারকম ফুল ফোটে—ও জল তেষ্টা পাচ্ছে। সে হাঁটতে হাঁটতে কম দূর চলে আসে নি! যারাই দেখছে সরে যাচ্ছে। রাস্তার লাল নিশান হাতে নিয়ে জনগণতান্ত্রিক সরকার গঠনের জন্যে এক দল মানুষ চেল্লাচিল্লি করছে। সুবল এখন রাস্তা পার হতে পারছে না। ওরা পার হয়ে গেলে, সে ঐ-দূরের গাছটা মনে হচ্ছে গাছটা নিমগাছই হবে, সে গুটি গুটি পা পা ক'রে হেঁটে হেঁটে সেখানে এবার চলে যাবে। আর সব সুন্দর, কাছেই একটা টিপকল আছে, ডানদিকে চায়ের দোকান, মানুষজনের ভিড় তেমন নেই—নিরিবিলি জায়গাটার জন্যে ওর লোভ বেড়ে গেল। সে জনগণতান্ত্রিকের দলটা পার হয়ে গেলেই সেখানে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। না কি সে ওদের সঙ্গে মিলে গিয়ে এবার নেমে পড়বে! আমি এক হা-অন্নের মানুষ, অসুখ করলে পাপ, ছোট দিদিমনি হালকা পোষাক পরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, আর রেকর্ডপ্লেয়ারে রেকর্ড বাজাচ্ছে এবং ডেটল দিয়ে সারা বাড়ি

ছোটমা কর্পোরেশনের মেথর ডেকে ধুয়ে দিচ্ছেন। একটা অশ্লীল কথা জিভে এল! সুবল নিজের জিভে গপ্ ক'রে কামড় দিল।

বস্তুত যুদ্ধ আর কোথাও হচ্ছে না। রক্তের জন্য, সংগ্রামের জন্য এবং বেঁচে থাকার জন্য ক্রমাগত যুদ্ধ চাই। সে তাকাল উপরের দিকে। গরমকাল বলে দরজা জানলা বন্ধ। ভিতরে ঠাণ্ডায় সব বৌ-বিবিরা এখন শরীর ঠাণ্ডা করছে। বাবুরা অফিস কাচারি থেকে ফিরে এলেই আবার ধকল যাবে শরীরে, এখন শুয়ে বসে লম্বা হয়ে শরীর ঠিকঠাক ক'রে নেয়া—সুতরাং দরজা জানলা বন্ধ, সে সেইসব দরজা জানলার নিচে একটা বড় মতো নিমগাছের ছায়ায় মাদুর বিছাল। হাত-পা ঝাঁ ঝাঁ করছে, কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। কতক্ষণে গড়িয়ে পড়বে। এক ঘটি জল নিয়ে এল সে। মনে হল ওপাশের একটা খুপড়ি মতো ঘরে দুটো রাস্তার ছেলে ওকে দেখছে। সে জল এনে শুয়ে পড়লেই গুটি গুটি সেই দুই রাস্তার বালক পাশে এসে দাঁড়াল। বেশ কৌতূহল নিয়ে ওরা সুবলকে দেখছে। মুখে বড় বড় গোটা, জল নিয়ে একেবারে বেথুন ফলের মতো টসটসে হয়ে আছে। সুবল চোখ বুঁজে ছিল, টের পায় নি, দুজন নাবালক ওর মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের নিশ্বাসের শব্দ সে যেন টের পেল এবং চোখ তুলে তাকালে দেখল—ওরা ওকে দেখে ফিক্ ক'রে হাসছে।

—তোরা কেরে?

—আমরা? ওরা এইটুকু বলেই চুপ ক'রে থাকল। ওরা যে কে—ওরা ঠিক জানে না। সুবলও যেন টের পেল ওরা যে কি ওরা জানে না। সে এতদিন কিন্তু এমন অনেক নাবালক ফুটপাথে পড়ে থাকতে দেখেছে তারা কে, কেন এই ফুটপাথে—এমন কথা ওর একবারও মনে হয় নি! মনে হলেও সে এমন ভাবত কৃতকর্মের জন্য তুমি পাপ ভোগ করছ। কৃতকর্ম! শালা জীবনে কোনো কর্মই করিল না, তোর আবার কৃতকর্ম! সে এবার মুখ বিকৃত ক'রে ফেলল। কথা বলতে ভাল লাগছে না। কেবল চুপচাপ পড়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে এবং আঃ উঃ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। পরক্ষণেই সে দেখল, ওরা একজন মাথার কাছে অন্যজন শিয়রে—শালারা কি যমের দুত! সে বলল, এই তোরা কোথায় থাকিস!

ছোট বাচ্চাটি আঙুল কামড়াচ্ছিল। কোথাও না, ওরা কোথাও থাকে না, যখন যেখানে থাকে তখন সেই অঞ্চলটা নিজের বলে ভেবে নেয়। এখন এখানে আছে, সুতরাং বলল, আমরা এখন এখানে আছি।

—জলটল লাগলে এনে দিতে পারিব? তারপরেই সুবলের মনে হল, ওর শরীরে সংক্রামক ব্যাধি। মা দয়া করেছে ওকে। সে বলল, এখানে আসবি না। এলে তোদের অসুখ করবে। মারিমড়কের দেবী শালা তোমাদের প্রেমে পড়ে যাবে।

ওরা যেভাবে মাথার কাছে পায়ের কাছে ছিল, ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল। ওদের কেন জানি এই মানুষটাকে নিজের লোক বলে মনে হয়। ভাঙা একটা টালির ঘ র, আগে কাঠ চেরাই হতো, এখন কিছু হয় না, ঘরটায় ওরা এই ভরদুপুরে শুয়ে থাকে, রাতে এই নিমগাছটার নিচে। এখন একটা লোক এসে জায়গাটায় দখল করে নিয়ে নিয়েছে। ওদের আশেপাশে কোথাও একটা জায়গা ক'রে নিতে হবে।

—তোরা সরে যা, দাঁড়িয়ে থাকলে আমার মতো তোদেরও হবে।

—তোমার জলটল আনতে হবে বলেছিলে!

—না কিছু লাগবে না, আমাকে ঘুমোতে দে।

—ওরা দুপুরে এবার ছুটে বেড়াতে থাকল। কোথাও কিছু নেই, অথচ কি আনন্দে যে ছুটছে এই ভর দুপুরে—মুক্ত পুরুষ, শুধু ছুটো অন্নসংস্থান, তা এ-পাড়ায় এসে ওদের এখন চিন্তা করতে হয় না—কারণ সকাল সকাল নানা-রকমের বাসি খাবার দোতলা-তিনতলা থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, দিনমান ঐ খেয়ে বেশ সুখে দিব্যি চলে যাচ্ছে, স্নান ক'রে আসলে হয়, কিন্তু খুব পরিচ্ছন্ন ভাবটা ভাল নয়, তবে ওদের দেখলেই বলবে বাবুরা, এই যাবি, কাজ করবি—তাই নোংরা, যতটা পারা যায় শরীর, চোখমুখ, চুল নোংরা ক'রে পড়ে থাকা—তারপর নির্বিবাদী হয়ে দিনমান সম্মুখ সমরে—এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে—যা মুখে মনে আসে আওড়ায়, কারণ বড় বড় পোস্টারগুলোর লেখা ওরা দুজন কোনো কোনোদিন বাজি ধরে পড়তে বের হয়। কে কতটা পোস্টার পড়েছে তার একটা প্রতিযোগিতা ওদের ভেতর।

ছোট নাবালকটি বড় বড় চোখে একটা পোস্টার পড়তে গিয়ে থমকে গেল। বড় মাঠে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হচ্ছে। যে যার মতো এখন চাষ করতে লেগে যাও। সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে, ফুল ফুটবে, ফল হবে। দিনমানে পৃথিবীর জায়গা বদল ক'রে নাও।

সে বড় ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে গেল—একটা ভাঙা পাঁচিলে কে এঁটে দিয়ে গেছে পোস্টারটি। ওরা দুজনই কোনো অর্থ ধরতে পারল না। সন্ধ্যায়

সন্ধ্যায় ওরা সেই নিমগাছটার নিচেতে এসে দেখল, বুড়ো মানুষটি নেই। অ্যাম্বুলেন্স এসে এইমাত্র নিয়ে গেছে। ওরা ভেবেছিল, বুড়ো মানুষটাকে অর্থ জিজ্ঞাসা করবে—কি মানে? এই যে লেখা—বড় মাঠে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হচ্ছে যে যার মতো এখন চাষ করতে লেগে যাও। সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে, ফুল ফুটবে, ফল হবে। দিনমানে পৃথিবীর জায়গা বদল ক'রে নাও—এসব কথার কি মানে—কারা লিখছে! কেন লিখছে! দেয়ালে দেয়ালে সব নানারকমের আশার কথা লেখা হচ্ছে—কবে থেকে হবে এটা! ওদের মনে হয়েছিল বুড়ো মানুষটাই একমাত্র জবাব দিতে পারে। কিন্তু এসে যখন দেখল নিমগাছের ছায়ায় কেউ নেই, কেবল মাদুর পড়ে আছে, তখন ওরা মনমরা হয়ে মাদুরটা লাথি মেরে সরিয়ে দিল। এবং সারাদিন ঘুরে আর কিছু করতে ভাল লাগল না। গাছের গুঁড়িতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

বোধহয় কলকাতার আকাশে চাঁদ উঠেছে। এই নিরিবিলি গাছটার নিচে শুয়ে থাকলে বোঝা যায় কখনও কখনও কলকাতার আকাশে চাঁদ ওঠে। ওরা ঘুমোচ্ছিল। দুটো একটা নিমের পাতা মাথায় পড়ছে এবং শরীরে মৃদু বাতাস, ওপাশে একটু হেঁটে গেলেই লেকের জল, জলে কত সুন্দরী মেয়ে এখন কবিতা আবৃত্তি করছে। নরম সিল্কের পোষাক, ফুলের মতো ফুটে থাকা সব মেয়ে এবং ছোক্‌রা যুবক, হাফ্ প্যাণ্ট পরা বালক ব্রিজের নিচে উঁকি মেরে মাছের খেলা দেখতে দেখতে পৃথিবীটাকে পাশের যুবতীর মতো রহস্যময় মনে করছে—বেঁচে থাকা কি মধুর! তখনই মনে হয় কলকাতার আকাশে কোনো কোনোদিন চাঁদ ওঠে, নিমের ছায়ায় অন্নহীন ক্ষুধার্ত বালক ঘুম যায়। এবং রাত দশটা না বাজতে অ্যাম্বুলেন্স ফিরে আসে।

সুবল ফিরে এসেছে। হাসপাতালে চিকেন পক্সের জন্য কোনো ওয়ার্ড নেই। সুতরাং নিমগাছের নিচে রেখে আবার শহরের বুকে অ্যাম্বুলেন্সটা পালিয়ে গেল।

ওরা কাতর গলা শুনে জেগে গেল। ভোজবাজির মতো ব্যাপার। ওরা উঠে চোখমুখ ঘসে দেখল, দিনমানে যে মানুষ শালা গাইব হয়ে গেছিল নিমের ছায়া থেকে, সে আবার অধিক রাতে ফিরে এসেছে। ওরা তাড়াতাড়ি উঠে গেল, এই যে দাদু খুব কষ্ট হচ্ছে!

—তোরা!

—আমরা তোমাকে খুঁজছিলাম।

—তা তুমি যে ফিরে এলে!

সে চুপ ক'রে থাকল। কথার জবাব দিল না। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে খুব। তবু বলল, আমাকে খুঁজছিলি কেন?

—তুমি ভাল হলে তোমাকে আমরা এক জায়গায় নিয়ে যাব।

সুবল বলল, বড় ক্ষিদে পেয়েছে রে!

আমাদের কাছে শুকনো রুটি আছে। খাবে?

—কোথায় পেলি!

—ঐ যা দেয়। রোদে শুকিয়ে রাখি। খেতে মচ্ মচ্ করে। খাও। তুমি ভাল হয়ে যাবে।

এমন ক্ষিদে যে সে এখন যা পাবে, পারলে যেন নিম পাতা বেটে সরবত ক'রে খায়। সে এত কাছে এমন দুজন সহৃদয় মানুষ পেয়ে বলল, আমাকে দিলে তোরা খাবি কি?

—আমারা ঠিক খেয়ে নেব। আমরা ত কোনোদিন উপোস থাকি না। বলে ওরা পুঁটলি খুলে শুকনো রুটি গুড় এবং একঘটি জল দিল। জ্যোৎস্না নিমের পাতার ফাঁকে জাফরি কাটা। ওরা কাছে এলে বলল, এত কাছে আসিস না। তোরা আমার কাছে থাকলে তোদের অসুখ করবে। তারপর কি আরামে এবং সুখে যেন সে মড়মড় ক'রে মুখে দিতে গিয়ে দেখল জিভে লাগছে। গলায় লাগছে। তবু ক্ষিধের যন্ত্রণাতে সে খেয়ে ফেলল রুটি এবং গুড়। কেমন একটা পরিতৃপ্ত ভাব। সে বলল, আমাকে তোরা কোথায় নিয়ে যাবি?

—একটা কথার মানে বুঝছি না দাদু।

—কি কথার মানে রে!

—বড় মাঠে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হচ্ছে, যে যার মতো চাষবাস করতে লেগে যাও। সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে। ফুল ফুটবে, ফল হবে। দিনমানে পৃথিবীর জায়গা বদল ক'রে নাও।

বুড়োর মুখটা কেমন সহসা অতর্কিত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, কোথাও এমন কথা আজকাল লেখা হচ্ছে!

—হ্যাঁ দাদু!

—আমাকে নিয়ে যাবি সেখানে? আমি বসে বসে লেখাটা পড়ব।

—তুমি ভাল হলে তোমাকে নিয়ে যাব।

কিন্তু সকাল হতে না হতেই আবার অ্যাম্বুলেন্স এসে সুবলকে নিয়ে গেল। তার আর সেখানে যাওয়া হল না।

গাছের নিচটা আবার খালি। বুড়ো মানুষটিকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে গেছে। ওরা বাসি খাবার সংগ্রহ করতে বের হবে এবার। উঠি উঠি করেও দেরি ক'রে ফেলেছে। আশা ছিল বুড়ো মানুষটিকে নিয়ে যাবে, যেখানে সেই কথাগুলি লেখা আছে সেখানে। কোথায় কোন্ হাসপাতালে নিয়ে গেল ওকে ওরা জানে না। আর দেখা হবে না ভাবতেই কেমন কষ্ট হচ্ছিল ওদের। ওরা চুপচাপ হাতে নুড়ি প'থর নিয়ে ক্রমাগত ঢিল ছুড়ছে কাচের জানলাতে।

বড়টি বলল, ফিরে যাবি না?

ছোটটি বলল, আমার কিছু ভাল লাগছে না।

—ভাল লাগছে না কেনরে?

—ওরা ওকে কোন্ হাসপাতালে নিয়ে গেল?

—দাদুর জন্যে কষ্ট হচ্ছে!

ছোটটি হাসল। তারপর শিস্ মেরে উঠে দাঁড়াল। কষ্ট থাকতে নেই, ঘুরে ফিরে নেচে নেচে সে কোমর দুলিয়ে গাছের ছায়ায় ছায়ায় হাঁটার সময়ই দেখল, সেই অ্যাম্বুলেন্সটা আবার ফিরে আসছে। ওরা গাড়িটা দেখেই ছুটে এল। এবং ওদের ফের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল।—ওরা তোমায় রাখল না!

সুবল বলল, মাদুরটা বিছিয়ে দে। সে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল। ওর মুখে ও সারা গায়ে এখন গুটি। এবং ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। সে বলল, আমাকে তোরা কোথায় নিয়ে যাবি বলছিলি?

—তুমি ভাল হলে নিয়ে যাব।

আমি ভাল আছি। আমাকে আজ রাতে নিয়ে চল। কেউ দেখতে পাবে না। রাতে রাতে আমরা সেখানে চলে যাব।

রাতের বেলা, যখন গাড়িঘোড়া আর চলছে না, শেষ ট্রাম চলে গেছে, তখন সে ধীরে ধীরে ওদের দুজনকে নিয়ে হাঁটতে থাকল। এমন একটা কথা আজকাল লেখা হচ্ছে। কোথায় কিভাবে লেখা হচ্ছে—সে উৎসাহে সব কষ্ট ভুলে যাচ্ছে। দিনমানে জায়গা বদল ক'রে নাও। ওরা বড় রাস্তা পার হয় একটা পার্কের পাশ দিয়ে হাঁটতেই যেন সুবল তার পরিচিত পথের সন্ধান পেল। এই পথে সে রোজ কুকুটের মাংস কিনতে বাজারে যায়। গরীবের

অসুখ হতে নেই। অসুখ হলে হাসপাতালে জায়গা থাকে না। বার বার একটা অ্যাম্বুলেন্স ওকে নিয়ে কপট আরোগ্য কামনায় ছোটাছুটি করে।

বাড়িটা সে চিনতে পারল। বোগেনভেলিয়ার অশান্ত শাখা-প্রশাখা দুলছে। এত রাতে শুধু লিলিদি জেগে আছে। বাড়ির সেই নতুন হলুদ রঙের দেয়ালের নিচে ওরা তিনজন হাঁটু মুড়ে বসল। রাস্তার আলোতে স্পষ্ট সেইসব শব্দগুলি চোখের উপর নাচতে থাকল! কুকুরটা বুঝি টের পেয়েছে। ব্যালকনিতে চিৎকার করছে। ওরা তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে পেছনের দেয়ালটায় চলে গেল। এবং রাতে রাতে ওরা এইসব দেয়ালের চারপাশে লিখে বেড়াতে থাকল—বড় মাঠে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। যে যার মতো চাষবাস করতে লেগে যাও। সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে। ফুল ফুটবে, ফল হবে। দিনমানে পৃথিবীর জায়গা বদল ক'রে নাও। ওরা সেই লেখা দেখে দেখে কেমন উদ্দীপ্ত হল এবং নিজেরা লিখতে আরম্ভ ক'রে দিল।

ওরা দেখল চারপাশে সব জানলা দরজা ভয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যা কিছু ঐশ্বর্য, সুখ এবং প্রেম ভালোবাসা মানুষের কাছ থেকে চুরি ক'রে শুকনো বাঘ অথবা হরিণের মাথার ভিতর ওরা পুরে রেখেছিল, দেয়ালে দেয়ালে এখন সেইসব বাঘের মুখ আস্ত বাঘ হয়ে লাফিয়ে পড়ছে। হরিণেরা দ্রুত দৌড়ায়। কিন্তু বাঘের থাবাতে হরিণের মাংস এবং কলিজা এবার খসে খসে পড়বে।

এইভাবে যবে হাজার লক্ষ মানুষের হাহাকার সমস্ত রাজপথ দীর্ণ করবে তখন এক অলিখিত চুক্তি হবে,—আর শাদা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ঘোরাফেরা করবেন না। এবার ভিতরে ঢুকে পড়ুন। এবং রক্তের ভিতর যে রক্ত খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে অস্বচ্ছ আলোতে তাকে দেখে ঘাবড়ে যাবেন না। নিয়মমাফিক আমাদের জানা আছে সূর্য পুবদিকে ওঠে এবং পশ্চিমে অস্ত যায়।

প্রফুল্ল রায়



মানুষ

ঠিক দুপুরবেলা শেরমুণ্ডি পাহাড়ের কাছাকাছি আসতেই হুড়মুড় করে বৃষ্টিটা নেমে গেল।

সেই ভোরে—আকাশ তখনও ঝাপসা, রোদ ওঠেনি,—বাঁশের লাঠির ডগায় রং-বেরঙের তালিমারা ঝুলিটা বেঁধে এবং ঝুলি শুদ্ধ লাঠিটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়েছিল ভরোসালাল। সে আসছে রাজপুত ঠাকুর রঘুনাথ সিং-এর তালুক হেকমপুর থেকে; আপাতত যাবে শেরমুণ্ডি পাহাড়ের ওপারে টাউন ভকিলগঞ্জে।

ভোরে ভরোসালাল যখন হেকমপুর থেকে বেরোয় তখন আকাশের চেহারা দেখে টের পাওয়া যায়নি দুপুরের মধ্যেই চারদিক ভেঙেচুরে এভাবে বৃষ্টি নেমে যাবে। খুব নিরীহ চেহারার দু-চার টুকরো ভবঘুরে মেঘ মাথার ওপর বাতাসের ধাক্কায় ধাক্কায় এদিক-সেদিক ভেসে বেড়াচ্ছিল। তারপর বেলা একটু বাড়লে চাঁদির থালার মতো সূর্যটা আকাশের গড়ানে গা বেয়ে বেয়ে উঠে এসেছিল। গলানো রূপোর মতো ঝক ঝকে রোদে মাঠঘাট বন-জঙ্গল ভেসে যাচ্ছিল তখন। কিন্তু এই রোদ আর কতক্ষণ। বেলা আরেকটু চড়বার সঙ্গে সঙ্গে এক ফুঁয়ে বাতি নিভে যাবার মতো আচমকা চারিদিকে অন্ধকার নেমে এসেছিল। মকাইয়ের খেত, যবের খেত, আখের খেত, নানারকম ঝোপঝাড় আর হতচ্ছাড়া চেহারার দু-একটা গ্রাম পেরিয়ে আসতে আসতে ভরোসালালের অজান্তে কখন যে ভারী ভারী চাংড়া চাংড়া জলবাহী মেঘে আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল টের পাওয়া যায়নি। ভরোসালাল চমকে উঠেছিল মেঘের ডাকে; সেই সঙ্গে তার চোখে পড়েছিল আকাশটা আড়াআড়ি চিরে বিদ্যুৎ ছুটে যাচ্ছে।

মাথার ওপর মেঘ আর বিদ্যুৎ চমক নিয়ে জোরে জোরে পা চালিয়ে দিয়েছিল ভরোসালাল। আজ যেমন করেই হোক তাকে শেরমুণ্ডি পাহাড়ের ওপারে ভকিলগঞ্জে পৌঁছুতেই হবে।

হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ফিরিয়ে বার বার পেছন দিকটা দেখে নিচ্ছিল ভরোসালাল। হঠাৎ একসময় অনেক অনেক দূরে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে সেখানটায় বৃষ্টি নেমে গিয়েছিল। জল নামতে দেখে দৌড়াতেই শুরু করেছিল ভরোসালাল কিন্তু বৃষ্টিটা নাছোড়বান্দা হয়ে তার পিছু নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত শেরমুণ্ডি পাহাড়ের তলায় এসে তাকে ধরেই ফেলেছে।

বেশ কোমর বেঁধেই নেমেছে বৃষ্টিটা। তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে উল্টে-পাল্টা ঝড়ো হাওয়া। এই ঝড়বৃষ্টি ঘাড়ে নিয়ে সামনে খাড়া পাহাড়ে যাওয়া সম্ভব না। ভরোসালাল এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল। আপাতত মাথা বাঁচাবার জন্যে কোথাও একটু দাঁড়ানো দরকার। হঠাৎ সে দেখতে পেল খানিকটা দূরে একটা ঝাঁকড়ামাথা পিপুল গাছের তলায় দশ-বারোটা দেহাতী লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে একটা মেয়েও রয়েছে।

বোঝা যাচ্ছে, বৃষ্টির জন্যই ওরা ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। গাছতলায় মাথা গুঁজে জলের ছাঁট থেকে নিজেদের যতটা বাঁচানো যায় ভরোসালাল দৌড়ে সেখানে উঠল।

ভরোসালালের বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। শরীরের কাঠামো দারুন মজবুত। চওড়া ছড়ানো কাঁধ তার, এবড়ো-খেবড়ো পাথরের মতো প্রকাণ্ড বুক, হাত দুটো জানু ছাড়িয়ে কয়েক আঙুল নেমে গেছে। গায়ের চামড়া পোড়া ঝামার মতো; সাত জন্মে সেখানে তেল পড়ে না। ফলে বারোমাস খসখসে কর্কশ গা থেকে খই উড়তে থাকে। চৌকো মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি তার; থ্যাবড়া থুতনি। চেহারা যেমনই হোক, চোখ দুটো কিন্তু আশ্চর্য মায়াবী—, যেমন সরল তেমনি নিষ্পাপ।

ভরোসালালের পরনে হাঁটু পর্যন্ত খাটো টেনি আর ফতুয়ার মতো লাল কামিজ। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার ঘাড়ের কাছে অনেকখানি মাংস শুকিয়ে ডেলা পাকিয়ে প্রায় ঝুলে আছে। বাঘের থাবা খেয়ে ঘাড়টার অবস্থা ওই রকম।

ভরোসালাল একজন 'বীটার'। এ অঞ্চল যাকে জঙ্গল-হাঁকোয়া বলে সে তাই। তার কাজ হল বনে-জঙ্গলে টিন পিটিয়ে আর চেঁচিয়ে তাড়া করে করে বাঘ-ভাল্লুক কিংবা অন্য জন্তুজানোয়ারকে শিকারীদের বন্দুকের মুখে নিয়ে যাওয়া। বছর তিনেক আগে ব্রকসৌলে এক শিকারীর জন্য টিন পেটাতে গিয়ে বাঘের থাবায় ঘাড়ের মাংস ওইভাবে খুলে গেছে। 'বীটারের' কাজ ছাড়া আরো একটা কাজ করে থাকে ভরোসালাল। চারদিক যত ছোট-খাটো শহর আছে সে সব জায়গার মিউনিসিপ্যালিটিগুলো মাঝে মাঝে রাস্তার বেওয়ারিশ খ্যাপা কুকুর ধরে ধরে মেরে ফেলে। এই কুকুর ধরা আর মারার কাজটি করে থাকে সে।

'বীটারের কাজ কিংবা মারার দায়িত্ব কেউ তাকে ডেকে দ্যায় না। ভরোসালাল নিজেই খোঁজ-খবর নিয়ে শিকারীর বাড়ি বাড়ি কিংবা মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর দরজায় দরজায় হানা দেয়। এই তার জীবিকা। খুবই নিষ্ঠুর হয়তো। কিন্তু স্রেফ পেটের জন্য এসব করতে হয় তাকে।

এদিকে বৃষ্টির জোর আরো বেড়েছে। আকাশের যা অবস্থা তাতে জল কখন ধরবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ঝাঁকড়া মাথা পিপুল গাছের তলায় দেহাতী মানুষগুলোর সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েও কি রেহাই আছে। ডালপালা আর পাতার ফাঁক দিয়ে ঝরঝর জল পড়ে গা মাথা ভিজিয়ে দিচ্ছে। তবে খোলা জায়গায় দাঁড়ালে চোখের পলকে চান হয়ে যাবে। সেই তুলনায় এখানে ভেজাটা কম হচ্ছে, এই আর কি।

অন্যমনস্কর মতো তাকিয়ে তাকিয়ে বৃষ্টির ভাবগতিক দেখছিল ভরোসালাল। হঠাৎ পাশের লোকটা বলে উঠল 'বহোত ভারী বারিষ (বৃষ্টি)।'

ভরোসালাল ঘাড় ফেরাল। দেখল লোকটা মধ্যবয়সী মাথায় পাগড়ী, ভাঙচোরা চেহারা। সে বলল 'হঁা—'

লোকটা এবার বলল, 'মালুম হচ্ছে এ বারিষ জলদি রুখবে না।' তার ভাষা হিন্দী এবং বাংলায় মেশানো। খুব সম্ভব বিহার-বাংলার সীমান্তে কোন অঞ্চলে তার বাড়ি।

ভরোসালাল বলল, 'হঁা—'

মধ্যবয়সী লোকটা এবার তার সঙ্গীদের দেখিয়ে বলল, দুফারে (দুপুরে) হামলোগকো টাউন ভকিলগঞ্জে যাবার বাত ছিল। লেকিন কি করে যাই?'

বোঝা যাচ্ছে এরাও শেরমুণ্ডি পাহাড় পেরিয়ে ওপারে যাবে। ভরোসালাল কৌতূহলহীন চোখে লোকটার সঙ্গীগুলোকে একবার দেখে নিল। তারা অবশ্য এই লোকটার মতো মাঝবয়সী নয়। দামড়া মোষের মতো তারা এক একটা ডাগড়া জোয়ান। তাদের দেখতে দেখতে সেই মেয়েটার দিকে নজর পড়ে গেল ভরেসালালের। দলটার মধ্যে সে একা—একমাত্র মেয়ে।

জীবন বা মানুষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা খুবই কম ভরোসালালের। জোয়ান বয়সের শুরু থেকে বনের হিংস্র জন্তুজানোয়ার আর খ্যাপা কুকুরের পেছনে ছুটে ছুটে এতগুলো বছর কেটে গেছে। তবু সে বুঝতে পারল মেয়েটা গর্ভিনী। দু-চার দিনের মধ্যে তার বাচ্চাটাচ্চা হবে।

পাশের লোকটা প্রচণ্ড বক বক করতে পারে। এবার সে যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম। বৃষ্টিতে ভিজে পাহাড়ী রাস্তার হাল খুবই বুরা (খারাপ) হয়ে গেছে। এখন সেখানে উঠতে যাওয়া বোকামি, পা পিছলে পড়ে গেলে আর দেখতে হবে না—নির্ঘাত খতম হয়ে যেতে হবে।

মেয়েটির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ভরোসালাল বলল, 'হঁা—'

লোকটা এবার বলল, 'লেকিন দুফারের ভেতর ভকিলগঞ্জে হাজির হতে না পারলে কামটা ছুট যেতে পারে।' তাকে খুবই চিন্তিত দেখাল।

'কিসের কাম?'

'ভকিলগঞ্জে নদীর কিনারে বাঁধ বানানো হবে। আমরা মাটি কাটার কামে যাচ্ছি। দেরি হয়ে গেলে গরমিন অফসর (গভর্ণমেণ্ট অফিসার) যদি ভাগিয়ে দ্যায়—'

'রামজী কিরপা করলে ভাগাবে না।' বলতে বলতে আবার মেয়েটির দিকে তাকাল ভরোসালাল। পৃথিবীর কোন কিছু সম্বন্ধেই বিশেষ কৌতূহল নেই তার। নিজের পেটের জন্ম বনে-জঙ্গলে বা লোকালয়ে সর্বক্ষণ তাকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে অন্যদিকে চোখ তুলে তাকাবার সময় পর্যন্ত পায় না। যদিও বা পায় খুবই আগ্রহশূন্যভাবে এই পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষকে দেখে থাকে সে। তবু আবছাভাবে ভরোসালাল ভাবল কি ওই মেয়েটির পেটে ন-দশ মাসের বাচ্চা রয়েছে। এ অবস্থায় সেও কি মাটি কাটতে চলেছে। জেনানাদের এ সময়টা কোন ভারী কাজ করা ঠিক নয়। ভাবল বটে, তবে কিছু বলল না।

সেই লোকটা ঘাড়ের পাশ থেকে বলে উঠল, 'রামজী কি কিরপা করবে?'

ভরোসালাল এবার আর উত্তর দিল না। অন্যমনস্কের মতো মুখ ফিরিয়ে মেঘের ভারে নেমে আসা ঝাপসা আকাশ দেখতে লাগল।

কিন্তু উত্তর না দিলে কী হবে, পাশের লোকটা ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির মতো সামনে বকে যেতে লাগল।

কতক্ষণ পিপুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে ছিল, খেয়াল নেই ভরোসা-লালের। হঠাৎ একসময় বৃষ্টির তোড় কমে এল; সেই সঙ্গে ঝড়ের দাপটাও। তবে আকাশ ভারী হয়ে আছে। যে কোন মুহূর্তে প্রবল বেগে আবার শুরু হয়ে যেতে পারে।

সেই লোকটা কানের পাশ থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'বারিষ ধরে এসেছে, এই মওকায় পাহাড় পেরুতে হবে।' বলেই সঙ্গীদের উদ্দেশে জোরে জোরে হাঁকল, 'অ্যাই ছোকরারা—চল চল, জোরসে পা চালা—' সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে সে পাহাড়ের দিকে চলল।

দলটা আগে আগে চলেছে। তাদের পেছনে রয়েছে সেই মেয়েটা। ভরোসালাল এই সুযোগটা ছাড়ল না। মেয়েটার পেছন পেছন সেও চলতে লাগল। বৃষ্টির জোর নতুন করে বাড়াবার আগেই সেও শেরমুণ্ডি পাহাড় পেরিয়ে যেতে চায়।

দিনকয়েক আগে ঠাকুর রঘুনাথ সিং শিকারে যাবে—এই খবরটা পেয়ে হেকমপুর তালুকে ছুটে গিয়েছিল ভরোসালাল। পুরো চারটে দিন রঘুনাথ সিং-এর সঙ্গে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে টিন পিটিয়ে মোট দশটা টাকা আর তিন কিলো মাইলো মজুরি হিসেবে পেয়েছে। সেই টাকাটা তার কোমরে গোঁজা রয়েছে, আর মাইলোগুলো আছে চিত্রবিচিত্র ঝুলিটায়।

হেকমপুরে থাকতে থাকতেই সে খবর পেয়েছিল পূর্ণিয়া টাউনে দু-চার দিনের মধ্যে খ্যাপা কুকুর মারা হবে। তাই রঘুনাথ সিংয়ের শিকার শেষ হতে না হতেই সে বেরিয়ে পড়েছে। শেরমুণ্ডি পাহাড় ডিঙিয়ে ওপারে টাউন ভকিলগঞ্জে আজকের রাতটা কাটাবে ভরোসালাল। তারপর কাল সকালে উঠে চলে যাবে সগরিগলি ঘাটে; সেখানে নদী পেরিয়ে পূর্ণিয়া টাউনের দিকে হাঁটা শুরু করবে।

যাই হোক এই শেরমুণ্ডি পাহাড়টা ভয়ানক রকমের খাড়া। তার সারা গায়ে ঘন অরণ্য। শাল আর মহুয়ার গাছই এখানে বেশি করে চোখে পড়ে। অবশ্য আমলকি, দেবদারু, কেঁদ আর ট্যারা বাঁকা চেহারার অগুনতি সিসম

গাছও চারদিক ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া আছে নানা ধরনের ঝোপঝাড়, সাবুই ঘাস এবং আগাছার জঙ্গল।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পায়ে চলার রাস্তা উঠে গেছে। সেই রাস্তা এই মুহূর্তে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কেননা যদিও এটা একটা পাহাড় তবু হাজার হাজার বছরের ঝড়বৃষ্টিতে পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে এর গায়ের ওপর চামড়ার মতো মাটির একটা স্তর জমেছে। বৃষ্টিতে সেই মাটি গলা মাংসের মতো থকথকে হয়ে গেছে।

খুব সাবধানে পা ফেলে ওরা পাহাড় বাইছিল। বৃষ্টির জোর কমে এলেও অল্প অল্প পড়েই যাচ্ছে। হাওয়ার দাপটও আগের মতো নেই। দু-ধারের ঝোপঝাড় থেকে ঝিঁঝিঁদের একটানা চিৎকার উঠে আসছিল। গাছের মাথায় সরু মোটা—নানা বিচিত্র সুরে পাখিটা একটানা ডেকে যাচ্ছে। কোথায় যেন সাপেদের পেট টেনে টেনে চলার শব্দ হচ্ছে।

সেই মধ্য বয়সী লোকটা মাঝে মাঝেই তার সঙ্গীদের উদ্দেশে হেঁকে উঠছিল, 'জলদি পা চালা। হো রামজী দুফার পার হয়ে গেল।'

চারদিকের নানারকম শব্দ বা মধ্য বয়সী লোকটার হাঁকাহাঁকি শুনেও যেন শুনতে পাচ্ছিল না ভরোসালাল। দুর-মনস্কের মতো খাড়াই পাহাড় ভাঙছিল সে। নেহাত বৃষ্টিটা হঠাৎ এসে গেছে। নইলে তাড়াহুড়ো করে ওপারে যাবার খুব একটা দরকার তার নেই। কারণ আজকের দিনটা তার বিশ্রাম। টাউন ভকিলগঞ্জে একবার পৌছুতে পারলে ধীরেসুস্থে হাত-পা ছড়িয়ে দিনের বাকী অংশটা সে কাটিয়ে দেবে। তারপর কাল থেকে আবার নতুন কাজের ধান্দা শুরু হবে। কিন্তু কালকের কথা কাল।

খানিকক্ষণ পাহাড় বাওয়ার পর হঠাৎ কাতর গোঙানির মতো একটা আওয়াজ কানে আসতে থমকে উঠল ভরোসালাল। সামনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল সেই গর্ভিনী মেয়েটা পাহাড়ে ওঠার ক্লান্তিতে ভয়ানক হাঁপাচ্ছে। তার মুখটা খুলে অনেকখানি হাঁ হয়ে গেছে। তার ফাঁক দিয়ে থেকে থেকে গোঙানিটা বেরিয়ে আসছিল। হাঁপানির দাপটে মেয়েটর বুক তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল। চোখের তারাদুটো মরা মাছের চোখের মতো; মনে হচ্ছিল সে দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

প্রায় টলছিল মেয়েটা। তার মধ্যেই হাতখানেক গভীর থকথকে কাদার ভেতর এলোপাথাড়ি পা ফেলতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু পারছিল না। সে

হয়ত ঘাড় মুখ গুঁজে হুড়মুড় করে পড়েই আছে ; তার আগে পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলল ভরোসালাল। বলল, 'কেয়া তুমহারা তবিয়ত আচ্ছা নেহী ?'

খুব নির্জীব গলায় মেয়েটা উত্তর দিল 'নেহী—'

ভরোসালাল কী বলতে যাচ্ছিল ; হঠাৎ তার চোখে পড়ল সেই মাঝবয়সী লোকটা দামড়া মোষের মতো জোয়ান ছোকরাগুলোকে নিয়ে ঝোপঝাড় ঠেলে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। সে এবার অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আরে তোমার সাথবালারা (সঙ্গীরা) বহোত দূর চলে গেল যে ?

মেয়েটা বলল, আমি ওদের সাথে আসিনি।'

ভয়ানক চমকে উঠল ভরোসালাল, মতলব (মানে) ?

'আমি একেলীই এসেছি।'

'হো রামজী, শরীরের এই হাল নিয়ে তুমি একেলীই বেরিয়ে পড়েছ ?

'কী করব ?'

'কেন, তোমার মরদ কোথায় ?'

মেয়েটা ভরোসালালের প্রকাণ্ড চওড়া বুকের ওপর শরীরের ভার রেখে খানিকটা সামলে নিয়েছিল। এবার সোজা হয়ে হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'সে আসতে পারল না।

ভরোসালাল জিজ্ঞেস করল কেন ?'

'মহাজনের ক্ষেতিবাড়িতে বেগার দিতে গেছে।'

'বেগার ?'

'হাঁ—' মেয়েটা এবার যা বলল সংক্ষেপে এইরকম। চার সাল আগে তাদের দেহাতের মহাজন বিষুণ আহীরের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল তার মরদ। টাকাটা আর শোধ করা যায়নি। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা লোকটার ; তার সিন্দুকে সোনাচাঁদি আর জহরতের পাহাড়। আর জমিজমা ক্ষেতিবাড়ির তো লেখাজোখা নেই। তাদের দেহাতে যেখানে যে জমিতে পা দেওয়া যাক না সেটাই বিষুণ আহীরের। এত জমি এত টাকা-পয়সা থাকলে কী হবে, লোকটা আস্ত কসাই। এই মেয়েটার মরদের সামান্য কটা টাকা উসুল করার জন্য বিষুণ তাকে বছরের পর বছর বেগার খাটিয়ে চলেছে। বছরে দু মাস মেয়েটার মরদকে বিষুণ আহীরের ক্ষেতিবাড়িতে বেগার দিতে হয়। সুদে-আসলে বিষুণের টাকাটা ফুলেফেঁপে এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে যাতে

দশ বছর বেগার দিলেও নাকি ওটা শোধ হবে না। এইরকম যখন অবস্থা তখন মেয়েটির মরদ তার সঙ্গে আসে কি করে?

সব শুনে ভরোসালাল এবার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ঘরে মরদ ছাড় আর কোঈ (কেউ) নেই?

'নহী।'

'হো রামজী—' বলে একটু চুপ করল ভরোসালাল। পরক্ষণে আবার শুরু করল, 'এবার তুমি চলতে পারবে?'

মেয়েটা বলল, 'পারব।'

'বহোত হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলে চল—'

খুব সাবধানে চটচটে আঠালো কাদার ভেতর পা টেনে টেনে দুজনে এগুতে লাগল।

সেই মধ্যবয়সী লোকটা তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে শাল এবং সিসম গাছটাছের ভেতর উধাও হয়ে গেছে। এখন আর তাদের দেখা যাচ্ছে না। ইচ্ছা করলে লম্বা লম্বা পা ফেলে ভরোসালাল পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে যেতে পারে। কিন্তু মেয়েটাকে এ অবস্থায় ফেলে তার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

জঙ্গলের জন্তুজানোয়ার, খ্যাপা কুকুর আর নিজের পেট ছাড়া পৃথিবীর কোন ব্যাপারেই ভরোসালালের আগ্রহ নেই। তবু মেয়েটার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তার অল্পসল্প কৌতূহল হতে লাগল। সে বলল, 'তোমার গাঁও কোথায়?'

মেয়েটি বলল, 'পাঁচ মিল (মাইল) পশ্চিম; নাম ঝুমরিতালিয়া—'

'গাঁও থেকেই এখন আসছ?'

'হাঁ—'

'পাহাড়ের ওপারে কোথায় যাবে?'

'টেউন (টাউন) ভুকিলগঞ্জে—'

'কোন রিস্তার (আত্মীয়) বাড়ি?'

'নহী।'

'তব্ (তবে)?'

একটু চুপ করে থেকে মেয়েটা বলল, 'আমি অসপাতাল (হাসপাতাল) যাচ্ছি।'

'অসপাতাল কেন ?' বলেই ভরোসালালের মনে হল মেয়েটা গর্ভিনী ; নিশ্চয়ই বাচ্চাটাচ্চা হবার ব্যাপারে হাসপাতালে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার বলে উঠল, 'সমঝ গিয়া ; রামজীকা কিরপা—'

মেয়েটা মুখ নিচু করে হাঁটতে লাগল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

এই শেরমুণ্ডি পাহাড়ের গায়ে নির্দিষ্ট কোন রাস্তা নেই। ঝোপঝাড় এবং জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ফাঁকা জায়গা দেখে দেখে খাড়াই বেয়ে ওপরে উঠতে হচ্ছে।

একসময় মেয়েটি জড়ানো গলায় হঠাৎ ডেকে উঠল, 'এ আদমী—'

ভরোসালাল ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, 'কিছু বলবে ?'

'হাঁ। একঠো বাত—'

'বল—'

তক্ষুনি কিছু বলল না মেয়েটা। খানিকক্ষণ বাদে প্রায় মরিয়া হয়েই সে শুরু করল, 'আমি একেলী আওরত (স্ত্রীলোক); তবিয়তের হালও খুব খারাপ। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড় বাইতে ডর লাগছে। তুমি আমাকে একেলী ফেলে রেখে চলে যেও না।'

ভরোসালাল ভাল করে মেয়েটাকে লক্ষ্য করল। তার দুর্বল রক্তহীন শরীর, গর্তে বসে-যাওয়া চোখ চোখের কোলের গাঢ় কালি, পেরেকের মাথার মতো ঠেলে-ওঠা কণ্ঠার হাড়, মাংস ঝরে-যাওয়া লম্বাটে রোগা মুখ শির-বার-করা সিকড়ে সিকড়ে হাত, ন-দশ মাসের বাচ্চা-ওলা স্ফীত পেট বোতামহীন জামার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা টসটসে স্তন, স্তনের বোটার চারপাশে ভুসো কালির ছোপ ইত্যাদি দেখতে দেখতে কেমন যেন মমতা বোধ করতে লাগল সে। বলল, আরে না-না, তোমাকে একলা ফেলে আমি যাচ্ছি না। টেউন ভকিলগঞ্জে আমিও যাচ্ছি। আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমি সেই পর্যন্ত যেতে পারবে।'

মেয়েটির মুখচোখ দেখে মনে হল একটা শক্তসমর্থ সবল পুরুষের ভরসা পেয়ে সে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে।

প্যাঁক ঠেলে ঠেলে দুজনে চলেছে তো চলেছেই। আরো খানিকক্ষণ যাবার পর হঠাৎ ভরোসালাল লক্ষ্য করল মেয়েটার পা ঠিকমতো পড়ছে না ; আবার সে টলতে শুরু করেছে। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে তার। এবারও তাকে ধরে ফেলল ভরোসালাল। জিজ্ঞেস করল, 'কী হল ?'

মেয়েটা কাঁপা দুর্বল গলায় বলল, 'মাথা ঘুরছে।'

'হাঁটতে তখলিফ হচ্ছে?'

'হাঁ।'

'থোড়েশে জিরিয়ে নাও—'

ওখানেই একটা পাথর দেখে বসে পড়ল মেয়েটা। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে উঠতে উঠতে বলল, 'চল—' কিন্তু পা ফেলতে গিয়ে আবার টলতে শুরু করল।

ভরোসালাল চিন্তিতভাবে বলল, 'মালুম হচ্ছে তুমি হেঁটে যেতে পারবে না। পা ফেলতে গেলেই টলছ, মাথায় চক্কর লাগছে। এক কাম করা যাক—'

মেয়েটি নির্জীব গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'তোমাকে আমি ধরে ধরে নিয়ে যাই। তোমার যা হাল, একেলী চলতে গেলে পড়ে গিয়ে বিপদ হয়ে যাবে।'

মেয়েটি আস্তে মাথা হেলাল। অর্থাৎ ভরোসালাল ধরে ধরে নিয়ে গেলে তার আপত্তি নেই। তা হলে সে বেঁচেই যায়।

ভরোসালাল মেয়েটিকে ধরে ফেলল। এক হাতে তার কাঁধ বেড় দিয়ে আস্তে আস্তে আবার ওপরে উঠতে লাগল। খানিকটা যাবার পর সে টের পেল মেয়েটির হাঁটার শক্তি ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছে। আর যত ফুরিয়ে আসছে ততই তার শরীরের সব ভার ভরোসালালের হাতের ওপর এসে পড়ছে। কাদাভর্তি পিছল পথে বাচ্চাসমেত একটি গর্ভিনী মেয়ের গোটা দেহের ওজন একটা হাতের ওপর নিয়ে এগুনো সম্ভব না। ভরোসালাল মেয়েটাকে প্রায় সাপ্টে বুকের ভেতর নিয়ে এল। সেই অবস্থাতেই তাকে নিজের সঙ্গে লেপ্টে নিয়ে পাহাড় ভাঙতে লাগল। আর সমানে বিড় বিড় করতে লাগল, 'হো রামজী, হো রামজী—তেরে কিরপা, তেরে কিরপা—'

এতক্ষণ বৃষ্টির জোর ছিল না; তবে মিহি চিনির দানার মতো সেটা পড়েই যাচ্ছিল, পড়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ আবার তোড়ে নেমে গেল বৃষ্টিটা। হাওয়াটা পড়ে গিয়েছিল। সেটাও বৃষ্টির মতোই আচমকা উন্মাদ হয়ে পাহাড়ী জঙ্গল-এর ভেতর দিয়ে সাঁই সাঁই ঘোড়া ছোটাতে শুরু করে দিল।

এদিকে মেয়েটির দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি শেষ হয়ে গেছে; তার কোমরের তলার দিকটা শরীর থেকে আলগা হয়ে যেন ঝুলে পড়ছে। ভরোসালাল দিশেহারা হয়ে পড়ল। গর্ভিনী মেয়েটাকে সে কথা দিয়েছে, শেরমুণ্ডি পাহাড়

পার করে দেবে। কিন্তু এখন এই অবস্থায় কিভাবে যে তার এবং তার পেটের বাচ্চাটাকে রক্ষা করবে—ভেবে পাচ্ছে না।

কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরেই মনে মনে ভরোসালাল সব স্থির করে ফেলল।

মেয়েটার শরীরের যা হাল তাতে তাকে আর হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তা ছাড়া সেই পিপুলগাছটার মতো ঝাঁকড়া মাথা এমন কোন গাছ নেই যার তলায় গিয়ে কিছুক্ষণ মাথা গোঁজা যেতে পারে। আর বৃষ্টিটা এবার যেভাবে শুরু হয়েছে তাতে আদৌ থামবে কিনা কিংবা থামলে কখন থামবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনিশ্চিতভাবে ভেজার চাইতে এগুবার চেষ্টা করাই ভালো।

ভরোসালাল করল কি, যেখানে কাদা কম এমন একটা জায়গা দেখে মেয়েটাকে শুইয়ে দিল। তারপর বাঁ কাঁধে লাঠির ডগায়-বাঁধা সেই চিত্রবিচিত্র ঝুলিটা নামিয়ে তার ভেতর থেকে দুটো ধুতি বার করে দ্রুত একটা বড় ঝোলা বানিয়ে ফেলল। মেয়েটাকে সেই ঝোলার ভেতর বসিয়ে, তার পাশে মাইলোগুলো রেখে নিজের পিঠে ঝুলিয়ে নিল। তারপর কাদার ভেতর বুড়ো আঙুল গিঁথে গিঁথে খুব সাবধানে পাহাড়ের গা বাইতে লাগল। দায়িত্ব যখন নিয়েছে তখন মেয়েটাকে নিরাপদে পাহাড় পার করে দিতেই হবে।

আকাশ থেকে লক্ষকোটি বৃষ্টির রেখা বল্লমের ফলার মতো ছুটে আসছিল। ঝড়ে চারপাশের অর্জুন-শাল-আমলকি আর সিসম গাছগুলো একেকবার মাটিতে নুয়ে পড়ছে; পরক্ষণেই সটান খাড়া হয়ে যাচ্ছে। ঝোপঝাড় উল্টো-পাল্টা খ্যাপা বাতাসে ছিঁড়ে খুঁড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছিল। আকাশের গায়ে বড় বড় ফাটল ধরিয়ে বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে। ঝড়বৃষ্টির সর্বনাশা চেহারা দেখতে দেখতে ভরোসালাল সমানে বলে যেতে লাগল, 'হো রামজী তেরে কিরপা; হো রামজী তেরে কিরপা'—বলতে বলতে থকথকে আঠালো কাদায় পায়ের আঙুলগুলোকে গজালের মতো গেঁথে গেঁথে সে ওপরে উঠতে লাগল।

পিঠে একটা ভরা গর্ভিনী মেয়ের বাচ্চাসুদ্ধু দেহের সমস্ত ভার চাপানো। যদিও ভরোসালাল হাট্টাকাট্টা দুর্দান্ত শক্তিশালী মরদ তবু তার শিরদাঁড়া যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল; শ্বাস আটকে আটকে আসছিল। তুমুল বৃষ্টি অনরবত চোখেমুখে এমন ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে যাতে সামনের কিছুই দেখতে

পাচ্ছিল না ভরোসালাল। তা ছাড়া দারুণ ঝড়ো হাওয়া তাকে ঠেলে দশ হাত একদিকে নিয়ে যাচ্ছে, পর মুহূর্তেই ধাক্কা মারতে মারতে পনের হাত অন্যদিকে সরিয়ে নিচ্ছে। জলে আর হাওয়ায় তার চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তারই মধ্যেই এই প্রচণ্ড দুর্যোগের বিরুদ্ধে শরীরটাকে ঢালের মতো খাড়া রেখে ভরোসালাল নিশানা ঠিক করে এগিয়ে যেতে লাগল, আর কাতর সুরে একটানা বলে যেতে লাগল, 'হো রামজী তেরে কিরপা, তেরে কিরপা—'

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, শেরমুণ্ডি পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে যখন সে ওপারে গিয়ে নামল তখন বৃষ্টির দাপট থেমে এসেছে। ঝড়টাও আর নেই। আকাশের গায়ে মেঘ ক্রমশঃ পাতলা হয়ে যাচ্ছে। পিঠ থেকে মেয়েটাকে নামিয়ে ভরোসালাল দু-হাঁটুতে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ হাঁপাল; তার শরীরের সব শক্তি তখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ভরোসালালের মনে হচ্ছিল তার শরীরের একটা হাড়ও আর আস্ত নেই; সব ভেঙেচুরে গেছে। শিরা-টিরা-গুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে। ঘাড়ের তলা থেকে অসহ্য একটা যন্ত্রণা শিরদাঁড়া বেয়ে কোমরে, কোমর থেকে পা পর্যন্ত চমক দিয়ে যেন ছুটে যাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ বাদে খানিকটা ধাতস্থ হবার পর হঠাৎ সেই মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল ভরোসালালের। ধড়মড় করে মুখ তুলতেই দেখতে পেল তার সারা গা, শাড়ি-জামা—সব ভিজে সপসপে হয়ে আছে। শরীরের চামড়া আর আঙুলের ডগাগুলো সিঁটিয়ে সাদা হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে যেই তার মুখের দিকে চোখ পড়ল অমনি চমকে উঠল ভরোসালাল। মেয়েটার মুখ অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁচকে যাচ্ছে; ঠোঁট দুটো নীলবর্ণ। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণাটা চাপতে চেষ্টা করছে সে। ভরোসালাল ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মেয়েটার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

নিজের পেটের কাছটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গোঙানির মতো শব্দ করল মেয়েটা, 'এখানে বহোত দর্দ। জলদি আমাকে অসপাতল নিয়ে চল—'

পাহাড়ের তলা থেকে টাউন ভকিলগঞ্জ ঝাড়া পাঁচটি মাইল তফাতে। সেখানে পৌঁছুতে না পারলে হাসপাতালে যাওয়া যাবে না। ভরোসালাল শুধলো তুমি কি হেঁটে যেতে পারবে?'

'নহী। আমার কোমর পেট ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

ভরোসালাল সেটাই আন্দাজ করেছিল। এ অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে একটা পা ফেলাও মেয়েটার পক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে ভরোসালালের শরীরে এমন

শক্তি আর অবশিষ্ট নেই যাতে তাকে পিঠে ঝুলিয়ে আরো পাঁচ মাইল যেতে পারে। মেয়েটাকে পাহাড় পার করাতেই তার জিভ বেরিয়ে গেছে।

অবশ্য এই শেরমুণ্ডি পাহাড়ের তলাতে ছোটখাটো একটা বাজার আছে। বাজার নামেই। চাল-ডাল-নিমক-মরিচের দোকান, একটা দোকান পান-বিড়ি-খৈনি পাতার, তৃতীয় দোকানটি হল চায়ের। ব্যস, এই হল বাজারের নমুনা। তার গা ঘেঁষে একটা আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তা জনারের খেত, গেহুঁর খেত, যবের খেত আর এলোমেলোভাবে ছড়ানো নানা দেহাতের মধ্য দিয়ে টাউন ভকিলগঞ্জের দিকে চলে গেছে। ওই বাজারটার কাছে গেলে শহরে যাবার বয়েল গাড়ি পাওয়া যায়। তক্ষুনি তার খেয়াল হল, গাড়ি ভাড়া করলে কম করে পাঁচটি টাকা লাগবে। ঠাকুর রঘুনাথ সিংহের দেওয়া দশটি টাকা তার ট্যাঁকে গোঁজা আছে। এ-ই তার শেষ সঞ্চয়। ওই টাকা থেকে খরচা করা ঠিক হ'ব কিনা, ভাবতে লাগল ভরোসালাল। আর তখনই তার কানে অস্পষ্ট গোঙানির মতো আওয়াজটা এসে ধাক্কা দিল। ঘাড় ফেরাতেই সে দেখল, পেটের মাংস এক হাতে খিমচে ধরে থেকে থেকে কাতর শব্দ করে উঠছে মেয়েটা।

আর কিছু ভাবার সময় পেল না ভরোসালাল। কেউ যেন আচমকা টান মেরে তাকে তুলে দিল। তারপর এক দৌড়ে বাজারের কাছ থেকে একটা বয়েল গাড়ি নিয়ে এল সে। তারপর পাঁজাকোলে করে মেয়েটাকে ছইয়ের তলায় নিয়ে শুইয়ে দিল। গাড়িওলাকে বলল, 'জলদি টেউন চল ভইয়া; বহোত জলদি—'

গাড়িওলা 'উর্-র্-র্—' বলে একটা শব্দ করে দুটো গরুরই ল্যাজ মুচড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গরু দুটো কাচা রাস্তা দিয়ে দৌড় লাগল।

এদিকে আকাশটা দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। মেঘের গায়ে অল্প অল্প ফাটল ধরিয়ে মরা মরা নির্জীব রোদ বেরিয়ে আসতে চাইছিল। রোদের চেহারা মনে হচ্ছিল, বেলা ফুরিয়ে এসেছে; একটু পরেই সন্ধ্যে নেমে যাবে।

গাড়িতে উঠবার পর থেকে ভরোসালাল কোন দিকে আর তাকায় নি; মেয়েটাকেই শুধু লক্ষ্য করে যাচ্ছে। মেয়েটা কাত হয়ে বুকের কাছে হাত-পা গুটিয়ে অনবরত গুঙিয়ে যাচ্ছিল আর চোয়াল শক্ত করে শ্বাস আটকে যন্ত্রণা চাপবার চেষ্টা করছিল। ভরোসালাল ঝুঁকে খুব নরম গলায় শুধলো, 'এ জেনানা, খুব কষ্ট হচ্ছে?'

মেয়েটা শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে মাথা নাড়ল শুধু; কিছু বলল না।

ভরোসালাল যে কী করবে, কী করলে মেয়েটার কষ্ট একটু কমতে পারে—ভেবে পেল না। সে শুধু শ্বাসরুদ্ধের মতো বিড় বিড় করতে লাগল, 'হো রামজী 'তেরে কিরপা, হো পবনসুত তেরে কিরপা—'

মেয়েটা এবার বলল, 'আমার বহোত ডর লাগছে।'

পরম মমতায় তার একটা হাত ধরে ভরোসালাল বলল, 'ডর কী?'

মেয়েটার যন্ত্রণা যেন হঠাৎ পাঁচ গুণ বেড়ে গেল। শরীরটা ধনুকের মতো বেঁকে যেতে লাগল তার; কপাল-গলা-কণ্ঠা সব ঘামে ভিজে যাচ্ছে। গায়ের লোমগুলো হঠাৎ শীত লাগার মতো খাঁড়া হয়ে উঠেছে। চোখের তারা আস্তে আস্তে স্থির হয়ে যাচ্ছে।

ভরোসালাল অস্থির হয়ে উঠল। এই মেয়েটা পনের মাইল রাস্তা পেরিয়ে মাঝখানে বিশাল পাহাড় ডিঙিয়ে মানুষের জন্ম দিতে চলেছে। মানুষ সম্বন্ধে প্রায় অনভিজ্ঞ ভরোসালাল জানে না কিভাবে তার শুশ্রূষা করবে। ভীতভাবে সে বলল, 'এ জেনানা, তোমাদের এ সময় কী করতে হয়?'

কোমরের কাছটা ধরে মেয়েটা অত্যন্ত দুর্বল স্বরে বলল, 'এখানে একটু সেঁক দিয়ে দাও—'

এই বয়েল গাড়ির ভেতর কোথায় আগুন, কোথায় বা কী? কিন্তু যেভাবেই হোক সেঁকটা দিতেই হবে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে ভরোসালালের চোখে পড়ল গাড়ির ছইয়ের নীচে এক একটা হেরিকেন ঝুলছে; সঙ্গে সঙ্গে সে ঘাড় ফিরিয়ে গাড়িওলাকে বলল, 'ভেইয়া তোমার হেরিকেনে তেল আছে?'

গাড়িওলা বলল, 'আছে, কেন?'

'ওটা একটু জ্বালব। এই জেনানাকে সেঁক দিতে হবে।'

'জ্বালতে পারো, তবে তেলের জন্য চার আনা দিতে হবে।'

'দেব।'

'আর হেরিকেন ভাঙলে তার দাম—'

'দেব।'

'তবে ঠিক আছে।'

'তোমার কাছে অগ্‌ (আগুন) আছে?'

'আছে। গাড়িওলা কোমরের খাঁজ থেকে একটা দেশলাই বার করে ছুঁড়ে দিল।

ভরোসালাল হেরিকেন ধরিয়ে নিল। তারপর নিজের একটা কাপড়ের খানিকটা অংশ চার ভাঁজ করে হেরিকেনটার মাথায় বসিয়ে গরম করতে লাগল। বেশ তেতে উঠলে আস্তে আস্তে মেয়েটার কোমরে সেঁক দিতে লাগল। অনেকক্ষণ সেঁক দেবার পর গোঙাতে গোঙাতে এক সময়ে মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যের অনেক পর বয়েল গাড়িটা টাউন ভকিলগঞ্জের সরকারী হাসপাতালে পৌছে গেল।

কিন্তু এত রাতে ডাক্তার সাহেবকে পাওয়া গেল না। তিনি তাঁর কোয়ার্টারে চলে গেছেন।

যারা ছিল তারা বলল, 'আজ তো হবে না ; কাল নিয়ে এসো।'

ভরোসালালের মাথায় তখন পাহাড় ভেঙে পড়ার অবস্থা। মেয়েটাকে নিয়ে এই রাত্তিরে কোথায় রাখবে সে? সবার কাছে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল 'কিরপা করে জেনানাকে ভর্তি করে নিন।'

হাসপাতালের লোকেরা জানাল ডাক্তারসাব অর্ডার না দিলে কারোকে ভর্তি করা যাবে না। তখন মরিয়া হয়ে ডাক্তারসাবের কোয়ার্টারের ঠিকানা নিয়ে খুঁজে বার করল। তারপর তাঁর হাতে-পায়ে ধরে কিভাবে কত কষ্ট করে গর্ভিনী মেয়েটাকে পাহাড় পার করিয়ে এত দূরে নিয়ে এসেছে তার যাবতীয় বিবরণ দিয়ে বলল, 'এখন আপনার কিরপা ডাগদরসাব (ডাক্তার সাব)।'

সব শুনে ডাক্তার সাব হাসপাতালে এসে মেয়েটাকে ভর্তি করে নিলেন।

এবার ভরোসালালের দায়িত্ব শেষ। গাড়িওলাকে ভাড়া বাবদ পাঁচ টাকা আর তেলের দরুন চার আনা দিয়ে আর রাতের মতো একটা আস্তানার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল ভরোসালাল।

পৃথিবীতে কেউ নেই তার। কাজেই পিছুটানও নেই। সে একেবারে ঝাড়া হাত-পা লোক। যখন যেখানে যায় সেখানে নিজের হাতে খানকতক রুটি সেঁকে নেয়। তারপর কারো বাড়ির দাওয়ায় কিংবা মাঠে ঘাটে গাছতলায় শুয়ে পড়ে।

আজ আর কিছুই ভাল লাগছিল না ভরোসালালের। আটা কিনে এবে

ছানো, উনুন বানাও, কাঠকুটো জোগাড় করো—এত সব ঝঞ্ঝাট একটা দিনের জন্য সে বাদ দিতে চায়। ভরোসালাল করল কি, একটা দোকানে গিয়ে তেঁতুলের আচার আর নুন-লঙ্কা দিয়ে এক দলা ছোলার ছাতু খেয়ে এসে এক বাড়ির খোলা বারান্দায় শুয়ে রইল। কাল সকালে সে সগরিগলি ঘাটে যাবে। সেখান থেকে টাউন পূর্ণিয়া।

পরের দিন সকালে উঠে সগরিগলি ঘাটে যাবার সময় হঠাৎ ভরোসালালের মনে হল, মেয়েটার একটা খবর নিয়ে গেলে হয়। অন্যমনস্কর মতো হাঁটতে হাঁটতে এক সময় সে হাসপাতালেই এসে পড়ল এবং খবর নিয়ে জানলো এখনও মেয়েটার ছেলেপুলে কিছু হয় নি ; তবে যে কোন মুহূর্তে হয়ে যেতে পারে। আর জানলো, মেয়েটা ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে।

শেষ খবরটা পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল ভরোসালালের। পৃথিবীর সব ব্যাপারেই সে উদাসীন। তবু কাল পিঠে চাপিয়ে যাকে পাহাড় পার করিয়েছে, যার জন্য নিজের সঞ্চয় থেকে নগদ সোয়া পাঁচ টাকা খরচও করে ফেলেছে, গরম সেঁক দিয়ে যার সেবা করেছে তার খুব কষ্ট হচ্ছে জেনে আজ আর সগরিগলি যেতে মন করছে না। সে ঠিক করে ফেলল, ভালোয় ভালোয় মেয়েটার বাচ্চা টাচ্চা হয়ে গেলে সে পূর্ণিয়া টাউনে যাবে। গিয়ে হয়ত দেখবে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা খ্যাপা কুকুর মারার জন্য অন্য লোক লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কি আর করা যাবে। হো রামজী, হো পবনসুত।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এদিক-সেদিক খানিক ঘুরে বেড়ান ভরোসালাল। তারপর রুটি বানিয়ে খেয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল। ঘুম থেকে উঠে বিকেলে আবার সে এল হাসপাতালে। কিন্তু কোন খবর নেই। রাতটা কাটিয়ে পরের দিন সকালে আর বিকালে দুবার এল ভরোসালাল। খবর নেই।

দু'দিন কাটাবার পর উদ্বেগে তার দম যখন বন্ধ হয়ে আসছে সেই সময় ডাক্তার সাব হাসতে হাসতে বললেন, 'বহুত বড়িয়া খবর—'

ভরোসালাল বলল, 'হো গিয়া' ! ডাগদর সাব ?'

'রামজীকা কিরপা, পবনসুতকা কিরপা—' ভরোসালালের চোখে আলো ঝিলিক দিয়ে গেল।

'তোমার জেনানার লেড়কা হয়েছে। বহুত গোরা (ফর্সা) লেড়কা—'

চমক লাগল ভরোসালালের। ডাক্তার সাব নিশ্চয়ই মেয়েটা তার আওরত ধরে নিয়েছে। ভুল শুধরে দেবার জন্য তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'ও আমার আওরত না ডগদার সাব।'

'তবে ?' ডাক্তার সাব ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

ভরোসালাল বলল, 'রাস্ত'য় আসতে আসতে জান-পয়চান (আলাপ-পরিচয়) হয়েছিল।'

'তুমি না সেদিন বলেছিলে বারিষের মধ্যে ঝড়ের মধ্যে ওকে ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছ ?'

'হাঁ।'

'ব্যাপারটা কী! জানা নেই শোনা নেই, একটা মেয়েমানুষের জন্যে এত সব করলে!' ডাক্তার সাব এবার রীতিমত অবাক!

ভরোসালাল সারা মুখে পৃথিবীর সব চাইতে নিষ্পাপ পবিত্র হাসিটি হাসল, 'দুনিয়ায় একটা মানুষ আসছে। স্রিফ উসি লিয়ে—'

সে একটা হিংস্র বীটার; একটা নিষ্ঠুর কুকুর-মারা তবু যেন বোঝাতে চাইল পৃথিবীতে একটি মানুষের সন্তান জন্ম নিচ্ছে, তার জন্য সামান্য এই কষ্টটুকু কিছুই নয়।

ডাক্তার সাব কী উত্তর দেবেন, ভেবে পেলেন না। বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলেন।

ভরোসালাল বলল, 'আচ্ছা চলি ডগদার সাব; রাম রাম।' এবার পরম নিশ্চিন্তে সগরিগলি ঘাট পেরিয়ে সে পূর্ণিয়া যেতে পারবে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প



ওরা আসে নিশুতি রাতে। প্রতি অমাবস্যায়।

তখন ঘুটঘুটে অন্ধকারে শুনশান অদৃশ্য। মনে হয় এখানে কেউ বেঁচে নেই, কোনো বাড়ি ঘর নেই। বাতাসে গাছের ডগাগুলো কাঁপে, বাঁশবনে একটা বাঁশের সঙ্গে আর একটা বাঁশের ঘষা লেগে শব্দ হয় কর-র-র কর, কর-র-র কর! লিচু গাছে ঝাঁক বেঁধে এসে বসে বাদুড় দু' একটা প্যাঁচা থ্যারথেরে গলায় ডাকে. পাঁচলা মোড়ের বড় অশথ গাছটায় একটা তক্ষক ঠিক সাতবার তক্‌খো তক্‌খো করে। ঐ তক্ষকটা নাকি সাড়ে তিনশো বছর ধরে বেঁচে আছে।

সেই সময় ওরা আসে। ঝুমঝুম ঝুমঝুম শব্দের সঙ্গে লণ্ঠনের আলোয় কাঁপতে থাকে কয়েকটা ছায়া।

সেই সময় শোনা যায় খকর খক করে কোনো পুরোনো রুগীর কাশির শব্দ, দু'একটা শিশু তেড়ে কেঁদে ওঠে। তখন বোঝা যায়, এই অন্ধকার-ঢাকা নিস্তব্ধ ভূমিতেও মানুষের জীবন বহমান।

দু'একটা জানালা খুলে যায়। দাওয়ায় এসে দাঁড়ায় কয়েকটি ছায়ামূর্তি। আলো ও ঝুমঝুম শব্দ কাছে এগিয়ে আসে। তারা পাঁচলা মোড়ের অশথ-তলায় থাকে।

মোট এগারোজন উঠতি বয়সের ছেলে। তাদের সঙ্গে দুটি লণ্ঠন। দু'জনের হাতে দুটি বর্শা, চারজনের পায়ে ঘুঙুর বাঁধা। লণ্ঠন দুটো মাটিতে রেখে তারা প্রথমে শীত কাটাবার জন্য হাতে হাত ঘষে, শরীরের যেখানে সেখানে ধপাধপ করে চাপড়ে মশা মারে। তারপর তারা সকলে মিলে বিকট মোটা গলায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে :

হে রে রে রে রে রে রে
জাগো রে, গ্রামবাসীগণ জাগো রে।

পুব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারদিকে ফিরে ফিরে তারা চারবার হুঙ্কার দেয়। এরকম। তারপর অন্তরা গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়ালে তার মধ্যিখানে এসে ঘুঙুর পরা চারজন পা ঝুমঝুমোয়। সবাই তালে তালে হাততালি দেয়। হঠাৎ শুরু হয়ে যায় গান :

ভূত কিনিতে এয়েছি ভাই ভূত কিনিতে এয়েছি
ভূতের তেলে ওষুধ হবে স্বপ্ন আদেশ পেয়েছি।
বিপিন খুড়োর নতুন কলে
তুলসীপাতা গঙ্গাজলে
ভূতের কেঠো হাড়ের গুঁড়ো মিশায়ে রস খেয়েছি
ভূত কিনিতে এয়েছি ভায় ভূত কিনতে এয়েছি।

তাদের সেই তারস্বরে গান ও ঘুঙুরের শব্দে অশথগাছের কয়েকটি কাক হঠাৎ ঘুম ভেঙে কা-কা-কা করে ওঠে। দু'তিনটে শেয়াল ছুটে পালায়। কাছেই কোনো বাড়ির দাওয়ায় তামাক টানার মট মট শব্দ শোনা যায়।

ওরা আবার গায় :

ভূতের নাতি ভূতের পুতি বুড়ো হাবরা ছোঁড়াছুঁড়ি
যেমন তেমন ভূত পেলে ভাই হবে না আর ছাড়াছাড়ি।
মামদো ভূত বা ব্রহ্মদৈত্যি
দেখাও যদি তিন সত্যি
দশটি করে টাকা পাবে হাতে হাতে দোকানদারি
সেই টাকায় খাও মণ্ডা মিঠাই করে সবে কাড়াকাড়ি
ভূত জিনিতে, ও ভাই ভূত জিনিতে
ভূত কিনিতে, ও ভাই ভূত কিনিতে
ভূত জিনিতে এয়েছি ভাই ভূত কিনিতে এয়েছি।
ভূতের তেলে ওষুধ হবে স্বপ্ন আদেশ পেয়েছি।
দশ টাকা! দশ টাকা! দশ টাকা!

এক এক ভূত দশ টাকা! হাতে হাতে গরমা গরম! দশ টাকা!

গান শেষ করার পরও নাচ থামতে চায় না। বিশেষত বেঁটে নিতাইয়ের। সে নাচতে ভালবাসে। সুরেন্দ্র তার দিকে একটি বিড়ি এগিয়ে দিয়ে বলে, নে, খা। তখন নিতাই থামে। সুরেন্দ্রর বুকখানা লোহার দরজার মতন। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, হাতে একটা বর্শা। তার চোখে মুখে বেশ একটা

তৃপ্ত ভাব। গানখানি সেই বেঁধেছে, কিন্তু নিজে গাইতে পারে না। অন্যরা যখন গায়, তখন সে হাততালি দেয় চোখ বুঁজে।

আর একটি বর্শা বিনোদের হাতে। সে বর্শাটিকে পতাকা দণ্ডের মতন সামনে ঝুঁকিয়ে ধরে আছে। সেই বর্শার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি জন্তু। জন্তুটা একবার ছটফট করতেই বিনোদ বলে, আরে শালা এখনো তেজ যায়নি।

বর্শাটা ঘুরিয়ে সে জন্তুটাকে একবার মাটিতে আছড়ায়। ঝনঝন করে শব্দ ওঠে।

সকলে বিড়ি ধরিয়ে একটু বিশ্রাম নেয়। এর পরের গান হবে মালো পাড়ায় বটগাছের নীচে।

সুরেন্দ্র রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হাঁক মারে, পবন ঠাউদ্দা, জেগে আছে নাকি?

যে বাড়ির দাওয়া থেকে তামাক টানার মটমট শব্দ আসছে, সেখান থেকে উত্তর আসে, আছি রে! আয়, আয় ইদিকে!

পবনের বয়েস চার কুড়ি, না পাঁচ কুড়ি তা সে নিজেই জানে না। শরীরটা বেঁকে গেছে। সব ক'খানা হাড় পরিষ্কার গোনা যায়। তার পাঁচ ছেলের মধ্যে তিনজন মারা গেছে, দুটি নাতিও গত হয়েছে, কিন্তু পবনের আর যাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই।

সবাই এসে ঐ দাওয়ায় বসে। লণ্ঠন দুটো নামিয়ে রাখে পাশে। যে নেচেছিল, এই শীতের মধ্যেও তাদের গায় চকচক করে ঘাম।

নিতাই জিজ্ঞেস করে, জলের কলসীটা কোথায় ঠাকুদ্দা? বাইরে আছে নাকি?

পবনের ছোট ছেলে নিবারণও উঠে এসেছে চোখ মুছতে মুছতে। সে এক ঘটি জল নিয়ে আসে। নিতাই আলগোছে টাগ্‌রা ভিজিয়ে প্রায় অর্ধেকটা জল শেষ করে দেয়। নিবারণের ছেলেমেয়ে দুটো দরজার পাশ থেকে কুতকুত করে চেয়ে দেখে।

পবন একবার হুঁকোটা পাশে রাখতেই বিনোদ সেটা তুলে নিয়ে টান মারে। তারপরই মুখ বিকৃতি করে বলে, এ রাম রাম! এটা কি ঠাউদ্দা? একি তামাক?

পবন ফোকলা দাঁতে ক্যাকক্যাক করে হাসে। খুব মজা পেয়েছে সে।

নিতাইয়ের পাশে বসা ঘনাই বললো, কেন, কি হয়েছে। দেখি তো ?

ঘনাইও হুঁকোতে টান মারে, সঙ্গে সঙ্গে ওয়াক থু থু করে ওঠে।

পবন হাসতে হাসতে বলে, তোরা পারবি না। একেলে ছেলে তো। আমার সহ্য হয়!

—এ তো তামাক নয়, এটা কী খাচ্ছো তুমি ?

—তামাক পাবো কোথায় ? তামাকের দাম কত জানিস ? আমার ছেলে আমারে তামাক কিনে দেবে ? একটা পয়সা ঠেকায় না।

—তবে কল্কেতে তুমি কী ভরেছো ?

—অনেক কালের তামাক টানা অভ্যেস, না ম'লে যাবে না। তামাক পাই না, তাই শুকনো আমপাতা আর একটুখানি গোবর দিয়ে মশলা তৈরী করেছি। আমার তো বেশ লাগে।

—অ্যাঁ। থুঃ! অভক্তি ?

তামাকের বদলে দুজনকে গোবর খাইয়ে খুব হাসতে থাকে পবন।

নিবারণ তার ঘনাই বাপের উদ্দেশ্যে বলে, মরণকালে বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে একেবারে!

নিতাই আর ঘনাই কয়েকটা চোখাচোখা গালাগাল দেয়। নিবারণের ছেলেমেয়ে দুটি দরজার পাশ থেকে হি হি করে হাসে।

পবন অন্যদের মন্তব্য অগ্রাহ্য করে। কিন্তু ছেলের উদ্দেশ্যে বলে, মরার খোঁটা দিচ্ছিস কেন রে ? আয়ু যখন ফুরোবে, তখন মরবো। তার আগে কথা কী ?

নিবারণ বললো, ফের যদি তোমাকে গোবর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখি—

সুরেন্দ্র মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো, আহা থাক। এই নাও ঠাউদ্দা, একটা বিড়ি খাবে নাকি ?

পবন বিড়িটা খপ করে তুলে নিয়ে বললো, বেঁচে থাক, বাবা। ধনেপুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক। আর একটা বিড়ি দিবি ? কাল সকালে খাবো!

সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করলো, ঠাউদ্দা, ভূত টুতের সন্ধান পেলে না একটাও ? তুমি তো জানতে অনেক ?

পবন বললো, জানতাম তো! দেখিছিও কত। নিজের চোখে দেখিছি ? বাড়ির কাছে, এই পাঁচলা অশথতলায় পেত্নী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখিছি।

একবার পড়েছিলাম মেছোভূতের পাল্লায়। হিজলমারির বিল থেকে মাছ ধরে নে আসছি। অমনি সেই শালার ভূত আমার পেছু নেছে। ছু'কদম যাই আর সে বলে, মাঁছ দেঁ নাঁ—ও পঁবন, মাঁছ দেঁ না—তারপর দেখি একটা না তিনটে ভূত, শেষ-মেষ আমি মাছ ফেলে ফালে দে দৌড়—

—তা একটাও ভুত ধরে দিতে পারলে না?

—এখন তো আর দেখি না। তোদের দেখলি বোধ হয় ভয় পায়। এই তো পরশুদিন সন্ধ্যাবেলা আমি এই দাওয়ায় বসে বসে হুঁকো টানছি, দেখি কি গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে লাল বেনারসী শাড়ী পরা এক বউ পিদিম হাতে নিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে যাচ্ছে। পস্ট দেখলাম। আমি ডাকলাম, ও মা, তুমি কে? কোথায় যাও? তা কোনো সাড়াও দেয় না।

—সে তুমি নিবারণকা'র বউকে দেখেছো।

—হা আমার পোড়া কপাল! আমার ছেলের বউ বেনারসী শাড়ী পাবে কোথায় রে ছোঁড়া! তার একখানাও জ্যান্ত শাড়ী আছে কিনা সন্দেহ। এ দেখলাম এক সোন্দর বউ মানুষ, গা-ভত্তি গয়না।

—দৌড়ে গিয়ে জাপটে ধরলে না কেন?

—আমার কি পায়ে সে জোর আছে? নেবারণও তখন বাড়িতে ছেলো না—আমি তারে দুবার ডাকতে না ডাকতেই চোখের সামনে অদদিরিশ্যি হয়ে গেল। হ্যাঁরে সুরেন, সত্যিই ভূত ধরলে তুই দশ টাকা দিবি?

—নিশ্চয়ই দেবো। পকেটে টাকা নিয়ে ঘুরছি। নগদা নগদি দাম পাবে।

পবন তার ঘোলাটে চোখ মেলে নিজের ছেলের দিকে তাকায়। লোভী-গলায় ঝামটা দিয়ে বলে, একটু বনবাদাড়ে ঘুরলেও তো পারিস। নগদা নগদি দশ টাকা এই বাজারে কে দেয়? একগণ্ডা মানকচুরও দশ টাকা দাম ওঠে না। হাত খালি, বসেই তো আছিস।

নিবারণ বললে, তুমি চুপ করো। ভূত আবার ধরা যায় নাকি? আমি কোনোদিন ভূত দ্যাখলামই না এখন পর্যন্ত!

পবন বিড়বিড় করে বললো, চোখ থাকলেই দেখা যায়। এ গেরামে মোট সতেরোডা সতেরো রকমের ভূত আছে, আমি নিজের চক্ষে দেখিছি। একটা দশ টাকা, কম কথা?

বিনোদের বর্শার সঙ্গে বাঁধা প্রাণীটা আবার নড়ে চড়ে উঠলো।

নিবারণ চমকে উঠে বললো, ওটা কি ?

বিনোদ বললো, ওটা একটা স্যাজা। ওলাইচণ্ডীতলার সামনে রাস্তার ওপর দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল, বর্শা দিয়ে গিঁথে ফেললাম। কড়া জান শালার, এখনো মরে নি !

নিবারণের ছেলে মেয়ে দুটি এবার দৌড়ে দৌড়ে এলো শজারুটাকে দেখতে। বড় বড় কাঁটাগুলো ফুলিয়ে মাটির ওপরে থুবু হয়ে বসে আছে শজারুটা। মেয়েটির পরনে একটা ইজের। ছেলেটি একেবারে ন্যাংটা। নিবারণ ওদের তাড়া দেয়, যা ঘরে যা, যা। মেয়েটির বয়েস তেরো। সে দু'হাত আড়াআড়ি করে রেখেছে বুকের ওপরে। এক পলক শজারুটাকে দেখে নিয়ে সে ভেতরে চলে গেল। ছেলেটা নড়লো না।

নিবারণ জিজ্ঞেস করলো, কী করবি এটাকে নিয়ে ?

বিনোদ বললো, কেটে মাংস খাবো।

—জ্যান্ত রাখতে পারলে বিককিরি করতে পারতি, ভালো দাম পেতি !

—জ্যান্ত স্যাজা ধরা কি সোজা কথা ? কলাগাছের খোল থাকলে হতো। তা তখন পাই কোথায় ? শালা এখনও নড়াচড়া করছে, কিন্তু বেশীক্ষণ আর বাঁচবে না। পেটটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছি।

—শালারা আমার ওঠোনের কচুগাছের তলা খুঁড়ে খেয়ে যায়। কখন আসে টেরও পাই না। এক একদিন শেষ রাতে ঝমঝম শব্দ শুনি, উঠে এসে আর দেখি না !

—ভূত ধরার ঠেঙে স্যাজা ধরা সোজা। তাও পারসি না ?

পবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। শজারুর মাংসের ভারি চমৎকার স্বাদ। লাল লাল মাংস, কত নরম আর তেলে ভরা। ইস্, কতকাল সে মাংসই খায় নি। এখান থেকে বিনোদের বাড়ি প্রায় ক্রোশখানেক দূরে। কাল দুপুর বেলা যদি হেঁটে হেঁটে যাওয়া যায়, গিয়ে বলবো, অ বিনোদ, একটু মাংস চাখতে এলাম ! তাহলে কি আর দেবে না একটু ?

কথায় কথায় বেশ সময় গেল। সুরেন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলো এবার যাওয়া যাক। ঠাউদ্দা, তুমি কাছাকাছি বাড়ির সব লোকদের ডেকে বলো, ভূত খুঁজে দেখুক, এক এক ভূত দশ টাকা—ধরতেও হবে না, দেখিয়ে দিলে আমরাই ধরে নেবো, কিন্তু একেবারে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে হবে।

ভূত কিনে তুই কী করবি রে? সত্যিই ভূতের তেল হয়।

সুরেন্দ্র মুচকি হেসে বললো দেখই না কী হয়। কত লোকের কত রোগ সারিয়ে দেবো।

—তো'র জন্য আমার ভয় হয় রে। শেষে তুই-ও ভূতের হাতে মারা যাবি। ওনাদের রাগ তো জানিস না, কোনদিন বাগে পেলে তোর ঘাড়টা মটকে দেবে।

সুরেন্দ্র হা-হা করে হাসে। কিছুদিন আগে হলেও সে সদর্পে অনেক কথা বলতো। বুক চাপড়ে জানিয়ে দিত, কোনো ভূতের বাপের সাধ্য নাই তার ধারে কাছে আসে। কিন্তু এখন আর সে ওসব কিছু বলে না। ফাদার পেরেরা তাকে নিষেধ করে দিয়েছেন। কথায় শুধু কথা বাড়ে।

পবন আবার বললো, তোর বাপকেও ভূতে ঘাড় মটকেছিল। আমি নিজের চোখে দেখিছি, খাল পাড়ে পড়েছিল মানুষটা, চোখ দুটো ওল্টানো, ভয়ে কালসিঁটে পড়ে গিয়েছিল মুখে।

সে গতকাল আগেকার কথা। ও কথা শুনলে সুরেন্দ্রর আর দুঃখ হয় না। সে বললো, সেইজন্যই তো ভূত ধরার ব্যবসা খুলিছি। বিনোদের মা শাকচুন্নী দেখে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল জলে। নেতাইয়ের বাপকে তাড়া করেছিল আলেয়া ভূত।. বনাইয়ের মামা ভির্মি খেয়েছিল তিনবার। চল্, চল্, উঠে পড় সবাই।

কিন্তু ওরা উঠতে গিয়ে দেখলো, দুটো হ্যারিকেনের মধ্যে একটা নেই।

নিতাই বললো, আরে, আর একটা হ্যারিকেন কোথায় গেল? এই তো রাখলাম এখানে।

পবন বললো, দুটো তো আনিস নি, একটাই তো ছিল।

বিনোদ জোর দিয়ে বললো, এঃ! দুটো হ্যারিকেন এনে রেখেছি আমরা।

—তা হলে যাবে কোথায়? ত্যাখ না, অশত্থতলায় ফেলে এসেছিস কিনা। ভুলও তো হতে পারে।

—মোটেই এত ভুল হয় না। নেতাই একটা হ্যারিকেন এনেছে, আর সুখেন একটা।

নিবারণ মিনমিন করে বললো, তা হলে হ্যারিকেন যাবে কোথায়? চোখের সামনে থেকে তো ভূতে নিয়ে যায়নি!

সুরেন্দ্র বললো, তোমার ছেলেমেয়ে স্নাজা দেখতে এসেছিল। ওদেরই কেউ হাতে বাজিয়ে নিয়ে গেছে।

নিবারণ ঘরের মধ্যটায় উঁকি দিয়ে বললো, কই, ওরা তো নেয়নি, ঘরের মধ্যে অন্ধকার।

নিতাই বললো, ওসব চালাকি করো না নিবারণকা। আমরা ঘরের মধ্যে খুঁজে দেখবো। একি মামদোবাজি?

নিবারণ বললো, ঘরের মধ্যে তোর কাকী শুয়ে আছে, আর তুই ঘরে ঢুকবি? আমাদের চোর ভেবেছিস?

—তা হলে হ্যারকেন গেল কোথায়?

—আমরা হ্যারকেন নিয়ে কি করবো রে শুয়োরব্যাটা? এক ফোঁটা ক্রাচিন কেনার মুরোদ আছে আমার? ঘরে একটা পয়সা নেই। দুদিন চাল কিনিনি।

ছেলেকে সমর্থন করে পবন বললো, পয়সা থাকলে আমি গোবর পুড়িয়ে খাই?

সুরেন্দ্র বললো, তোমার ছেলেমেয়েদের ডাকো নিবারণকা। আমি ওদের জিজ্ঞেস করবো।

গলার আওয়াজ পিতা-উচিত গম্ভীর করে নিবারণ ডাকলো, পান্তি, গেণু, ইদিকে একবার শুনে যা।

মেয়েটি বেরুলো না, এলো ছেলেটি।

সুরেন্দ্রর আগে নিবারণই জিজ্ঞেস করলো, হ্যারকেন নিয়েছিস? ছেলে দু'দিকে মাথা নেড়ে শুকনো গলায় বললো, আমি নিইনি। সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করলো, এই গেনু, তোর দিদি কোথায়? গেনু বাড়ির পেছনের অন্ধকারের দিকে হাত দেখিয়ে উত্তর দিল, ঐ সেথায় গেছে।

—কেন, ঐদিকে গেছে কেন?

—মা'র সঙ্গে গেছে।

নিতাই ঠাট্টার সুরে বললো, নিবারণকা, তোমার বউ-মেয়েতে মিলে ভূত খুঁজতে গেছে নাকি?

পবন ধমক দিয়ে বললো, অমন অনাছিষ্টি কথা কবিনে নেতাই! পোয়াতী বউ রাত বিরেতে যাবে ভূতের সন্ধানে? আঁটকুড়ি পেত্নীর নজর লাগলে পেটের ছেলে পেটেই মরে থাকবে। বাহিখানার ওধারে আমি কতদিন পেত্নী দেখেছি!

নিতাই ঝংকার দিয়ে বললো, তাহলে তোমার পুতের বউ রাত-বিরেতে ওদিকে যায় কেন ?

নিবারণ বললো. তোর কাকীর উদুরী অসুখ আছে।

—তা আমাদের হ্যারকেন নিয়ে গেছে, বলে গেলেই পারতো।

—কে তোদের হ্যারকেন নেছে ? নিলে আমরা দেখতে পেতাম না ?

—আরে, এ তো মহাজ্বালা ! আমাদের হ্যারকেন কি শূন্তে উড়ে গেল ?

সুরেন্দ্র বললো, চল, ওদিকে গিয়ে দেখে আসি।

পবন কিংবা নিবারণ নড়লো না। অন্তরা দল বেঁধে গেল বাড়ির পেছনের অন্ধকারের দিকে।

খানিকটা দূরেই একটা আমলকি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে পান্তি। এই শীতের মধ্যেও তার কোমরে ইজের আর খালি গা। কিশোরী মেয়ের বুকে যে জিনিস শব্দ করে তার যৌবনের আগমন জানান দেয়, সে সেখানে তার দু'হাত চাপা দিয়ে আছে।

ওদের দেখেই সে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, ইদিকে আসবেন নে, ইদিকে আসবেন নে !

কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলো। সেদিকে একপলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সুরেন্দ্র বললো, হ্যারকেনটা জিজ্ঞেস করে আনিস নি কেন ? 'আমরা পাঁচলা মোড়ে দাঁড়াচ্ছি, কাজ হয়ে গেলে দিয়ে যাবি।

নিতাই রসিকতা করে বললো. আর ওদিকে পেত্নী টেত্নী দেখলে আমাদের চেঁচিয়ে ডাকিস, কপাৎ করে গিয়ে ধরে নে আসবো ! দশ টাকা পাবি !

ঘরে দাওয়ায় বসে পবন বললো, খাল ধারে চৌধুরী বাড়ির বাবু একবার একটা ভূত ধরিছিলেন, জীয়ন্ত কঙ্কাল। কত ঝটাপটি করিছিল, কিন্তু কর্তাবাবু দড়ি দিয়ে বেঁধে ফ্যাললেন। আহা, আমাদের ভাগ্যে ওরকম হয় না। নগদ দশ টাকা, সাতসের চাল খরেদ করা যায়।

গেন্থ জিজ্ঞেস করলো, দাদু, তুমি সত্যি ভূত দেখেছো ?

পবন বললো, হ্যাঁরে দাদু কতবার ?

—আমাকে একবার দেখাবে ? দূর থেকে একবারটি দেখবো !

—দেখবি, ভাগ্যে থাকলে ঠিকই দেখবি। তবে না দেখাই ভালো।

দূরের দলটার দিকে তাকিয়ে নিবারণ বললো, শালাদের বড় টাকার গরমই হয়েছে।

একটু পরে ঘুঙুরের ঝুমুঝুমু শব্দ তুলে ওরা আবার চলে গেল দূরে। হ্যারিকেনের আলোও মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অমাবস্যার রাত্রির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়িটা।

সুরেন্দ্রকে নিয়ে গ্রামের লোক খুব ধন্দে পড়েছে। বেশ কিছুদিন সবাই ভুলেই ছিল ওর কথা। ওর বাপ মারা যাবার পর ওদের বংশটাই মরে হেজে যেতে বসেছিল। ওর যখন বারো তেরো বছর বয়েস, তখন চৌধুরীবাবুদের বাড়িতে রাখালি করতো। একদিন মেজোবাবুর চটি জোড়া পড়েছিল বৈঠকখানার সিঁড়িতে, ও ছোঁড়াটা সেটা হাত দিয়ে না সরিয়ে পা দিয়ে সরাতে গিয়েছিল অমনি চোখে পড়ে গেল মেজোবাবুর। প্রচণ্ড ঠ্যাঙানি খেয়ে ধুঁকতে লাগলো উঠোনে পড়ে। ছোঁড়ার নাকি চুরি টুরি হাত-টানও হয়েছিল। ঠ্যাঙানি খাবার দিন বিকেলবেলা ছোঁড়াটা গ্রাম ছেড়ে পালালো। তারপর শোনা গিয়েছিল ছোড়াটা শহরে গিয়ে সাইকেলের দোকানে পাম্প দেয়। তারপর কেউ ওর খোঁজ রাখেনি।

সে এখন আবার ফিরে এসেছে মস্তো জোয়ান মদ্দ হয়ে। কোন্ ফেকটরিতে নাকি কাজ করে, গায় রঙীন রঙীন জামা, হাতে ঘড়ি। বিড়ির বদলে সিগ্রেটই বেশী খায়। একদিন চৌধুরীবাবুদের বাড়ির সামনে গিয়ে থুক করে থুতু ফেললে। একবার না, তিনবার।

ও-বাড়িতে অবশ্য কর্ত্তাবাবুরা কেউ থাকেন না এখন। এক গোমস্তা শুধু টিমটিম করছে। গোমস্তাবাবু বুড়ো মানুষ, তিনি আর কী করবেন, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখলেন শুধু। পাইক বরকন্দাজ তো নেই আর একটাও। এখন সম্বৎসরের ধানই ওঠে না।

গ্রামে কতকগুলান চ্যালা চামুণ্ডা জুটেছে সুরেন্দ্রর। ফি-হপ্তায় শনি-রবিবার সে বাড়ি আসে। নিজেদের পোড়ো ভিটের আবার ঘর তুলেছে, সেখানে চ্যালাগুলাকে নিয়ে হল্লোট করে। খাওয়া দাওয়া ভালই জোটে কিনা ওখানে। গত মাসে ওরা পুবপাড়ার বহুকালের মজা দীঘিটা সাফ করতে গিয়েছিল। সাফ হয়েছে না ঘেঁচু হয়েছে, শুধু জলে নেমে দাপাদাপি। সবাই জানে ঐ দীঘিতে যখ্ আছে, প্রতি বছর একজন করে মানুষ টেনে

নেয়। ওদের দলেরও একজন মরতে বসেছিল। মাঝ পুকুরে ডুবিয়ে মাটি তুলতে গিয়ে আর দম পায় নি। হাঁক-পাঁক করতে করতে যখন উঠলো, তখন মুখখানা নীল হয়ে গেছে। তবু ওদের আক্কেল হয়নি, আবার হপ্তায় নামবে।

আর এক ঢং হয়েছে, অমাবস্যার রাত্তিরে দল বেঁধে কেত্তন গাইতে গাইতে ঘোরা। গাঁয়ের অকর্মা ছোঁড়াগুলো এই এক কাজ পেয়েছে। সুরেন্দ্র নিশ্চয় ওদের নেশাভাঙের খরচাপাতি দেয়। কয়েকজনকে নাকি শহরের ফেকটরিতে চাকরিও জুটিয়ে দেবে বলেছে। সেটাই বড় টোপ।

ভূত কেনায় অছিলায় সুরেন্দ্র কী বলতে চায়, তা অনেকেই বুঝেছে। সবাই তো আর ঘাসে মুখ দিয়ে থাকে না। কিন্তু এতকাল এতলোক যা নিজের চক্ষে দেখেছে, তা মিথ্যে হয়ে যাবে? আর ভূতগুলোও হয়েছে মহা ফেরববাজ, সুরেন্দ্রর দল দেখলে কিছুতেই সামনে আসে না। ভূতেরাও ওকে ভয় পায়? যা ষণ্ডামার্কা চেহারা, ভূতের বাবাও ওকে ভয় পাবে।

দিন দিন তেজ বাড়ছে সুরেন্দ্রর। ক্রমাগতই রেট বাড়াচ্ছে সে। আগে ছিল দশ টাকা, তারপর বিশ, তারপর পঞ্চাশ, এখন একেবারে একশো টাকায় তুলেছে। এক ভূত ধরায়ে দিলে একশো টাকা। ধরাতেও হবে না, দূর থেকে দেখায়ে দিলেই হবে, আর দু'জন সাক্ষী রেখে দেখালেই হবে। একশো টাকা শুনলেই মাথার রক্ত ছনছন করে। এ বাজারে একশো টাকা কে দেয়? মানুষের জীবনেরই দাম নাই, আর একখানা ভূতের দাম একশো টাকা। শালাকে ভূতে ঘাড় মটকায় না কেন? নাকি ভূতেরাই নিজেদের দাম চড়াচ্ছে আর আড়ালে বসে মিটিমিটি হাসছে।

সুরেন্দ্র নাকি প্রথম প্রথম গাঁয়ে এসে নিতাইদের বলেছিল, মানুষের আত্মা বলে কিছু নাই। কথাটা শুনলেই গা ছমছম করে। মানুষের আত্মা নাই? তাহলে কোথা থেকে আসা আর কোথায় যাওয়া? এ-জন্মে দুঃখ কষ্ট সহ্য করলেও পরকালে সুখের আশা থাকে। আত্মাই যদি না থাকে, তা হলে আর পরকাল কী? হারামজাদা! এসব কথা যে বলে, মেরে তার মুখ ভেঙে দিতে হয়! প্রথমটা শুনেই মনে হয়েছিল, সুরেন্দ্র নিশ্চয়ই কেরেস্তান হয়েছে। তাহলে শালাকে একঘরে করার কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু কেরেস্তান তো নয়, গত বছর যে ও ধুমধাম করে দুগ্‌গোপুজো করলে।

দুগ্‌গোপুজো নিয়ে গত বছর একটা কাণ্ডই হয়েছিল। এ-গাঁয়ে এক-

খানাই দুগ্‌গোপুজো হয়, চৌধুরীবাবুদের বারবাড়িতে। চিরকাল যেমন হয়ে আসছে। গত পাঁচ সাত বছর ধরে বাবুরা কেউ গাঁয়ে আসেন না। জমিদারি লাটে উঠেছে, আয়পত্তর কিছু নেই, তাহলে আর আসবেন কেন? শুধু আছে ঐ এক পেল্লায় ভাঙা বাড়ি। বাবুরা আর পুজোর খরচাও দেন না। কিন্তু মায়ের পুজো তো আর বন্ধ হতে পারে না। তাই গাঁয়ের পাঁচজনা মিলে ভাগাভাগি করে খরচাপত্তর দিয়ে পুজোটা সারা হয় নমো নমো করে।

গত বছর সুরেন্দ্র আর তার দলবল বললে, গাঁয়ের লোকের পয়সাতেই যদি পুজো হয়, তো সে পুজো হবে গাঁয়ের মাঝখানে চালা বেঁধে। জমিদারদের বাড়িতে হবে কেন? যে জমিদারের কানাকড়ির মুরোদ নেই, সে কেন শুধু শুধু পুণ্যি লুটবে?…ব্যাটার এখনো রাগ আছে চৌধুরীদের ওপরে। যে বাড়িতে বরাবর দুগ্‌গোৎসব হয়, হঠাৎ একবার বন্ধ হয়ে গেলে, সে বাড়ির ওপর মায়ের অভিশাপ নেমে আসে। সে কথা সুরেন্দ্র জানে। আরে ব্যাটা, জমিদারবাবুরা এখন তো মরমে মরেই আছে, তুই আর এখন কতটা মারবি! অমন দুর্দান্ত ছিলেন মেজোবাবু তাঁর ছোটছেলে এখন জেল খাটছে। কলেজে পড়ার সময় মার-দাঙ্গা করতে গিয়েছিল। মেজোবাবুর আর এক ছেলে রেলের গার্ড। হে-হে-হে-হে!

শেষ পর্যন্ত সুরেন্দ্র প্রাইমারি স্কুলের মাঠে দুগ্‌গোপুজো, করিয়ে ছাড়লে। শহর থেকে চাঁদার বই ছাপিয়ে এনে পয়সা তুললে সব ঘর থেকে। দুগ্‌গো-পুজোর ঠিক আগেই ধান ওঠে, লোকের হাতে দু-পাঁচটা পয়সা থাকে। গাঁয়ের যে পাঁচটা ভদ্দরলোক আগের বছর পুজোর সময় সদ্দারি করতেন, তেনারাও ওদের সঙ্গে কোনো তক্কো-ঝঞ্ঝাটে গেলেন না। যে-বাবুরা আগের বছর চাঁদা দিতেন পঁচিশ টাকা, তাঁরা দিলেন পাঁচ টাকা। সুরেন্দ্রর চেলারাই মাঠে মাঝখানে ছাউনি বেঁধে মাকে নিয়ে এলো।

অষ্টমী পুজোর দিন মাঝরাতে সুরেন্দ্রর সে কি নাচ! ক'বোতল মাল টেনেছিল কে জানে! চোখ দুটো জবাফুলের মতন লাল, মাথায় ঝাকড়া ঝাকড়া চুল, মোষের মতন চেহারা, ব্যাটাকে দেখাচ্ছিল নন্দী-ভৃঙ্গীর মতন। দু'হাতে দুটো ধুনুচি নিয়ে নাচতে নাচতে সে কি মা মা বলে চেল্লানি! নেশার ঝোঁকে পায়ের ঠিক নেই, এক একবার ঢলে পড়েছে, ধুনুচিতে গনগনে আগুন, একবার তো সবসুদ্ধু হুমড়ি খেয়ে পড়লো। আগুন লেগে

যে ওর চোখ দুটো কানা হয়নি, সে ওর সাত পুরুষের ভাগ্যি। পড়লো তো আর ওঠেই না। ওর সাকরেদরা ওর নাম ধরে ডাকাডাকি করে, হাত ধরে টানাটানি করে, তবু কোনো সাড়া নেই। অতবড় লাশকে টেনে তোলে কার সাধ্যি। শেষ পর্যন্ত নেতাই যখন এক কলসী জল এনে ওর মাথায় ঢেলে দিতে যাবে, সেই সময় নিজেই লাফিয়ে উঠে হো-হো করে হাসতে লাগলো। ঢং! এতক্ষণ ঢং করছিল। যত সব নেশাখোরের কাণ্ড।

মেজবাবুর যে ছেলে এখন জেল খাটছে, গত বছর পুজোর ঠিক পর-পরই সে এসেছিল একবার গাঁয়ে। সঙ্গে দুই বন্ধু। আগে বাবুরা আসতেন মটোরগাড়িতে, এ ছেলে এলো মোটর সাইকেলে। তা ভালোই করেছে, মোটর সাইকেলে বেশ একখানা জমিদার জমিদার শব্দ আছে। অতবড় চৌধুরীবাড়ির দু'তিনখানা ঘরও এখন আস্তো আছে কিনা সন্দেহ। উঠলো সেখানেই। বুড়ো গোমস্তাবাবু নিশ্চয় ছোটবাবুর কাছে সব লাগানি ভাঙানি দিয়েছে। পরদিন পাঁচুমুদির দোকানে ছোটবাবু নিজে এসে জিজ্ঞেস করলো, বলতে পারো সুরেন কোথায় থাকে?

পাঁচুমুদি সাবধানে বললো, কোন্ সুরেন?

ছোটবাবু বললো, যে এবার গাঁয়ে বারোয়ারি পুজো করিয়েছে! সে নাকি আবার ভূত ধরার দলও গড়েছে?

পাঁচুমুদি বললো, তার বাড়ি তো পাঁচলা মোড় ছাড়িয়ে আরও এক মাইল, গাঁয়ের একেবারে কিনারে। কিন্তু রোজ তো সে গাঁয়ে থাকে না।

কিন্তু সেদিন রবিবার, সুরেন্দ্র ঠিকই থাকবে!

সবাই ভাবলো, এবার সুরেন্দ্রর সঙ্গে লাগবে ছোটবাবুর। অবস্থা পড়ে গেছে, তবু তো জমিদারি রক্ত শরীরে, ফুটফুটে সুন্দর চেহারা। এরকম চেহারার মানুষ আজকাল গাঁ দেশে একদম দেখাই যায় না। যখন জমিদারি ছিল, তখন দু'চারজন অন্তত ছিল। এখন সব শহরে।

আগেকার দিন তো নেই যে ছোটবাবু পাইক পাঠিয়ে সুরেন্দ্রকে ধরে এনে জুতো পেটা করবে! বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে নিজেই মোটর সাইকেলে চলে গেল ফটফটিয়ে। তারপর সুরেন্দ্রর সঙ্গে তার যে কী কথা হলো, তা কেউ জানে না। তবে খানিকবাদে দেখা গেল, ছোটবাবু আর তার বন্ধুরা হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে সুরেন্দ্রর ঘর থেকে। কী একটা কথার পর ছোটবাবু সুরেন্দ্রর কাঁধ চাপড়ে দিতে চায়, কিন্তু সুরেন্দ্র অত্যধিক লম্বা বলে.

ছোটবাবুর হাত ঠিক মতন পৌঁছোয় না। বরং ছোটবাবু পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বার করতেই কিছু জিজ্ঞেস না করে সুরেন্দ্র তার থেকে একটা তুলে নিল। একেই বলে কলিকাল! দূর থেকে নিবারণ এটা নিজের চোখে দেখেছে।

কোনো কারণ না থাকলেও ছোটবাবুর প্যাকেট থেকে সুরেন্দ্রর ঐ সিগ্রেট তুলে নেওয়া দেখে নিবারণের মনে পড়েছিল সুরেন্দ্রর সেই কথা, 'মানুষের আত্মা নাই। ওঃ ভাবলেই যাতনা হয়। অবশ্য সুরেন্দ্র পরে একথা স্বীকার করতে চায়নি। যোগেন মাস্টার জিজ্ঞেস করেছিল।

পাশাপশি দু' গাঁয়ের মাঝখানে একটা ইস্কুল। সেই ইস্কুল সরকারী নতুন মাস্টাররা আসে আর দু'এক বছর বাদেই চলে যায়। আবার অন্য মাস্টার আসে। শুধু থেকে গেল যোগেন মাস্টার। যোগেন মাস্টার বিকেলের দিকে নদীর ধারে একা-একা বসে থেকে সূর্য ডোবা দেখে। ভাবুক মানুষ।

সেই যোগেন মাস্টার হাটবারে একদঙ্গল লোকের মাঝখানে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হ্যাঁ গো সুরেন, তুমি নাকি বলেছো, মানুষের আত্মা নেই?

সুরেন্দ্র কখনো পড়েনি যোগেন মাস্টারের কাছে। সে বিড়ি লুকোয় না। কিন্তু চ্যাটাং চ্যাটাং কথাও বললো না। ঘাড় চুলকে জবাব দিল, সে তো আপনারাই ভালো জানেন। আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমি কি অত বুঝি? আমি কখনো আত্মা দেখি নাই।

যোগেন মাস্টার গোঁফ-এঁটো-করা হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, আরে পাগল, এই যে বাতাসে আমরা নিশ্বাস নিই, সে বাতাস আমরা চোখে দেখতে পাই? তার মানে কি বাতাস নেই?

যারা শুনছিল, তারা মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, জব্দ করেছে বটে যোগেন মাস্টার। এবার বল ব্যাটা, বাতাস নাই!

সুরেন্দ্র বললো, বাতাস চোখে দেখা যায় না, কিন্তু হাতে ধরা যায়।

যোগেন মাস্টার বললো, বাতাস ধরা যায়? বলো কি হে? কেউ কখনো তা পেরেছে? বুকের মধ্যে একটুখানি বাতাস ধরে রাখো, অমনি প্রাণ-পাখী ছটফট করে উঠবে। কী উঠবে না? তোমরা কী বলো?

সকলে মাথা নাড়লো।

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল একটা বেলুনওয়ালা। সুরেন্দ্র একটা নেতানো

বেলুন খপাৎ করে তুলে নিয়ে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে সেটাকে লাউ করে ফেললো। তারপর সেটার ঠুটো চেপে ধরে হাত উঁচিয়ে বললো, এই ছাখেন মাস্টার মশাই, বাতাস ধরলাম। আপনি বুঝিয়ে ছান তো, আত্মাকে ধরা যায় এই ভাবে? আপনি বুঝিয়ে দিলেই আমি মেনে নেবো।

মাস্টার বললো, আত্মাকে ধরবে? ও চিন্তাও করো না বাপ! উনি কখনো ধরা ছোঁওয়া দেন না। নৈনং ছিন্দ্রন্তি অং বং চং। তার মানে হলো গে, আত্মাকে কখনো ছ্যাঁদা করা যায় না, তাঁকে আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ডোবানো যায় না। আত্মা অজর অমর।

সুরেন্দ্র বললো, মানুষ মরে গেলে যখন তাকে পোড়ানো হয়, তখন কি ফুস করে আত্মাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়? কোথায় যায়?

মাস্টার বললো, তখন তা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যায়। পরমাত্মা হলেন ঈশ্বর।

সুরেন্দ্র বললো, অ।

মাস্টার বললো, কি, কথাটা পছন্দ হলো না? তুমি মানলে না?

সুরেন্দ্র বললো, মানবো না কেন? আপনার মতন পড়া-লেখা জানা লোক যখন বলছেন, তখন কি আর ভুল বলবেন?

যোগেন মাস্টারের জয়ে সবাই বেশ খুশী হয়ে অবাকও হয় খানিকটা। সকলেই ভেবেছিল, সুরেন্দ্র ফাটাফাটি তর্কো করবে মাস্টারের সঙ্গে। বেলুনটা ফুলিয়ে সে বে·. ·টা তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। তারপর সে এত সহজে মেনে নিল লক্ষ্মী ছেলের মতন?

যোগেন মাস্টার বেশ পরিতৃপ্ত হয়ে সুরেন্দ্রর গা চাপড়ে দিলেন। যেন সে একটি বেশ ভালো ছাত্তর। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুই নাকি ভূত ধরার ব্যবসা খুলেছিস?

সুরেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। শহরের এক বাবু আমাকে অর্ডার দেছেন। একটা ভূত যোগান দিলেই আড়াই শো টাকা পাবো। আমি কিনবো একশো টাকায়। আমার মোটা লাভ। এই ছ্যাখেন না, এই হাট থেকে ব্যাপারীরা প্যাজ কিনে নে যাচ্ছে সাতাশ টাকা মণ দরে। শহরে পাইকারি রেটে ছাড়বে পঁয়তিরিশ টাকায়। আমি তেমনি চালানি ব্যবসা ধরেছি।

—পেয়েছো একটাও।

—না।

—হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ! একি ছেলেখেলা? ভূতের ব্যবসার কথা বাপের জন্মে শুনিনি। এসব কথা মন থেকে বাদ দাও। এ বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস, কখন কী হয়ে যায়, বলা যায় না।

সুরেন্দ্র আবার একটা বিড়ি ধরিয়ে বললো, আপনার বাড়িতে একদিন যাবো মাস্টারমশাই। হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে সব কথা হয় না। আপনি জানেন, আমার বাবাকে ভূতে গলা টিপে মেরেছিল।

মাস্টার বললো, হ্যাঁ শুনেছি।

সুরেন্দ্র বললো, আমার বাবার ট্যাঁকে সেদিন ধান-বেচা টাকা ছিল। তার এক আধলাও পাওয়া যায়নি। কে নিল সেই টাকা, আত্মা না পরমাত্মা? কার বেশীর টাকার দরকার? আপনার ঠেঙে জেনে আসবো। গাঁয়ের একটা লোকও সেদিন সাক্ষী দেয়নি।

পুরোনো খালটা মজে হেজে গেছে। সরকার থেকে সেই খালটা নতুন করে কাটাচ্ছে এবার। পাশের গাঁয়ের রহমান সাহেব সেই খাল কাটার ইজারা নিয়েছেন। এ-খাল দিয়ে আবার জল বইলে এ-তল্লাটে চাষের সুবিধে হবে। এই কথাটা ভেবে নিবারণ নিজেকে নিজে ভ্যাঙচায়।

আড়াই বিঘে জমি ছিল, গত ফাগুনে তা বন্ধক রাখতে হয়েছে। না রেখে উপায় ছিল না, নিবারণ নিজেই বড় শক্ত অসুখে পড়েছিল। যদি তার ছেলে, মেয়ে, বউ বা বাপের অসুখ হতো, সে জমি বন্ধক দিত না কিছুতেই, কিন্তু সে নিজে তাদের সংসারে একমাত্র রোজগেরে পুরুষ, সে মরে গেলে আর সকলকে বাঁচাতো কে? তার বাপ তো তিনকেলে বুড়ো। কুটোটি নাড়বার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। তবু এখনো রাক্কুসে খিদে আছে। মরেও না কিছুতে। তার অন্য ভাইরা কেউ বাপকে নেয়নি নিজেদের সংসারে। শুধু নিবারণেরই যত জ্বালা।

মহাজনকে সে বলে রেখেছে, ভাগ চাষের স্বত্ব তারই থাকবে। নিজের জমিতেই সে ভাগচাষী হবে। ধান উঠে গেলে ঐ জমিতেই সে ফুলকপি বসাবে।

সরকার বাহাদুর খাল কাটাচ্ছেন! আর দু'বছর আগে কাটাতে পারেন নি, যখন জমিটুকুন নিবারণের নিজেরই ছিল? এখন ভাগচাষ করে সে সংসারের পেট ভরাবে, না বন্ধকী দেনা শুধবে?

দৈনিক পঞ্চাশ জন লোক লাগে খাল কাটার জন্য। সারা গাঁয়ের লোক

গিয়ে হামলে পড়েছিল। কারুর হাতে এখন কাজ নেই। নিবারণরা বংশ পেশায় ঘরামী। এখন কাজ জোটে না। এক কাহন খড়ের দাম চব্বিশ টাকা। যাদের হাতে দু'পয়সা আছে, তারা টালি দিয়ে চাল ছাইছে সেজন্য শহর থেকে মিস্তিরি আসে।

রহমান সাহেব নিজের গাঁ সোনামুড়ি থেকেই মাটি কাটার জন্য নিয়েছিলেন পঞ্চাশজন। সেই নিয়ে পরশুদিন খুব হাল্লা হয়ে গেল। খালটা দু, গাঁয়ের মাঝখানে, তা হলে শুধু এক গাঁয়ের লোক কাজ পাবে কেন? এ-গাঁয়ে কাজের মানুষ নেই?

রহমান সাহেব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। সব শুনেটুনে উনি ঠিক করে দিয়েছেন, প্রতিদিন এ-গাঁ থেকে পঁচিশজন, ও-গাঁ থেকে পঁচিশজন কাজ পাবে। এক লোক পরপর দু'দিন কাজ পাবে না। সাড়ে চার টাকা রোজ, আর একবেলা খোরাকি।

নিবারণ গতকাল কাজ পেয়েছিল; আজ পাবে না। ঘরামীর ছেলে শেষ পর্যন্ত মাটি কাটা কুলি। আজকাল অত কিছু ভাবলে চলে না। ভাত এমন চীজ, খোদার সঙ্গে উনিশ বিশ।

আজ তার কাজ নেই, তবু নিবারণ খালধারের দিকে যাচ্ছে। অন্য কোনো কাজও তো নেই এখন, তবু ওসব দেখতে ভালো লাগে।

যেতে যেতে তার. বারবার মনে পড়ছে সুরেন্দ্রর কথা। সুরেন্দ্রকে সে কিছুতেই পছন্দ করতে পারছে না। সুরেন্দ্রর স্বাস্থ্য ভালো,, পকেটে পয়সা ঝমঝমিয়ে বেড়ায়। এসব মানুষ একবার গ্রাম ছেড়ে শহরে গেলে আর ফেরে না। সুরেন্দ্র ফিরলো কেন? আবার বিদায় হলেই তো পারে। পকেটে তার শয়ে শয়ে টাকা, কিন্তু এমনি তো সে কাউকে দেবে না। ভূত কেনার বায়না! নিবারণের গা জ্বালা করে। একশোটা টাকা পেলে তার এখন কতদিকে সুরাহা হতো। সেই টাকা একজনের পকেটে আছে, অথচ সে পাবে না। এই পৃথিবীতে কারুর থাকে প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশী, আর কেউ প্রয়োজনটুকুও মেটাতে পারে না, এটাই বুঝি ভাগ্যের নিয়ম! কতজনে কত ভূত দেখে, তার ভাগ্যে জোটে না একটাও! সন্ধ্যের পর সে এদিক ওদিক তাকিয়ে খোঁজে, চমকে দু'একবার, তারপর ভালো করে চোখ কচলে দেখে। না, একটা কলাগাছ, কিংবা বেল গাছ। দূর, দূর! তখন আরও রাগ হয় সুরেন্দ্রর ওপর।

খালপাড়ের উঁচু বাঁধটার ওপরে এসে দাঁড়ায় নিবারণ। বুক চিতিয়ে নিশ্বাস নেয়। খালি পেটে বেশী হাওয়া খেলে পেট ঘুলিয়ে ওঠে। মন খারাপ লাগে। পঞ্চাশটা লোক একসঙ্গে মাটি কাটছে, ওরা যেন সবাই আলাদা, নিবারণ ওদের কেউ নয়। আর খানিকবাদেই ওরা নগদ সাড়ে চারটা টাকা পাবে, নিবারণ পাবে না। ক'দিন ধরেই তার বউটা পেট ব্যথায় কাতরাচ্ছে। রাত্তিরবেলা ঘুঙিয়ে ঘুঙিয়ে কাঁদে। এই সময় ওর একটু ভালো-মন্দ খাওয়ার দরকার। একটু দুধ পেলে শরীরের পুষ্টি হতো, পেটের বাচ্চাটা···। কিন্তু দুধ······কতদিন আগে পয়সা দিয়ে দুধ কিনেছে, মনেই পড়ে না নিবারণের। পুকুরের ধারে কলমীশাক আপনা আপনি জন্মায়, ক'দিন ধরে সেই কলমীশাক সেদ্ধ আর ফ্যান ভাত চলছে।

আকাশটাকে গাঢ় লাল রঙে ভাসিয়ে সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন। এই সময় আকাশটাকে ভগবানের রাজবাড়ির মতন মনে হয়। সেদিকে হাত তুলে মনে মনে নিবারণ বললো, এ-জন্মে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়ে গেলাম, হে ভগবান, পরজন্মে একটুখানি সুখ দিয়ো, যেন দুবেলা পেটপুরে দুটো ভাত খেতে পাই। আর ছেলেপুলেগুলোর হাতে একটু নাড়ু-বাতাসা দিতে পারি।

ডানদিকে, খানিকটা দূরে, নিমগাছটার তলায় একটা ছোটোখাটো জটলা। বিনা পয়সায় দু'এক টান বিড়ি খাওয়ার লোভে নিবারণ সেইদিকে এগিয়ে গেল। এবং গিয়েই একটা চমকপ্রদ খবর শুনলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা হিংস্র আনন্দে জ্বলে উঠলো তার চোখ দুটো। সে যেন এবার তার সব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে।

উত্তেজিত আলোচনার মধ্যে জোর করে মাথা গলিয়ে নিবারণ জিজ্ঞেস করলো, ওসব কথা ছাড়ো দিকিনি। কেউ নিজের চোখে দেখেছে?

সোনারং গ্রামের বাঙাল চারু বললো, নিজের চোখে দেখিনি কি চাটাম মারছি নাকি?

নিবারণ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো, এখনো আছে?

—এই তো ভানু দেখে এয়েছে একটু আগে। মাটিতে গইড়ে ছটফটাচ্ছে!

—সত্যি রে, ভানু?

ভানু অতি সরল নির্বোধ লোক। কুড়ি-বাইশ বছর বয়েস থেকেই তার মাথায় টাক। সবাই জানে, মিথ্যে কথা বানিয়ে বলার ক্ষমতা নাই ভানুর।

ভানু বললো, হ্যাঁ' দেখিছি, কালো জাম গাছটার তলায়। মাটিতে পড়ে

ছটফট করছে আর গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। ওঝা এয়েছে। এমন ধুনো জেলেছে না, চোখ জ্বালায় আমি আর তিষ্ঠুতে পারলাম না।

নিবারণ রাগ করে বললো, ওঝা? তোদের শালার কি ঘটে বুদ্ধি হবে না কোনোদিন? সুরেন্দ্রকে খবর দিস নি কেন? সে বাঞ্চোৎ যে বড় তড়পায়! সে হারামীর বাচ্চাটা আজ দেখাক্ তার কতখানি মুরোদ।

ভানু বললো, সুরেন্দ্র তো টাউনে?

—শালাকে টাউন থেকে ধরে নিয়ে আয়! ওর ইচ্ছে মতন তেনারা কী শুধু ছুটির দিনে দেখা দেবেন?

—মাঝে মাঝে রাত্তিরবেলা সুরেন্দ্র টাউন থেকে বাড়ি ফিরে আসে। কোন্ মাগীকে নাকি ওর মনে ধরেছে।

—তবে ডাক না শালাকে!

সকলে হৈ-হৈ করে খালপাড়ের বাঁধ থেকে নেমে গ্রামের দিকে ছুটে গেল।

সুরেন্দ্রর বাড়ি গ্রামের এক টেরেয়। বাড়ির লপ্তের ধানী জমি এককালে তাদেরই ছিল। তার বাপ ছিল শক্ত হাতের চাষী। কথাবার্তায় কাউকে রেয়াৎ করতো না। অল্প জমিতে গায়ে খেটে সে নিজের বউ-ছেলেকে দু'বেলা খাইয়ে পরিয়ে রেখেছিল।

সে জমি-জেরাত সব গেছে, কিন্তু বাড়িটি এখনো আছে। গ্রামের এই এক অদ্ভুত নিয়ম। সব সময় ফন্দী-ফিকির করে এ ওর জমি কিংবা বাগান নিজের ভাগে নিয়ে নিতে চায়। মিথ্যে মোকদ্দমা লাগে। তা ছাড়া গা-জুরারি দখল তো আছেই। কিন্তু অন্যের বসতবাড়ি কেউ চট্ করে দখল করতে চায় না। সব গ্রামেই একখানা দু'খানা বসতবাড়ি ফাঁকা পড়ে থাকে, মালিকের কোনো পাত্তা নেই, দিনেরবেলা ঘুঘু চড়ে সেখানে, তবু অন্য কেউ সে বাড়িতে চট করে বাস করতে আসে না। তাতে বাস্তু-দেবতা অসন্তুষ্ট হন। অভিশাপ দেন। সেইজন্যই, এমনকি পাশের বাড়ির লোকও আত্মীয়-কুটুম হঠাৎ এসে পড়লে নিজেদের বাড়িতে জায়গা না থাকলেও তাদের সেই ফাঁকা বাড়িতে থাকতে পাঠায় না। বরং সেটা পড়ো বাড়ি হয়ে যাক্ তাও ভালো। লোকে জানালা দরজাগুলো খুলে নিয়ে জ্বালানি করে।

সুরেন্দ্র নিজেদের বাড়িটাতে জানলা কপাট বসিয়ে আবার বাসযোগ্য করে তুলেছে। শহরে তার ফ্যাকটরির পাশে নিজস্ব কোয়ার্টার আছে।

সেখানে পাকা নদমা, আর কলের জল। তবু সুরেন্দ্র আজকাল প্রায়ই গ্রামের বাড়িতে এসে থাকতে ভালোবাসে। এই মাটি তাকে টানে। এক একদিন মাঝ রাত্তিরে নিজের ঘরে একা শুয়ে থেকে সুরেন্দ্র আপনমনে কাঁদে। গলগল করে চোখের জল বেরোয়। অত বড় দশাসই লোকটা যে কাঁদতে পারে, তা কেউ বিশ্বাস করে না। সুরেন্দ্র কাঁদে একা। তার খুব কষ্ট হয় তার মায়ের কথা ভেবে। একদিন নিষ্ঠুরের মতন সে তার মাকে ছেড়ে চলে যায়। চৌধুরীবাবুরা বিনা দোষে তাকে শুয়োর পেটা করার ফলে রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। মায়ের কথাও তখন তার মন পড়েনি। সে পালিয়েছিল। তার মা খেতে না পেয়ে কেঁদে কেঁদে মরে গেছে। এই ঘরে। তার মায়ের নাকি ওলাউঠো হয়েছিল বলে গাঁয়ের কেউ তাকে ছোঁয়নি, তিনদিন ধরে বাসি মড়া পড়েছিল এখানে। তারপর থেকে আর ভয়ে কেউ এ-বাড়ির পাশ মাড়াতো না।

সুরেন্দ্র এতদিন বাদে ফিরে এসেছে এই গাঁয়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে। এখন তার পকেটে টাকা আছে, শরীরে বল আছে, মনে জোর আছে—তবু সে আর তার মাকে ফিরে পাবে না।

নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সুরেন্দ্র এক একবার ভাবে, একদিন সে এ গ্রামেরই কোনো মেয়েকে বিয়ে করবে। তাহলে, তখন হয়তো এ গ্রামের ওপর তার রাগ পড়ে যাবে। কিন্তু সেরকম মেয়ে কই? কারুকেই চোখে ধরে না। রূপের কথা ছেড়েই দাও, একটারও স্বাস্থ্য ভাল নয়। কারুর ভালো করে বুকটুকও ওঠেনি।

বাইরে থেকে যেন মোটা গলায় ডাকে, সুরেন্দ্র! সুরেন্দ্র!

ঠিক যেন তার বাবার গলা।

সুরেন্দ্র শুয়ে শুয়ে হাসে। গাঁয়ের উটকো ছেলেরা তাকে নানারকম ভাবে ভয় দেখবার চেষ্টা করেছে অনেকবার। টিনের চালে ঢেলা ছুঁড়েছে, জলে-ডোবানো বেড়াল ছেড়ে দিয়েছে ঘরের মধ্যে। একদিন তক্কে তক্কে থেকে সুরেন্দ্র কয়েকটা ছোঁড়াকে ধরে ফেলে বেধড়ক ধোলাই দিয়েছিল। তারপর থেকে ওসব উৎপাত অনেকটা কমেছে, কিন্তু দু'-চারজন এখনো তার পেছনে লেগে আছে। আবার ধরতে পারলে হয়।

আবার সুরেন্দ্র সুরেন্দ্র বলে ডাক উঠতেই সে বাইরে বেরিয়ে এলো।

কেউ নেই। আকাশে তৃতীয়ার ফালি চাঁদ। কয়েকটা চামচিকে উড়তে উড়তে চাঁদের দিকে চলে যাচ্ছে। পরপর চারটে নারকোল গাছের সব কটা পাতা এখন হাওয়ায় উত্তরমুখো।

কেউ নেই, তবু কে ডাকলো?

সুরেন্দ্র চারদিকে ঘুরে ঘুরে তাকায়। খানিক আগে সন্ধ্যে হয়েছে। এর মধ্যেই গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে মোহনিদ্রা। সুরেন্দ্র নিজের কপাট-বুকে হাত বুলিয়ে মনে মনে বললো, ওরকম হয়। একলা থাকলে ওরকম শোনা যায়। আর বেশীদিন একলা থাকতে ইচ্ছে করে না।

অন্ধকারের মধ্যে দূর থেকে কারা যেন হেঁটে আসছে। সাত আটজন মানুষ। তারা আসছে প্রায় দৌড়ে দৌড়ে, এ বাড়ির দিকেই। সুরেন্দ্র স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

দলের প্রথমেই আছে নিতাই। সে লাফাতে লাফাতে এসে বললো, সুরেনদা, ও সুরেনদা জবর খবর আছে! আমি তোমার কাছেই আসছিলাম পথে এনাদের সঙ্গে দেখা হলো। জবর খবর।

সুরেন্দ্র বিনা উত্তেজনায় বললো কী খবর?

—সোনারং গাঁয়ের সর্বানন্দ দাসের পুতের বউকে ভূতে ধরেছে।

সুরেন্দ্র ঠাট্টা করে বললো, বটে? কতখানি ভাং খেয়েছিস?

এবার অন্য চার পাঁচজন এগিয়ে এসে বললো, সাচ্চা কথা। সর্বানন্দের ছেলে বিভূতির বউকে পেত্নীতে ধরেছে। সকাল থেকে মাটিতে পড়ে ছটফটাচ্ছে। তার মুখ দিয়ে কথা বলছে পেত্নীটা। কী সব কুচ্ছিৎ কথা।

ঠাট্টার সুরটা বজায় রেখেই সুরেন্দ্র বললো, বটে! কী কুচ্ছিত কথা বলছে শুনি?

—সে তুমি গেলেই নিজের কানে শুনতে পাবে।

—আপনারা কেউ শোনেন নি? কেউ চোখে দেখেছেন?

নিবারণ উগ্র গলায় বললো, আলবৎ দেখেছে। এই তো চারু আর ভেনো—দুজনেই দেখেছে। ওঝা এসেও সে পেত্নীকে ভাগাতে পারছে না।

—সর্বানন্দের ছেলে বিভূতি কোথায়?

—সে তো দুর্গাপুরে কাজ করে।

—ওদের বাড়ির কেউ আছে এখানে? ওদের বাড়ির কেউ তো ডাকতে আসেনি আমাকে!

—কেন, আমরা বললে তুই যাবি না? আমাদের কথা কথা নয়? আমরা কি ক্যালনা?

—ত্থাখো, আমি সাফ কথা বলি। সর্বানন্দের বাড়ি দু'আড়াই মাইলের রাস্তা। অতখানি রাস্তা উড়ো কথা শুনে যদি শুধু মুদু যেতে হয়, তার চেয়ে ঘরে বসে কেত্তন গাওয়া অনেক ভালো!

—নাকি তুই ভয় পাচ্ছিস এখন?

সুরেন্দ্র এবার হাসলো। এত বয়স্ক বয়স্ক লোকদেরও তার খুব ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। এদের মাথায় গোবর। সে বললো, আমার এমন লাভের কারবার, তাতে কী ভয় পেলে চলে? কিন্তু খাঁটি মাল পাচ্ছি কোথায়?

—এবার গিয়েই ত্থাখ না।

—যাচ্ছি তা হলে। কিন্তু গিয়ে যদি দেখি ভাঁওতা, তা হলে কিন্তু উস্তম ফুস্তম করে ছাড়বো আমি। আমার সঙ্গে মাস্করা করো না। আমি সরল কথার মানুষ।

সুরেন্দ্র ঘরের মধ্যে ফিরে গেল রেডি হয়ে নিতে। অন্যরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো, শুধু নিতাইয়ের অধিকার আছে ঘরে ঢোকার।

সুরেন্দ্র একটা ঝোলার মধ্যে কয়েকটি জিনিস ভরে নিচ্ছে। একটা ছোট্ট টিনের বাক্স, তার মধ্যে কী আছে, নিতাই জানে না। একটা টর্চ। এক বাণ্ডিল ব্যাণ্ডেজের কাপড়। আর একটা বিলিতি মদের (দিশি-বিলিতি) খালি বোতল।

নিতাই জিজ্ঞেস করলো, সুরেনদা, খালি বোতলটা নিচ্ছো কেন?

এক গাল হেসে সুরেন্দ্র বললো, জানিস না? এই বোতলের মধ্যেই পেত্নীটাকে ভরবো। ভূত-পেত্নীরা বোতলকে বড় ডরায়। যেই বোতলটা তুলে ধরবো, অমনি তার মধ্যে সুরুৎ করে এসে ঢুকে পড়বে। শালা! তুইও ওদের কথায় নেচেছিস!

ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে সুরেন্দ্র বললো, চলো।

কয়েক পা এগিয়েই নিবারণ তাকে জিজ্ঞেস করলো, টাকা এনেছিস তো সুরেন? একশো টাকা দিবি বলে কথা দিয়েছিস, আজ তোর টাকা খসবে।

সুরেন্দ্র নিষ্ঠুরের মতন উত্তর দিল, তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন নিবারণকা? ভালো মাল পেলে আমি দাম দেবো। টাকা যদি পায় তো পাবে সর্বানন্দ দাস, তোমাকে কি তার থেকে একটা পয়সাও দেবে?

নিবারণ খানিকটা চুপসে গেল। তবু সে মনে মনে বললো, তা আমি পেলাম আর না পেলাম, তবু তোর পকেট থেকে টাকা খসতে দেখলেই আমার আনন্দ হবে। হারামীর বাচ্চা তোর তেজ আজ ভাঙবে!

সর্বানন্দ দাসের অবস্থা এককালে বেশ সচ্ছল ছিল। এখন আর তেমন রমরমা নেই, জমি জায়গা বেহাত হয়ে গেছে, তবু তার বড় ছেলে শহরে চাকরি করে বাড়িতে টাকা পাঠায়। বাড়িটি বেশ সুন্দর। মস্তবড় উঠোনের চারপাশে চারটি ঘর। আর সে বাড়ি ঘিরে রয়েছে অনেকগুলো সুপুরিগাছ। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে একটি সুপুরিগাছ ঘেরা পথ চলে গেছে পুকুর পাড় পর্যন্ত। উঠোনের এককোণে একটি বড় কালোজাম গাছ।

বাড়িটি এখন ভিড়ে ভিড়াকার। সেই ভিড় সামলাবার চেষ্টাও কারুর নেই। যার যা খুশী করছে, লোকের চ্যাচামেচিতে কান পাতা যায় না। সেই সঙ্গে ধুপধুনোর ধোঁয়া। একটা হ্যাজাকের আলো ঘিরে উড়ছে অসংখ্য পোকা।

সর্বানন্দের পুত্রবধূ শান্তি শুয়ে আছে উঠোনে। তার সর্বাঙ্গের পোশাক ভেজা, মাথার চুল জল কাদায় মাখামাখি। চোখ দুটি বন্ধ, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে অনবরত। শরীরটা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে হঠাৎ বেঁকে দুমড়ে উঠছে, যেন অসহ্য যন্ত্রণায়।

বড় একটা মাটির মালসায় টিকের আগুন জ্বেলে তাতে একটু একটু ধুনো দিচ্ছে সর্বানন্দ নিজে। আর শান্তির পাশে বসে ওঝা অনবরত মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে চোখ বুজে, তার হাতে একটা ঝাঁটা।

ওঝাটি বেঁটে বাঁটকুল। এ গ্রামের মহাদেব ওঝার ছিল দারুণ নাম ডাক। আশপাশের দশ বিশখানা গাঁ থেকে বায়না হতো। চেহারাও ছিল সাঙ্ঘাতিক, দেখলে ভয় ও ভক্তি—দুটোই জাগতো। মেয়েমানুষের মতন কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল, এদিকে গালভর্তি চাপ দাড়ি, টকটকে লাল রঙের কাপড় পরা, চোখ দুটিও সেইরকম লাল, হাতে একটা ডাণ্ডা। এই মহাদেব ওঝা নাকি মন্ত্রের জোরে ভূত-প্রেতদের তিড়িংবিড়িং করে নাচাতে পারতো। মাস ছয়েক আগে সেই মহাদেব ওঝা মারা গেছে। সে নাকি নিজের শরীরের মধ্যে এক সঙ্গে দুটো ভূত ঢুকিয়ে আটকে রাখতে গিয়েছিল।

পুরুতের ছেলে যেমন পুরুত হয়, তেমনি ওঝার ছেলেও ওঝা হয়েছে। কিন্তু বাপের চেহারা পায়নি ছেলে। বয়সে তার মাত্র কুড়ি-বাইশ, দেহটি

নাদুস নুদুস। তা হোক, বাপের কাছ থেকে মন্ত্রগুলো তো সব পেয়েছে। তার আর একটি বড় গুণ আছে, সে জিভ দিয়ে নিজের নাক ছুঁতে পারে।

মহাদেবের ছেলের নাম সুবল। সে মাটিতে জোড়াসন করে বসে খুব ভাব দিয়ে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে, আর বউটি যেই মাঝে মাঝে বেঁকে দুমড়ে উঠছে, অমনি সে হাতের ঝাঁটা দিয়ে সপাং সপাং করে পিটোচ্ছে। মহাদেব ওঝা নাকি মারের চোটে রক্ত বার করে দিত। সুবল অতজোরে মারতে না পারলেও তার গালাগালির জোর আছে। শান্তি একবার বেশী করে হাত-পা ছুঁড়তেই সুবল ওঝা এক হাতে তার চুলের মুঠি চেপে ধরে মারতে মারতে বললো, যা যা আবাগীর বেটী শতেক ভাতারী দুর হ! দুর হ!

সুরেন্দ্র ভিড় ঠেলে এসে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়ালো। মিশমিশে কালো যমদূতের মতন তার চেহারা। রাগে চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে গেছে প্রথমেই তার ইচ্ছে হলো, সুবল হারামজাদাকে কঁ্যাৎ কঁ্যাৎ করে দুটো লাথি কষায়। শুয়োরের বাচ্চাটা মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলে! সুরেন্দ্র দু'পা এগিয়েও গেল তার দিকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মারলো না। তার মনে পড়লো ফাদার পেরেরার কথা। নিতান্ত আত্মরক্ষার কারণে ছাড়া কারুকে মারতে নেই। যখন তখন মারামারি করে জন্তুরা। তুমি তো মানুষ সুরেন্দ্র।

সে ঝুঁকে সুবলকে বললো, দেখি কর্তা, ছাড়ো, ছাড়ো! আমি একটু দেখবো।

আজ যদি মহাদেব ওঝা থাকতো, তাহলে তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে যেত একটা। মহাদেব ওঝার কাজে কেউ কখনো বাধা দিতে সাহস করেনি। সুরেন্দ্রর মতন সা-জোয়ানকেও গ্রাহ্য করতো না সে, তার গায়েও শক্তি কম ছিল না। কিন্তু ছেলেটি হয়েছে অকাল কুষ্মাণ্ড!

সুবল মিনমিন করে বললো, আমার কেস্, তুমি দেখবার কে? বেটিকে এই তাড়ালুম বলে! আর একটুখানি।

সুরেন্দ্র তাকে পোকামাকড়ের মতন অগ্রাহ্য করে বললো, সরো, সরো! তারপর সর্বানন্দকে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছিল?

সর্বানন্দ বিবর্ণ মুখে, একটা হাত তুলে বললো, ঐ জামগাছটা—

সুবলই এবার বাকিটা বলে দিল। আজ ভোরবেলা বাসি কাপড়ে এই বউটি ঘর থেকে বেরিয়েছে। তখনও ভালো করে সূর্য ওঠেনি। ঘর থেকে উঠোনে পা দিয়েই দেখলো, তিনটে কই মাছ! একটা বড় মাটির হাঁড়িতে

কাল রাত থেকে কইমাছ জয়োনো ছিল। এ বাড়িতে প্রায়ই এরকম জিওল মাছ রাখা থাকে। কোনোক্রমে হাঁড়িটা কাৎ হয়ে পড়েছিল, তার থেকে বেরিয়ে এসেছে কয়েকটা মাছ। বেড়ালে যে খেয়ে ফেলেনি, তাই ভাগ্যি। বেড়াল অবশ্য জ্যান্ত কই মাছকে ভয় পায়। বউ তাড়াতাড়ি মাছগুলোকে ধরে হাঁড়িতে ভরলো। সেই আঁশ হাত না ধুয়েই মুছে ফেললো কাপড়ে। তারপর ঘুমচোখে জল খালাস করে আবার ঘরে ফিরে শুতে যাবে, এমন সময়—

এই পর্যন্ত বলে সুবল থাকলো। উপস্থিত অন্যান্য লোকেরা এই ঘটনা ইতিমধ্যে প্রায় বার পঞ্চাশেক শুনেছে, তবু সুবল খানিকটা নাটকীয় করবার জন্য বললো, ঐ জামগাছটা, ঐ জামগাছ ওঁৎ পেতে বসেছিল দুটিতে, দুই দুষ্ট আত্মা, ওরা তো এইসব সুযোগই খোঁজে! বাসি কাপড়ে আঁশ হাত মুচেছে, তার ওপর পেচ্ছাপ করে এসে পায়ে জল দেয়নি, বউ যেই জামগাছতলা দিয়ে আসছে, অমনি গাছের একটা ডাল নীচু হয়ে নেমে এসে মারলো মাথায় একটা ঝাপটা। ব্যাস, সেই যে পড়ে গেল উঠোনে, আর তাকে নড়ানো যায় না।

সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করলো, অত ভোরে আর কেউ জেগেছিল? কেউ দেখেছে যে বউ কইমাছ ধরেছিল? কিংবা পায়ে জল দেয়নি?

সুবল বিজ্ঞের মতন বললো, দেখতে হবে কেন? আমি তো কেস দেখেই বুঝে নিয়েছি। ঐ যে বারাণ্ডায় জিওল মাছের হাঁড়িটা এখনো রয়েছে।

সুরেন্দ্র বললো, হুঁ!

সুবোল বললো, প্রমাণ চাও? দেখবে?

হাতের ঝাঁটা দিয়ে শান্তিকে খুব জোর একটা বাড়ি মেরে বললো, হারামজাদী, ছোটলোকের নাতী, বল বল, বউ বাসি কাপড়ে মাছ ধরেনি?

শান্তির মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরুলো, উঁ উঁ।

—ঐ ভাখো, স্বীকার পেয়েছে। আরও শুনবে!

আবার সে শান্তিকে ঝাঁটা মেরে বললো, গুখাগী, বল, গাছের ডাল নীচু হয়ে এসে ওর মাথায় মারেনি? বল, মারেনি?

এবার শান্তির মুখ দিয়ে স্পষ্ট আওয়াজ বেরুলো, মেরেছে, মেরেছে।

সুবল সগর্বে মুখ ঘুরিয়ে তাকালো।

সুরেন্দ্র সুবলের হাত থেকে ঝাঁটাটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল দূরে।

শান্তি এ-গ্রামের মেয়ে নয়। সর্বানন্দের মামার বাড়ি রসাপাগলা গ্রামে বেড়াতে গিয়ে সর্বানন্দ এই মেয়ে পছন্দ করে এসেছিল। মেয়েটি কিছু লেখাপড়া জানে। সর্বানন্দের ছেলে বিভূতি মহকুমা শহর থেকে বি-এ পাশ দিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে এ মেয়েকে মানিয়েছিল ভালো। ঘরের বউ হয়েও শান্তি জোড়া বিনুনি করতো অনেকদিন। শহরে খরচ বেশী বলে বিভূতি এই দু'বছর হলো বউকে গ্রামের বাড়িতে রেখেছে। সে ন'মাসে ছ'মাসে একবার আসে। এখনো বাচ্চাকাচ্চা হয়নি, ইতিমধ্যেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে বউ বাঁজা।

সুরেন্দ্র তাকিয়ে রইলো শান্তির দিকে। একটু আগে উপুড় হয়েছিল এখন সে চিৎ হয়েছে, একটা হাত চাপা পড়েছে পিঠের তলায়, মুখটা মাটির দিকে ফেরানো। ভরা যৌবনের এক নারী এতগুলো লোকের চোখের সামনে পড়ে আছে মাটিতে, ভিজে কাপড় সেঁটে গেছে গায়ের সঙ্গে, আঁচলটা অজগর সাপের মতন গোল হয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে পায়ের কাছে, কোমরে কষিও আলগা। চোখ দুটো খোলা, কিন্তু সে চোখে কোনো দৃষ্টি নেই।

বাঁজা মেয়েদের স্বাস্থ্য ভালো হয়। সুরেন্দ্র এ পর্যন্ত দু'গাঁয়ের মধ্যে শান্তির মতন সুন্দরী আর দেখেনি।

সুবল বললো, এক সঙ্গে দু' দুটো দুষ্ট আত্মা এসে বসেছিল ঐ জাম গাছে। মদ্দাটা এখনো বসে আছে ওখানে, আমি গাছটার চার পাশে গণ্ডি কেটে দিয়েছি, এদিকে আসতে পারবে না। পেত্নীটা সেঁধিয়েছে বউয়ের শরীলে। এক সঙ্গে ছাড়া দুটোতে যাবে না।

সুরেন্দ্র এগিয়ে গেল জাম গাছটার দিকে। সুবল চেঁচিয়ে বললো, ওদিকে যেও নি, গায়ে বাতাস লেগে যাবে, তোমার গায়ে বাতাস লেগে যাবে বলে দিচ্ছি। মদ্দাটা এখনো বসে আছে। ছাখো না, হাওয়া বাতাস নেই, তবু ডগার ডালটা আপনা আপনি নড়ছে।

ফ্যাকাসে জ্যোৎস্নায় সত্যিই মনে হয়, জাম গাছের ডগার ডালটা দুলছে একটু একটু।

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বললো ও যেতে চায় যাক না।

সুরেন্দ্র নীচু হয়ে তার খাঁকি প্যান্ট গুটিয়ে ফেললো হাঁটু পর্যন্ত, তারপর তরতর করে উঠে গেল জাম গাছে। সবচেয়ে মোটা ডালটার ওপর এক পায়ে দাঁড়িয়ে হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, কোথায় সে?

সুবল বললো, আরো ওপরে, একেবারে ডগায়। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, হাসছে ব্যাটা। আর একটু ওপরে ওঠো, টেরটি পাবে।

সুরেন্দ্র বুঝলো, ওর চালাকিটা। জাম গাছের ডাল তেমন মজবুত নয়। তাদের বাড়িতে একটা জাম গাছের পিঁড়ি ছিল, কথা নেই বার্তা নেই একদিন এমনিই সেটা মাঝখান থেকে ফেটে দু' ভাগ হয়ে গেল। এখন সে তার এতবড় শরীরটা নিয়ে যদি আরও ওপরে ওঠে, তাহলে হঠাৎ ভেঙে পড়ে যাবে। আর না উঠলে ওরা বলবে, সে হেরে গেল!

কোমরের বেল্টটা খুলে সে একটা গোল ফাঁস করলো। তারপর পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ডিঙ্গি মেরে যতটা লম্বা হওয়া সম্ভব লম্বা হয়ে সে বেল্টের ফাঁস দিয়ে ডগার ডালটা ধরার চেষ্টা করলে। একবার ধরতে পেরেই সে মট্ করে ডালটা ভেঙে সেটা হাতে নিয়ে এলো নীচে।

গাছের ডালটা সে সুবলের নাকের কাছে এগিয়ে দিয়ে বললো, এর মধ্যে তোমার মদ্দা ভূতটা বসে আছে?

সুবল ভয় পেয়ে মাথাটা পিছিয়ে নিল খানিকটা।

শান্তি এর মধ্যে উঠে বসেছে আর ফিকফিক করে হাসছে। সুরেন্দ্রর দিকে হাতছানি দিয়ে বললো, এই শোনো, শোনো।

সবাই চেঁচিয়ে উঠলো ডেকেছে, ডেকেছে, পেত্নীটা ওকে ডেকেছে।

সুরেন্দ্র খানিকটা হকচকিয়ে গেল। ঠিক যেন স্বাভাবিক মানুষের মতন গলা। তবে কি বউটা এতক্ষণ নকল যাত্রা করছিল? সুবলের হাতে এত মার খেয়েও?

পাকানো আঁচলটা তুলে নিয়ে শান্তি গায়ে জড়িয়ে ভদ্র হলো। সেই রকমই ফিকফিকিয়ে এসে হাতছানি দিয়ে সুরেন্দ্রকে বলতে লাগলো, এই শোনো, শোনো, শোনো না—

সুরেন্দ্র এগিয়ে গিয়ে বললো, কী?

—শোনো। আরো কাছে এসো—

আর একটু এগিয়ে সুরেন্দ্র বললো কী?

শান্তি মাটির ওপর চাপড় মেরে বললো, বসো, এখানে এসে বসো। লজ্জা কি? আমাকেও তোমার লজ্জা? তুমি যে আমার নাগর। বসো—

সুরেন্দ্র মাটিতে বসলো।

শান্তি বললো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। কানে কানে বলবো—

সুরেন্দ্র বললো, ঐখান থেকেই বলো—

পা ঘষটে ঘষটে শান্তি নিজেই চলে এলো সুরেন্দ্রর কোলের কাছে। তার মাথাটা ধরে টানলো। সুরেন্দ্র খুবই অস্বস্তিতে পড়েছে। শান্তি তার কানে কানে কী যেন বলতে চায়।

সুরেন্দ্রর কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে শান্তি ফিসফিস করে কী যেন বলতে লাগলো। সুরেন্দ্র বুঝতে পারলো না তার একটাও বর্ণ। এক সময় সে উঃ বলে চেঁচিয়ে উঠলো। শান্তি তার কান কামড়ে ধরেছে। সুরেন্দ্র ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল শান্তিকে। তার কান দিয়ে দর দর করে রক্ত গড়াচ্ছে।

জনতা হেসে উঠলো হো-হো করে। সুরেন্দ্রর দুর্দশা দেখে তারা দারুণ মজা পেয়েছে। সেইদিন থেকে তার নাম হয়ে গেল, 'কানকাটা সুরেন্দ্র!'

কিন্তু জনতার হাসিও থেমে গেল শান্তির অকস্মাৎ হাসিতে। শান্তি হি হি হি হি করে হেসে উঠলো, তার ঠোঁটের পাশে রক্ত। তারপর একটা অদ্ভুত বিকট গলা বার করে বললো, এই সুরেন্দ্র, আমাকে বিয়ে করবি? আয় না! বিয়ে করবি? তোতে আমাতে পাটক্ষেতে লুকিয়ে থাকবো। বিয়ে করবি? এই সুরেন্দ্র! আয় না!

সবাই জানে, সর্বানন্দের ছেলের বউ শান্তি বড় লাজুক মেয়ে। পাঁচ-জনের সামনে সে কক্ষণো রা কাড়ে না। বিশেষত শ্বশুরের সামনে সে কোনো দিনও এরকমভাবে খারাপ কথা বলবে না। তা ছাড়া এতো শান্তির গলা নয়, তার ভেতর থেকে অন্য কেউ বলছে।

শান্তি আবার হাসতে লাগলো হি হি হি হি করে। মানুষে সেরকম হাসতে পারে না। ঠিক যেন দুটো ছুরিতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। শুনলেই গা ছমছম করে। অনেকেই ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল!

সুরেন্দ্র রুমাল দিয়ে তার কানটা চেপে ধরে আছে। রক্তে ভিজে গেছে তার ঘাড়ের কাছের জামা।

শান্তি এবার সুরেন্দ্রর বুকের ওপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো, খেলবি? আমার সঙ্গে খেলবি? এই সুরেন্দ্র, আয় না, খেলবি? হি-হি-হি-হি।

স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলা বিষয়ক বিধিনিষেধ ভুলে গেল সুরেন্দ্র। সে নিজেই এবার শান্তির চুলের মুঠি ধরে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে দু' গালে সপাটে দুটো থাপ্পড় কষালো। সুরেন্দ্রর মাথায় রাগ চড়ে গেছে।

চড় খেয়ে শান্তি আবার নেতিয়ে পড়লো মাটিতে।

যারা ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে আবার কয়েকজন ফিরে এসেছে। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। সুরেন্দ্র রক্ত মুছচে কান থেকে।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্য থেকে নিবারণ বললো, এই সুরেন্দ্র, এবার টাকা বার কর, টাকা দে।

আর পাঁচজন বললো, হ্যাঁ এবার টাকা দিতে হবে। সর্বানন্দদা, ওকে ছেড়ো না, ধরে।

সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করলো, কিসের টাকা?

—তুই যে বলেছিলি চোখের সামনে ভূত দেখলে একশো টাকা দিবি? দে শালা সেই টাকা! এই মাত্তর কী দেখলি?

সুরেন্দ্র বললো, কী দেখলাম?

—এখন ন্যাকা সাজছিস? সবাই সাক্ষী দেবে, তুই পঞ্চাশবার বলেছিস নিজের চোখে ভূত দেখলে একশো টাকা দিবি। এই মাত্তর দেখলি না?

সুরেন্দ্র বললো, না দেখিনি!

—মিথ্যে কথা। টাকা মারবার মতলোব। দে টাকা। সর্বানন্দদা, ওকে ছেড়ো না, ধরো, আজ আর ছাড়ান ছুড়িন নেই। বড় টাকার গরমই দেখায়—

অনেকে মিলে গোল হয়ে এগিয়ে আসছে সুরেন্দ্রর দিকে। ওরা সুরেন্দ্রকে এক সঙ্গে চেপে ধরবে। রোগা, খেতে না-পাওয়া, ভীতু নিবারণের উৎসাহই যেন সবচেয়ে বেশী। সে ঐ টাকার একটা আধলাও পাবে না, তবু তো সুরেন হারামজাদার দেমাক ঠাণ্ডা করা যাবে! সুরেন্দ্রর নিজের দলের ছেলে নিতাই পর্যন্ত এই কাণ্ড দেখে পেছনে লুকিয়েছে, সে আর মুখ খুলছে না, তা হলে বউদির ব্যাপার স্যাপার দেখে তার বুক কাঁপছে।

সুরেন্দ্র সামনের দু'জনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়ালো, তারপর জামার তলায় কোমর থেকে একটা মস্ত বড় ভোজালি টেনে বার করে বললো, খবরদার আমার সঙ্গে এঁটেলবাজি করতে এসো না, তা হলে আমি রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেবো!

এবার দৌড়ে পালাতে গিয়ে এ ওর ঘাড়ের ওপর উল্টে পড়লো। সুরেন্দ্রটা একটা খুনে, ঠিকই বোঝা গিয়েছিল আগে।

সুরেন্দ্র হাওয়ায় ভোজালি ঘুরিয়ে বললো, আমি এক কথার মানুষ। একশো টাকা দেবো বলিছি, আসল মাল পেলে ঠিকই দেবো। তাবলে

আমাকে বাজে মাল, তুমি মাল গছাবে? একটা মৃগী রুগী, তাই দেখিয়ে টাকা চাইছো? অ্যাঁ!

ভাঙা জামগাছের ডালটা মাটিতে তিনবার আছড়ে বললো, এর মধ্যে মদ্দা ভূত আছে? কোথায় সে শালা? নাকি আমাকে দেখে পালিয়েছে?

ঝোলা থেকে খালি বোতলটা বার করে সুবলের সামনে ঠকাস করে রেখে সে বললো, সাপুড়েরা যেমন সাপ ধরে, সেই রকম একটা ভূত ধরে দাও দিখি আমাকে! তুমি তো ভূত ধরে বেড়াও। এই বোতলটির ছিপি আটকে দেবার পর যদি আপনা আপনি লাফায়, তবে আমি এক্ষুনি তোমাকে একশো টাকা দেবো। এক্ষুনি। এই দেখো টাকা!

সুরেন্দ্র পকেট থেকে একগোছা এক টাকার নোট বের করে দেখালো।

কিছু না পেয়ে সুবল বললো, যা যা।

মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসে সুরেন্দ্র ভোজালিটা পাশে নামিয়ে রাখলো। তারপর শান্তির নেতিয়ে পড়া একটা হাত তুলে নাড়ি দেখতে লাগলো।

সুরেন্দ্র এতক্ষণে খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে বললো, এই, তুমি আমার বউয়ের গায়ে হাত ছুঁইয়ো না!

সর্বানন্দ তাকে এক ধমক দিয়ে বললো, চোপ! একটু আগে তোমার ছেলের বউ আমার কানে কানে কী বলেছে জানো? যদি সবার সামনে বলে দিই, তোমার মুখে চুনকালি পড়বে।

সর্বানন্দ চুপসে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ওঝার ছেলে ওঝা সুবল কিন্তু এত সহজে তার দাবি ছাড়তে চায় না। দর্শকের মধ্যে যে-ক'জন দূর থেকে তখনও উঁকি ঝুঁকি মারছিল, তাদের উদ্দেশ্যে সে বললো, তোমরা দেখলে, তোমরা পাঁচজনা দেখলে, ও আমার কেস কেড়ে নিচ্ছে। এ বাড়ি থেকে আগে আমার ডাক পড়েছিল—

সুরেন্দ্র বললো, এতক্ষণ ধরে তো ভ্যাজর ভ্যাজর করলে, ধরতে পেরেছো পেত্নীটাকে?

সুবল বললো, তুমি সরো। এবার আমি ভূতডামরতন্ত্র শুরু করবো। বেটি ধরা না পড়ে যাবে কোথায়?

সুরেন্দ্র বললো, রাখো তোমার ভূতডামরতন্ত্র! তুমি তোড়লতন্ত্রের নাম শুনেছো? সে হলো গে সব তন্ত্রের বাবা। এইবার ভাখো, আমি সেই তোড়লতন্ত্র শুরু করছি!

সুরেন্দ্র তার ঝোলা থেকে টিনের বাক্সটা বার করে খুললো। তার মধ্যে ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ আর টুকিটাকি ওষুধ। একটা অ্যাম্পিউল ভেঙে সবটা ওষুধ ভরে নিল সিরিঞ্জে। তারপর ডগাটা উঁচু করে হাওয়া বার করলো।

সবাই শঙ্কিত বিস্ময়ে চুপ।

সুরেন্দ্র সর্বানন্দকে বললো, ভয় পেয়ো না, আমার সুঁই দেওয়ার অভ্যাস আছে। ফাদার পেরেরার নাম শুনছো? মস্ত বড় ডাক্তার। আমাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। খাইয়ে পরিয়ে আমাকে মানুষ করেছেন। তেনার কাছ থেকে সুঁই দেওয়া শিখেছি।

প্যাট করে সিরিঞ্জের সুঁচটা সে ফুটিয়ে দিল শান্তির ডান বাহুতে। পাকা কম্পাউণ্ডারের মতন তার ভঙ্গি। শান্তি একটুও শব্দ করলো না। সবটুকু ঢেলে দিয়ে সুঁচ বার করে সুরেন্দ্র সর্বানন্দকে বললো, তোমার ছেলের বউয়ের হিষ্টিরি অসুখ হয়েছে। এখন দশ বারো ঘণ্টা ঘুমোবে। তারপর জেগে উঠলে ভালো করে খেতে দিও। সেরে যাবে। যাও, এবার ঘরে নিয়ে শুইয়ে দাওগে! উঃ, আমার কানটা একেবারে ফালা ফালা করে দিয়েছে।

সর্বানন্দ বললো, বউয়ের গায়ে এখন এত শক্তি যে পাঁচজন মিলেও ওকে আগে ধরে রাখতে পারেনি। ঘরে নিয়ে যাবো কী করে?

সুরেন্দ্র বললো, হুঁঃ!

তারপর দক্ষযজ্ঞের শিবের মতন সে শান্তিকে পাঁজকোলা করে তুলে নিল মাটি থেকে। সর্বনন্দকে বললো, কোন্ ঘরে শোয় দেখিয়ে দাও, বিছানায় রেখে আসছি।

বারান্দা পেরিয়ে দরজা দিয়ে ঢোকার মুখে সে সর্বানন্দর দিকে তীব্র ঘৃণার চোখে তাকালো তারপর নীচু গলায় বললো, পোয়াতী বউটাকে বুঝি এইভাবে মেরে ফেলতে চাও? ছিঃ! তোমরা না ভদ্রলোক।

তিনদিন ধরে বৃষ্টি আর বৃষ্টি। বিশ্বাসই হয় না যে এটা শীতকাল। ঠিক যেন বর্ষার ধারা।

সারা গায়ে জল-কাদা মেখে সন্ধ্যের সময় টলতে টলতে বাড়ি ফিরছে নিবারণ। নেশাভাঙ কিছু করেনি, তবু তার পায়ে জোর নেই। শরীর যেন আর বয় না। যে-কোনো সময় যে-কোনো জায়গায় পড়ে যাবে। তার বুকে সারা বিশ্বের হতাশা।

মহাজনের কাছ থেকে কর্জ নিয়ে নিবারণ তার বন্দকী জমিতে ফুলকপির চারা লাগিয়েছিল মাত্র পাঁচ দিন আগে। বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেল। এই সময় এত বৃষ্টির কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। এ যেন ঈশ্বরের অভিশাপ। আজ আবার পাশের জমির আল ভেঙে গিয়ে জল ঢুকে পড়লো। কপির চারাগুলো সব পচে যাবে। কিছু কিছু চারা তুলে ফেলবার চেষ্টা করেছিলে নিবারণ, কিন্তু অর্ধেকের বেশীই বাঁচাতে পারেনি। মহাজনের সঙ্গে শর্ত ছিল পঞ্চাশ-পঞ্চাশ।

সে তো গেল ভবিষ্যতের কথা, কিন্তু আজ! কাল দুপুর থেকে মাটি কাটা বন্ধ হয়ে গেল। এই বৃষ্টির মধ্যে মাটি কেটে কোনো লাভ নেই। অথচ আজই ছিল নিবারণের পালা। আজ কাজ থাকলে সে নিজের খোরাকির ভাত আর নগদ সাড়ে চার টাকা পেত। এখন মনে হচ্ছে সাড়ে চার টাকায় কত কিছু কেনা যায়। মাত্র সাড়ে চার টাকায় এক পৃথিবী ভর্তি সুখ।

রাহমান সাহেব বলেছেন, আজ যারা কাজ পেলো না, কাল যদি বৃষ্টি নামে, তবে তারাই কাজ পাবে আগে। আর কালও যদি বৃষ্টি থাকে ? তাহলে পরশু। মোটকথা নিবারণের কাজ বাঁধা। এখন কাল বা পরশু পর্যন্ত নিবারণকে পেটে কিল মেরে বেঁচে থাকতে হবে।

নিবারণ ক্রুদ্ধ দু'চোখে আকাশের দিকে তাকালো। মেঘও মানুষের এত শত্রুতা করে ? ছোট ছোট ফুলকপির চারাগুলো দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়, ঠিক যেন মায়ের কোলে মুখ-লুকোনো শিশু, আকাশের দেবতাদেরও একটু মায়া হলো না তাদের মেরে ফেলতে ? ফুলকপির চারাগুলো কাঁদছিল ডুকরে, নিবারণ শুনেছে।

কাদার মধ্যে পা হড়কে যেতেই নিবারণের কোমরের কষি একটু আলগা হয়ে গেল, আর অমনি ট্যাঁক থেকে টুপুস করে খসে পড়লো একটা ছোট্ট কাঁচের শিশি। তার মধ্যে রয়েছে কালো-হলদে রঙের লম্বা লম্বা ছ'খানা ওষুধ। অন্ধকারে কাদার মধ্যে শিশিটা আবার গেল কোথায় ? নিবারণ লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে সেটাকে খুঁজতে লাগলো। বিরক্তিতে তার গা জ্বলে যাচ্ছে। তার কিছুই ভাল লাগছে না।

পাওয়া গেল শিশিটা। ভেতরে কাদা ঢোকেনি তো ? না, ওপরে একটা রবারের ছিপি আছে, হাওয়াও ঢুকতে পারে না। শিশিটা খুঁজে পেয়ে আনন্দ হবার বদলে নিবারণের ইচ্ছে হলো, সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়!

সোনারং-এর হেলথ সেণ্টারের ডাক্তারবাবুর খুব মাছ ধরার শখ। এক এক রোববার এক এক পুকুরে মাছ ধরতে যান। গত রোববার এসেছিলেন চৌধুরীবাবুদের বাড়ির পেছনের মজা দিঘিতে। শান্তি আর গেন্থু ঘুরঘুর করছে সেখানে। মাছ ধরারই ঝোঁক ডাক্তারবাবুর, মাছ খাওয়ার লোভ নেই। একটার বেশী মাছ ধরা পড়লে বাকিগুলো অন্যদের বিলিয়ে দেন। সবাই জানে। সেদিন ডাক্তারবাবু ছিপে একটাও মাছ ধরা পড়েনি অবশ্য, কিন্তু তিনি একবার এসেছিলেন নিবারণের বাড়িতে। অল্পবয়সী ডাক্তারবাবুটি ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে গল্প করেন খুব। শান্তি আর গেন্থুই টেনে এনেছিল ডাক্তারবাবুকে। ওরা ওদের দাদুকে ভালবাসে। ক'দিন ধরে পবন খুবই অসুস্থ, কথা বলার ক্ষমতাও প্রায় নেই।

তা ডাক্তারবাবু পবনকে দেখে অনেক লম্বা লম্বা কথা বলে গিয়েছিলেন। এটা খাওয়াতে হবে, সেটা খাওয়াতে হবে। নিবারণ সে সব কথা এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বার করে দিয়েছে। তার বাপ বুড়ো হয়েছে, এবার মরবে। তা নিয়ে আর আদিখ্যেতো করার কী আছে? শীতের শেষটাতেই পুরোনো রুগীরা টপাটপ মরে। গতবারেও এই সময়ে পবন শয্যা নিয়েছিল। সেবার খুব আশা করেছিল নিবারণ যে, বাবা এবারেই যাবে। শুধু শুধু বেঁচে থেকে তো পৃথিবীর এক রত্তি উপকারে আসে না। ওমা, বুড়ো ক'দিন বাদেই হাত-পা ঝেড়ে আবার উঠে বসলো? অবশ্য, এবার আর পার পাবে না।

আজ বৃষ্টির মধ্যেও খালধারে ঝাড়া দু'ঘণ্টা নিবারণ বসেছিল গাছতলায়। যদি হঠাৎ বৃষ্টি থামে, যদি মাটিকাটা শুরু হয়। সে সময় ছাতা মাথায় দিয়ে বাঁধের ওপর দিয়ে কলে যাচ্ছিলেন ডাক্তারবাবু। নিবারণকে দেখে থামলেন। ডাক্তারবাবুটি আবার সবার সঙ্গে আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলেন। কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে তিনি নিবারণকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বাবা কেমন আছেন?

এসব জায়গায় শুধু শুধু কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, তাই নিবারণ বলেছিল, ভালো।

—আমার ওখানে একবার আসবেন। আমি কয়েকটা ওষুধ লিখে দেবো, আপনার বাবাকে একটা টনিক খাওয়ানো দরকার—

নিবারণ চুপ করেছিল।

ডাক্তারবাবু আবার বলেছিলেন, আজই আসতে পারেন। এই ধরুন ঘণ্টাখানেক বাদে। আমি তার মধ্যেই ফিরে আসবো।

সেই সময়, যেন নিবারণ নয়, তার ভেতর থেকে অন্য কেউ বলে উঠেছিল, ডাক্তারবাবু, আমরা গরীব, ভগবান আমাদের দু'বেলা পেটের ভাতও দেন নি, আমরা কি ঐ সব দামী ওষুধ খেতে পারি ?

ডাক্তারবাবুটির জোড়া ভুরু। তিনি তাঁর বড় বড় কালো দুটি চোখ নিবারণের মুখের ওপর স্থিরভাবে রেখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ছিলেন। তারপর নিজের হাতের মস্তোবড় ব্যাগটা খুলে এই ওষুধের শিশিটা নিবারণকে দিয়ে বললেন, এটা দিনে দুটো করে খাওয়াবেন। ভাত খাওয়ার পর। আজ যা হোক, কাল পরশু আমার ওখানে একবার আসুন, দেখি আমি কী ব্যবস্থা করতে পারি।

নিবারণ কোনো কথা বলছে না দেখে তিনি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, কখনো আশা ছাড়তে নেই।

তখনও নিবারণের আনন্দ হয়নি। রাগই হয়েছিল। এক এক সময় মানুষের দয়া দেখলেও রাগ হয়। ডাক্তারবাবু যদি আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বড় বড় উপদেশের কথা বলতেন, তা হলে নিশ্চয়ই নিবারণ মনে মনে তাঁকে বাপ মা তুলে গাল দিত। সহ্য হয় না, কিছুই সহ্য হয় না।

অন্ধকারে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে ওষুধের শিশিটা হাতে নিয়ে নিবারণের মুখে একটা হাসি ফুটে উঠলো, যা না-ক্রোধ, না-ঘৃণা, না-উল্লাস, না-দুঃখ, না-করুণার। সে হাসিটা অন্যরকম, বড় দুর্বোধ্য। ডাক্তারটি বললেন, ওষুধটা দু'বেলা ভাত খাওয়ার পর খাওয়াবে। ডাক্তারটা বোকা, কিছুই শেখেনি। এখন নিবারণ যদি ওষুধটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাহলে কি তার পাপ হবে ?

ওষুধটা ফেললো না নিবারণ। যাই হোক, দামী জিনিস তো। সে আবার হেঁটে চললো। মাঝারি ধারায় অবিরাম বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। এই সময় পৃথিবীতে নিবারণ ছাড়া কেউ নেই। সে তার বাড়ির দিকে যাচ্ছে। এখন পৃথিবীতে তার সবচেয়ে ঘৃণার জায়গা তার বাড়ি, তবু সে সেখানেই যাবে।

আর বেশী দূর নেই। রাস্তার মাঝখানেই খানিকটা জল জমে আছে সেইখানে নিবারণ তার পায়ের কাদা ধুয়ে নিল। তারপর সামনে তাকাতেই আঁতকে উঠলো সে।

তার বাড়ির সামনে বাতাবীলেবু গাছটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কে? বৃষ্টির মধ্যে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অন্ধকারে দেখা যায় এক প্রেত। নিবারণের প্রাণটা যেন এসে আটকে গেল তার গলার কাছে। প্রথমেই তার মনে হলো, পিছন ফিরে দৌড় দেয়। প্রেতের বুকের পাঁজরার সবকটা হাড় স্পষ্ট, কঙ্কাল-সার একটা হাত সামনে বাড়ালো। নিবারণ মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করলো, আঁ, আঁ।

প্রেতমূর্তি তখন নাকি ভাঙ্গা গলায় বললো, কেঁ নিবারণ এঁলি?

পেছন ফিরে পালাতে গিয়েও থেমে গিয়ে নিবারণ বললো, ধুর শালা!

সকালবেলাও নিবারণ যাকে দেখে গেছে বিছানার সঙ্গে একেবারে লাগা ওঠার ক্ষমতা নেই, কথা বলার শক্তি নেই, সে যে এই বৃষ্টির মধ্যে রাত্তিরে উঠে এসে বাইরে এসে দাঁড়াবে—একথা তো নিবারণ কল্পনাই করে নি। এ যে কইমাছের মতন কড়া জান! হারামীর বাচ্চা, শালা!

নিবারণ এক ধমক দিয়ে বললো, তুমি আবার বাইরে এসেছো কেন?

পবন কথা বলতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে। তার গলাও খোনা খোনা মনে হয়। সে বললো, তুই এখনো ফিরিস নি। যা বৃষ্টি বাদলা, আমি চিন্তা করছিলাম!

নিবারণ দীর্ঘশ্বাস্ ফেললো। এ যে স্পষ্ট কথা বলে। তাহলে কি এ যাত্রাতেও বেঁচে গেল? আরও কতদিন এ বোঝা বইতে হবে?

পবন জিজ্ঞেস করলো, কিছু এনেছিস!

নিবারণ বললো, কী?

—চাল-আটা কিছু আনিস নি?

—কোথা থেকে আনবো? তোমার বাপের কাছ থেকে? আজ মাটি কাটার কাজ হয়নি। আজ আমার যে-টুকু সব্বোনাশ বাকি ছিল, তাও হয়ে গেছে।

—কিছুই আনিস নি?

ট্যাঁক থেকে শিশিটা বার করে নিবারণ বললো, ওষুধ এনেছি। ডাক্তার-বাবু বিনিপয়সায় ওষুধ দিলেন তোমার জন্ম। নাতি-নাতনী দুটোকে খুব জপিয়েছো তো, তারা ডাক্তারবাবুকে ধরেছিল।

পবন ওষুধের ব্যাপারটায় কোনো গুরুত্বই না দিয়ে বললো, চাল-আটা কিছুই আনিস নি? আজ সারাদিন বাড়িতে আখা ধরে নি!

সেই মুহূর্তে নিবারণ তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করে ফেললো। সে দৃঢ় গলায় বললো, আমাদের আর এখানে কোনো আশা নেই। কাল চলে যাবো। টাউনে গিয়ে রেল ইস্টেশনে ভিক্ষে করে খাবো।

পবন খুব উৎসাহের সঙ্গে বললো, তাই চল্।

—তুমি যেতে পারবে?

—কেন পারবো না? একটু ধরে নিয়ে যাবি।

—যেতে পারো ভালো, না হলে তুমি বাড়ি পাহারা দেবে।

ছেলেমেয়ে দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে, বউ শুয়ে শুয়ে জেগে আছে। চোখ দুটি বিবর্ণ। সারা শরীরের মধ্যে শুধু পেট ছাড়া আর সব জায়গাতেই স্বাস্থ্যহীনতা প্রকট।

ঘরে ঢুকে নিবারণ গম্ভীরভাবে বললো, আজ কিছু আনতে পারিনি।

বউয়ের মুখে কিছু ভাবান্তর দেখা গেল না।

—ঘরে কিছু আছে?

বউ দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, না।

নিবারণ অসম্ভব জোরে চিৎকার করে বললো, নেই কেন? আমি এখন খাবো কি? কাল রাত্তিরে যে খানিকটা আটা বেঁচেছিল?

বউ একটুও উত্তেজিত হলো না। সেই রকমই মুখ ফিরিয়ে থেকে বললো, বিকেল পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, তারপর শান্তি আর গেনু জল দিয়ে গুলে সেই আটা খেয়ে ফেলেছে।

ছেঁড়া কাঁথাটা গায় দিয়ে পবন শুয়ে পড়েছিল, সে হঠাৎ উঠে বসে ছেলের পক্ষ নিয়ে আলাদা একটা দল পাকাবার চেষ্টা করলো। কুটিল চোখে সে একবার তার পুত্রবধূ, একবার তার ছেলের দিকে তাকিয়ে বললো, ত্থাখ না আমাকে পর্যন্ত একটু দেয়নি। নিজেরাই সব খেল। আমি কতবার বললাম, ও বউ, আমাকে একটু দে। আজ আমার জ্বর ছেড়েচে, আজ আমার খিদে বেশী হবে, অন্তত আমাকে ছটাক খানেক দে। কিংবা আমাকে না দিস, ছেলেটার জন্ত একটু রাখ, সারাদিন খেটেপুটে আসবে—সেকথা গ্রাহ্যই করলো না। নিজেরাই গাণ্ডেপিণ্ডে খেলে—

বউ এবার দেয়াল থেকে চোখ ফেরালো। শ্বশুরের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন সেই দৃষ্টিতেই তাকে ভস্ম করে দেবে। কনুইতে ভর দিয়ে আধা-বসা হয়ে কণ্ঠে বিষ ঝরিয়ে সে বললো, খালভরা, তোমার মরণ নেই?

একথা বলার আগে তোমার জিভ খসে গেল না? ছেলেমেয়ে দুটো খেয়েছে, আমি নিজে একটা দানাও ছুঁয়েছি? আমার পেটে একটা শত্তুর, তবু আমি কিছু খাইনি। আর তোমার নোলাটাই বড় হলো? ভারী যে ছেলের জন্য দরদ! নিজে তিনবার রান্নাঘরে গিয়ে খুটখাট করে আসো নি? ছেলের জন্য তুমি রাখতে? সব জানা আছে আমার! অলপ্পেয়ে, তুমি মরতে পারো না? মরলে আমার হাড় জুড়োয়!

পবন ছেলের দিকে চেয়ে বললো, দেখলি? দেখলি?

নিবারণ কোনো পক্ষই নিল না। তার ইচ্ছে হলো, ঘুমন্ত ছেলেমেয়ে দুটোকে জোরে জোরে লাথি কষায়, বাপকে লাথি কষায়, বউকেও। খাবার দরকার ছিল তার একার। কাল যদি ভগবান করেন বৃষ্টি বন্ধ হয়, তাহলে না-খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে সে মাটি কাটতে যাবে কী করে? সে নিজে না বাঁচলে আর কেউ বাঁচবে? সেকথা এরা কেউ বোঝে না। সকলেই রাক্ষুসে খিদে নিয়ে হাঁ করে আছে।

কালও যদি বৃষ্টি না থামে, তাহলে যেতেই হবে টাউনে। রেল ইস্টিশানে মাথা গোঁজার জায়গা জুটে যাবে। টাউনের কেউ না খেয়ে মরে না। টাউনের লোকদের ওপর ভগবানের অশেষ দয়া।

বউ তখনও গজ গজ করে যাচ্ছিল, নিবারণ প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বললো, চোপ!

দরজার বাইরে থেকে জল গড়িয়ে আসে ঘরের ভেতরে, তাই সেই জল আটকাবার জন্য দরজার কাছে একটা ন্যাতা পেতে রাখা আছে। সেই ভেজা ন্যাতাটা তুলে নিয়ে নিবারণ হাত পায়ের কাদা মুছলো। এখন এই অন্ধকারের মধ্যে তার পুকুরে যাবার ইচ্ছে নেই। ঢক ঢক করে একঘটি জল খেয়ে সে শুয়ে পড়লো।

পাশাপাশি একখানা বড় ঘর আর ছোট ঘর। মাঝখানের দরজাটা আজকাল খোলাই থাকে। ছোটঘরের জানালাটা নিশ্চয়ই খোলা রয়েছে, গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির ছাঁট আসছে এ ঘর পর্যন্ত। নিবারণ ভাবলো, তার বাপ ভিজছে। ভিজুক। আজও তো চলাফেরার ক্ষমতা রয়েছে, নিজে উঠে বন্ধ করতে পারে, না? নিবারণের গায়ে যদি বেশী ছাঁট লাগে, সে পা দিয়ে ঠেলে মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দেবে।

কোন শব্দ নেই, শুধু টিনের চালে কাকের পায়ের আওয়াজের মতন

বৃষ্টি। ছেলেমেয়ে দুটি অঘোরে ঘুমোচ্ছে, আর জাগে নি। তারপর ঘুমোয় গর্ভিণী, কিন্তু খালি পেট নিয়ে নিবারণের কিছুতেই ঘুম আসে না। আর এক অসুস্থ বৃদ্ধের তো সহজে ঘুম আসবার কথা নয়।

খানিকবাদে পবন কোঁ কোঁ শব্দ করে ওঠে।

নিবারণ জিজ্ঞেস করলো, কী হলো আবার?

পবন শ্বাস টেনে টেনে বলে, কিছু না! দু'দিন ভাত খাইনে বড় খিদে পায়।

নিবারণ ওষুধের শিশিটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, এই নাও, খাও।

পবন হাতড়ে ওষুধের শিশিটা খুঁজে নেয়। তারপর সত্যি সত্যি সবকটা ক্যাপসুলই মুখে পুরে চিবোতে থাকে। খচর মচর শব্দ হয়।

একটু পরে সে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, উফ্। কতদিন তামাক খাই না। বউয়ের কাছে একটু আগুন চাইলাম, দিল না।

—তুমি চুপ করবে?

বুড়ো চুপ করে যায়, তবু মুখ থেকে চাপা কোঁ কোঁ শব্দ বেরোয় নিশ্বাসের সঙ্গে।

তারপর আরও অনেকক্ষণ বাদে, তখনও নিবারণ ঘুমোয়নি, জানালা দিয়ে একফালি আলো ঢুকে দেওয়ালের গায়ে দু-এক পলক কাঁপে, আবার মিলিয়ে যায়। কিছু দূরে শোনা যায় ক্ষীণ রুনুঝুনু শব্দ।

নিবারণ কান খাড়া করে থাকে। ওরা আসছে। আশ্চর্য, এই বৃষ্টি বাদলার মধ্যেও বেরিয়েছে ওরা? নিবারণের পেটের মধ্যে ধিকি ধিকি করে জ্বলে অহেতুক রাগ। ওদের পকেটে টাকা আছে, গায়ে শক্তি আছে, তাই ওরা এইসব আমোদ আহ্লাদ করতে পারে। ওরা নিবারণের মতন লোকদের আরও কষ্ট দেবার জন্য আসে। কান-কাটা সুরেন্দ্রটা মরে না কেন? কত লোক বে-ঘোরে মরে, ওর মরণ হয় না?

ওরা পাঁচলার মোড়ে গাছতলায় এসে পৌঁছে গেছে মনে হয়। ঘুঙুরের শব্দের সঙ্গে ভেসে আসে টুকরো টুকরো গান:

ভূতের নাতি ভূতের পুতি······বুড়ো হাবড়া ছোঁড়াছুঁড়ি
যেমন তেমন ভূত পেলে ভাই······
ভূত কিনিতে, ও ভাই ভূত কিনিতে······
শ'টাকা শ'টাকা······

এক এক ভূত এক এক শো টাকা······

পবন দু'বার কেশে ওঠে। বোঝা যায় সেও জেগে আছে। নিবারণ জিজ্ঞেস করে, বাবা, ও বাবা ? তোমার কষ্ট হচ্ছে ?

পবন বলে, না।

—বাবা, তুমি ভূত দেখছো কখনো, সত্যি করে কও তো।

—হ্যাঁ, দেখেছি। অনেকবার দেখেছি।

—কারা ম'লে ভূত হয় ? সকলেই ম'লে ভূত হয় ?

—যারা অপঘাতে মরে, মরার পরেও যাদের আহিকে থেকে যায়।

নিবারণ হঠাৎ উঠে পড়ে দরজার কাছে দাঁড়ায়। অন্ধকারের মধ্যে আরও গাঢ়তর অন্ধকার হয়ে দেখা যায় তার শরীরটা।

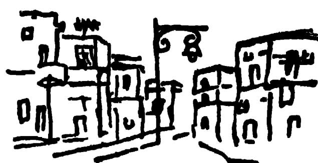
পবন জিজ্ঞেস করে, ওঠলি যে ? বাইরে যাবি ?

নিবারণ বললো, না। বাবা তুমি ম'লে······

পবন বলে, হ্যাঁ, আমি ভূত হবো নিশ্চয়! সে কি আর তোকে বলতে হবে······নাতি নাতনী দুটোর মুখ চেয়েও······সুরেন্দ্রকে ডেকে আনিস··· আমি বোতলে ঢুকে যাবো, তুই একশো টাকা······

তারপরই চিৎকার ও কান্না মিশিয়ে সে বলে ওঠে, ও বাবা নেবারণ, আমাকে মারিস না, আর দুটো দিন অন্তত বাঁচতে দে, আমি দুটো দিন, একটু গরম গরম ভাত দিস, দুটো দিন একটু পেট ভরে খেয়ে যাই, এক ছিলিম তামাক, ও বাবা নেবারণ, তোর পায়ে পড়ি, আর দুটো দিন, একটু গরম ভাত, তোর পায়ে পড়ি, ও বাবা নেবারণ, আর দুটো দিন···

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



পটুয়া নিবারণ

আমাদের নিবারণ কর্মকার ছিলেন আঁকিয়ে মানুষ। লোকে বলত বটে পটুয়া নিবারণ—কিন্তু তাঁর ছবি-টবি কেউ কিছু বুঝতো না। সেই অর্থে পট-টট কখনো আঁকেননি নিবারণ কর্মকার। যদিও ঠিক পটুয়া ছিলেন না নিবারণ, তবু তাঁর আঁকার ধরন ধারণ ছিল অনেকটা পটুয়াদের মতোই। তুলির টান, রঙের মিশ্রণ—সব কিছুই ছিল সেই পুরোনো ধরনের। শুধু বিষয়বস্তুতেই তাঁর নতুনত্ব কিংবা মতান্তরে নির্বুদ্ধিতা ধরা পড়ত। আমি তাঁর আঁকা একখানা বাঘের ছবি দেখেছিলাম যার পেটটা ছিল কাচের মতো স্বচ্ছ, আর সেই পেটের ভিতরে দেখা যাচ্ছে একটি গর্ভবতী মেয়ে শুয়ে আছে—বাঘের পাকস্থলীর ওপর তার মাথা, বাঘের হৃৎপিণ্ডের ওপর তার পা, বিরাট ঢাউস পেটটা বাঘের মেরুদণ্ড পর্যন্ত ফুলে আছে, আর মেয়েটির সেই পেটের প্রায় স্বচ্ছ চামড়ার ভিতর দিয়ে কোষবদ্ধ প্রায়-পরিণত ভ্রূণটিকেও দে... যাচ্ছে। মেয়েটি ও ভ্রূণ এই দুইজনের মুখেই নির্লিপ্ত, নির্বিকার হাসি। সব মিলিয়ে দেখলে কিন্তু বাঘটার জন্যই দুঃখ হয়। তার গোঁফ ঝুলে গেছে, অকালবার্দ্ধক্যে তার চোখ কোটরগত ও হিংস্রতাশূন্য। ছবির নীচে লেখা 'গর্ভবতী নারীকে ভক্ষণ করিয়াছ, এখন কেমন মজা?'

'পাপের পরিণাম' সিরিজে যে কখানা ছবি এঁকেছিলেন নিবারণ কর্মকার, বাঘের ছবিটা ছিল তার দ্বিতীয় ছবি। সবগুলো ছবি আমি দেখিনি, কিন্তু যে কয়েকটা দেখেছি তার প্রতিটিই ছিল খানিকটা হিংস্র প্রকৃতির ছবি। যেমন মনে পড়ে একটি ছবিতে একটি অতিকায় বানর একটি কুমারী কন্যার সতীত্ব হরণ করছে—এমনি একটা বিষয়বস্তু এঁকেছিলেন পটুয়া নিবারণ। নীচে লেখা 'স্বদেহীর প্রত্যাবর্তন ও নির্বিকার কাম-অভ্যাস।'

আমাদের নিশিদারোগার মেয়ে শেফালীর একবার অসুখ হল। শক্ত ব্যামো। হরি ডাক্তার এসে বলে গেল 'সর্বনাশ! এ মেয়ে বাঁচলে হয়! অসুখ শরীরে যতটা, মনেও ততটা। মন ভাল রাখা চাই। ওকে কখনো কনো অভাব দুঃখ কষ্টের কথা বলা বারণ, কোনো মৃত্যুর খবর দেওয়া বারণ। আর ও যা চায় ওকে তাই দিন।'

তাই হ'ল। শেফালীর ঘর থেকে ধুলো ময়লা, কালো ঝুল, পিকদানী, ইঁদুর আরশোলা দূর করে দেওয়া হ'ল, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল কালো বেড়ালটাকে। তারপর ডাক পড়ল পটুয়া নিবারণের। মন ভাল থাকে এমন ছবি এঁকে টাঙিয়ে দিতে হবে ঘরের দেয়ালে।

পট এঁকেছিলেন নিবারন। খুব পরিশ্রম করেই এঁকেছিলেন। একটা ছবিতে ছিল নদীর তীরে একপাল বাচ্চা ছেলেমেয়ে পরস্পরের মুণ্ড খেলাচ্ছলে কেড়ে নিয়ে এর মুণ্ড ওর ঘাড়ে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে; কারো মুণ্ডই যথাস্থানে নেই, এর মুণ্ড ওর হাতে, ওর মুণ্ড এর হাতে রয়েছে; আর সেই কবন্ধ ছেলেমেয়েদের দেহগুলি নিরানন্দ ও কঙ্কালসার। ছবির নাম দেওয়া ছিল 'একের মুণ্ড অন্যের ঘাড়ে চাপাইবার পরিণাম।' 'রাক্ষসীর প্রসব' নামে আর একটা ছবিতে ছিল এক বিকট দর্শন রাক্ষসী তার সদ্যজাত সন্তানকে বৃক্ষচ্যুত ফলের মতো বহস্তে ধারণ করছে, আশেপাশে ইতস্তত কয়েকটা রাক্ষস-শিশুর কঙ্কাল পড়ে আছে। স্পষ্টই বোঝা যায় রাক্ষসী ইতিপূর্বে তার পূর্বজাত সন্তানদের ভক্ষণ করেছে এবং আশু সন্তান-ভক্ষণের আনন্দে তার মুখ লোল, চোখ উজ্জ্বল।

এই সব ছবি দেখার ফলেই হোক কিংবা অন্য কোনো কারণেই হোক হরি ডাক্তারের সমস্ত চেষ্টা বিফল করে নিশি দারোগার মেয়ে শেফালী একদিন টুক করে মরে গেল। যতদূর জানা যায় বিকট ছবি এঁকে দারোগার মেয়ের মনে ভীতি উৎপাদনের অপরাধে গোপনে নিবারণের ওপর কিছু অত্যাচার হয়েছিল।

তাইতেই মনমরা হয়ে গেলেন পটুয়া নিবারণ। কেননা ছবি-আঁকা ছিল তাঁর প্রাণ। ছবিতেই কথা বলতে চাইতেন নিবারণ, সংসারের নানারকম মারকে ছবি দিয়েই ঠেকাতে চাইতেন। ছবি-আঁকা ছাড়া আর কিছুই শেখেননি তিনি। নিশি দারোগা তাঁর সেই ছবি-আঁকা প্রায় বন্ধ করে দেবার জোগাড় করলেন। কেননা কথা ছিল শেফালীর ঘরে গাছপালা, লতা, ফুল,

পাখীর ছবি এঁকে দেবেন নিবারণ, যাতে ঘরে বসেও শেফালীর মনে হবে যে তার চারদিকে গাছপালা লতা ফুল পাখী মেঘ ও বাতাস রয়েছে—প্রকৃতি-টকৃতির ভিতরেই রয়েছে সে—এবং এইভাবে এক জটিল মানসিক প্রক্রিয়ায় কিছুকাল প্রকৃতি-ভক্ষণ করলে শেফালীর রোগের উপশম হতে পারত। অন্তত হরি ডাক্তারের এই রকমই ধারণা ছিল।

এদিকে নিবারণের বয়স হয়ে এসেছিল। ছবির দিকেও ভাঁটা পড়ছিল। কেননা জনশ্রুতি শোনা গেল পটুয়া নিবারণের যাবতীয় শিল্পকর্ম তাঁকেই আক্রমণ করতে শুরু করেছে। ভয়ে তিনি ঘরে ঢুকতে পারেন না। স্বপ্নের ভিতরেও তিনি স্বচ্ছ পেটওয়ালা বাঘ, মুণ্ডহীন ছেলেমেয়ে ও দারোগার কঙ্কাল-ভক্ষণ দেখতে শুরু করেছেন। তাঁর ক্রমশ বিশ্বাস হচ্ছিল একদিন এরা সবাই ছবি ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এবং রুগ্ন অশক্ত ও বৃদ্ধ অবস্থার কোনো সুযোগে তাঁকে আক্রমণ করবে। সুতরাং কয়েকদিন তিনি সুন্দর ও স্বাভাবিক কিছু আঁকবার চেষ্টা করে দেখলেন—ছবি ছেড়ে বেরিয়ে এলেও যা তাঁর খুব বেশী ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু কিছুই আঁকতে পারলেন না। এই সময়ে তিনি শক্ত সমর্থ একজন সঙ্গী খুঁজছিলেন—যে তাঁকে তাঁর শিল্পকর্মের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। আর ছবি-আঁকা ভুলবার জন্ত তিনি অন্তদিকে মন দিলেন। কখনো দেখা যেতে লাগলো নিবারণ উঠোনের মাটি কোপাচ্ছেন, নয়ত ছাঁচতলা থেকে কন্টিকারির ঝোপ টেনে তুলে সাফ করছেন। যদিও বিয়ে করেননি, তবু মনে হচ্ছিল, সংসারে মন দিয়েছেন পটুয়া নিবারণ। এইবার হয়ত বিয়ে করবেন।

করলেনও।

মিস্ কে. নন্দীর নামডাক আজকাল আর শোনা যায় না। শোনবার কথাও নয়। তিনি যে সব খেলা দেখাতেন, আজকাল আর তা চলে না। কিন্তু আমাদের আমলে সেই সব খেলা দেখিয়েই দারুণ নাম হয়েছিল মিস্ কে. নন্দীর। 'প্রবর্তক সার্কাস' যখন নানা জায়গায় ঘুরছিল তখনই মুখে মুখে অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন সর্বভুক মহিলা মিস্ কে. নন্দীর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। মনে পড়ে মিস্ কে. নন্দীর জন্ত প্রবর্তক সার্কাসে একটা আলাদা তাঁবু ছিল—যার চারিদিকে সারাদিন ভিড় লেগে থাকত। সার্কাসের খেলা

আরম্ভ হ'লে এই তাঁবু থেকেই একটা চাকাওয়ালা খাঁচায় মিস্ কে. নন্দীকে নিয়ে আসা হ'ত রিংয়ের পাশে। হৈ হৈ পড়ে যেত চারদিকে। কিন্তু মিস্ কে. নন্দীকে দেখা যেতনা—খাঁচার চারপাশে কালো পর্দা ফেলা। ওর ভিতরে বাস্তবিক কে. নন্দী আছেন কিনা বা থাকলেও কি করছেন কিছুই বুঝবার উপায় ছিল না। এদিকে ক্রমে ট্রাপিজের খেলা, দড়ির ওপর নাচ, ভৌতিক চক্ষু এবং বাঘ সিংহের খেলা শেষ হয়ে আসত। তারপর একজন স্যুট টাই পরা লোক পর্দা সরিয়ে একটা গোপন দরজা দিয়ে খাঁচার ভিতরে ঢুকে যেত। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে বলত 'অলরাইট।' দু-তিনজন লোক সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার ওপর থেকে পর্দা সরিয়ে নিত। হাততালিতে কান পাতা দায় হ'ত তখন। আর তখন দেখা যেত মিস্ কে. নন্দীকে। প্রকাণ্ড নয়, বরং রোগাই বলা যায় কে. নন্দীকে। রং কালো। পরণে গোলাপী রঙের সাটিনের হাফ্ প্যাণ্ট, বুকে কাঁচুলি—সেও গোলাপী রঙের সাটিনের। মাথায় চুল ঝুঁটি করে ওপরে বাঁধা, চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপষ্টিক, পায়ে গোলাপী মোজা, গোলাপী জুতো। কাঠের একখানা ঝকঝকে চেয়ারে নিশ্চল বসে থাকতেন মিস্ কে. নন্দী—আধবোঁজা চোখ, মুখে একটু হাসি। হঠাৎ মনে হয় ঘুমিয়ে আছেন, নয়ত' সম্মোহিত করে রাখা হয়েছে তাঁকে। একটা মুর্গীকে সেই সময়ে ছেড়ে দেওয়া হ'ত খাঁচার ভিতরে—কোক্কর কোঁ করে সেটা ডাকতে থাকত। আর, সেই ম্যানেজার গোছের লোকটা মিস্ কে. নন্দীকে ডাকতে থাকত, উত্তেজিত করত, হাতের লম্বা সরু লাঠিটা দিয়ে সজোরে খোঁচা মারত, কে. নন্দীর পেটে, কোমরে। অবশেষে হঠাৎ কে. নন্দী রক্তবর্ণ একজোড়া চোখ খুলতেন, চারিদিকে তাকিয়ে দেখতেন, তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতেন। আর একবার হাততালি পড়ত। সম্ভবত ঐ শব্দেই ক্ষেপে যেতেন মিস্ কে. নন্দী। মুর্গীটার সঙ্গে তার প্রাণপণ লড়াই শুরু হয়ে যেত—এই প্রাণান্তকর পাখা ঝাপটানোর শব্দ, মুর্গীর অস্ফুট ডাক, আর কে. নন্দীর দাঁত কড়মড় করবার শব্দে আমাদের গায়ের রোমকূপ শিউরে উঠত। মুর্গীটা ধরা পড়ত অবশেষে—ততক্ষণে মিস্ কে. নন্দীর কোশলে-বাঁধা চুল খুলে পিঠময় মুখময় ছড়িয়ে পড়েছে—ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তাঁকে। প্রথমেই দুহাতে টেনে মুর্গীর মুণ্ডটাকে ছিঁড়তেন কে. নন্দী—মুর্গীটার গলা থেকে হঠাৎ হঠাৎ শ্বাস নির্গত হতে থাকত বলে তখনো তার অস্ফুট ডাক শোনা যেত। পট্ করে ছিঁড়ে যেত গলাটা—মুণ্ডুটা ছুঁড়ে ফেলে কে. নন্দী ধড়টাকে দু'হাতে

ধরতেন—কাটা গলাটা মুখের কাছে নিয়ে ডাবের জল খাওয়ার ভঙ্গীতে রক্তপান করতেন মিস্ কে. নন্দী। তখন কষ বেয়ে, গোলাপী কঁচুলি বেয়ে, তলপেট থেকে চুঁইয়ে গোলাপী জুতো পর্যন্ত নেমে আসত রক্তের কয়েকটা ধারা। তারপর মুর্গীটাকে খেতে শুরু করতেন—দু,হাতে পালক ছাড়াচ্ছেন আর ভিতরের মাংসের জঙ্গলে কামড় বস'চ্ছেন—এ দৃশ্যের কোথাও শিল্প ছিল কিনা বলতে পারিনা।

মুর্গী খাওয়া হয়ে গেলে রক্তমাখা দেহে মুর্গীর পালক, নাড়ীভূঁড়ি ইত্যাদি ভুক্তাবশিষ্টের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারী করতেন মিস কে. নন্দী। তখনো তাঁর অভিনয় কেউ ধরতে পারত না। এই সময়ে একটা সাপের ঝাঁপি সেই খাঁচার ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ত। স্যুট পরা ম্যানেজার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতেন 'লেডী গণপতি দেখ্-উ উ-ন্-ন্—'। তার অবাঙালী টানের কথাটা বিটকেল শোনাত। দেখা যেত ঝাঁপির চারধারে কে. নন্দী লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন, আর ম্যানেজার হাতের সরু সাদা লাঠিটা খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে ঝাঁপির ঢাকনাটা খুলে দিতেই ছিটকে উঠত সাপ। পেখমের মতো ফণা মেলে দিয়ে কে. নন্দীর দিকে তাকাত। প্রথমটায় ভয় পাওয়ার ভাণ করতেন তিনি—কয়েক পা পিছিয়ে যেতেন। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে হাত বাড়িয়ে দিতেন সাপের দিকে। সাপ ততক্ষণে ঝাঁপি ছেড়ে খানিকটা নেমে এসেছে—ছোবল দিতেই হাত সরিয়ে নিতেন কে. নন্দী। সারা তাঁবুতে শুধু দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যেত তখন। দ্বিতীয় ছোবলের মুখেই সাপের গলাটা চেপে ধরতেন—আর সারা হাত জুড়ে লিক্ লিক্ করে উঠত সাপ, কিল্‌বিল্ করে জড়িয়ে ধরত তাঁর হাত। অনেকক্ষণ সময় নিতেন কে. নন্দী। খুব আস্তে আস্তে হাতটাকে মুখের কাছে নিয়ে আসতেন—যেন সাপের ঠোঁটে চুমু খাবেন তিনি। এই সময়ে তাঁর শিল্পকর্ম বোঝা যেত—ভঙ্গীতে কোমলতা ফুটিয়ে তুলতেন, তাঁর চোখেমুখে বন্ধ হরিণের সরল কৌতুহল ফুটে উঠত। পরমুহূর্তেই প্রকাণ্ড হাঁ করলে তাঁর রক্তাক্ত মুখাভ্যন্তর দেখে বাচ্চা ছেলেরা ভয়ে চীৎকার করে উঠত, আমরা চোখ বুজে ফেলতাম। ঐ টুকুই ছিল কৌশল। হয়ত চোখ চেয়ে ঠিক মতো দেখলে দেখা যেতো বাস্তবিক সাপের মুণ্ডটা'কে খাচ্ছেন না তিনি। পরমুহূর্তেই চোখ চেয়ে দেখা যেত; মুণ্ডহীন সাপের দেহ একখণ্ড দড়ির মতো ঝুলছে, আর সাপের মুড়োটা আরামে চিবোচ্ছেন মিস্ কে. নন্দী।

বাইরে থেকে বোঝা যেতনা, কিন্তু কে জানে, হয়ত' ঐ জীবন মিস্ কে.

নন্দীর আর ভাল লাগাছিল না। তাঁর খেলার মধ্যে অনেকটাই অভিনয় ছিল সত্য, কিন্তু কেন যেন সন্দেহ হ'ত ম্যানেজারের লাঠির খোঁচাটা ওর মধ্যেই ছিল খাঁটি। কেননা যখন চেয়ারে এলিয়ে না-ঘুম না-সম্মোহনের ভিতরে থাকতেন কে. নন্দী তখন মনে হ'ত তিনি বড়ই ক্লান্ত। মানুষের স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাসে প্রত্যাবর্তন করতে না পারায় সেই ক্লান্তিকে দূর করতে যখন কে. নন্দীকে ম্যানেজার সেই সরু লাঠির ডগায় খোঁচা দিতেন, তখন মিস্ কে. নন্দীর জন্য আমি আমার যৌবনে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম।

মিস্ কে নন্দীর নামডাক এখন আর থাকবার কথা নয়। কেননা সময় পাল্টে যাচ্ছিল। মানুষ আর পুরোনো ধরনের খেলা পছন্দ করছিল না। ধীরে ধীরে প্রবর্তক সার্কাসের অবস্থাও খারাপ হয়ে এল।

অবশেষে একদিন সব গোলমাল করে দিলেন মিস্ কে. নন্দী। ম্যানেজারের ডাক, অনুনয়, লাঠির খোঁচা নিঃশব্দে হজম করে তিনি আধখোলা চোখে নিশ্চল বসে রইলেন। মুর্গীটা খাঁচার ভিতরে দাপিয়ে বেড়া'লো। উপায় না দেখে ম্যানেজার সাপের ঝাঁপিটাও ঢুকিয়ে দিলেন খাঁচার মধ্যে। ঢাকনাটাও খুলে দেওয়া হল। সাপটা ফণা মেলে লাফিয়ে উঠল, মুর্গীটা খাঁচার ছাদে পা আটকে রেখে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল। আর ঠিক এই সময়ে তাঁবু ভর্তি লোককে স্তম্ভিত করে দিয়ে হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন কে. নন্দী। খেলা ভেঙে গেল।

কিন্তু মাত্র একদিনের জন্যই। তারপর থেকে মিস্ কে. নন্দী আবার খেলা দেখাতে শুরু করলেন। কিন্তু ঐ একদিনেই তাঁর বাজার নষ্ট হযে গিয়েছিল, লোকে ধরে ফেলেছিল মিস্ কে. নন্দীকে। আর ভিড় জমল না। কে. নন্দীর খেলা শুরু হওয়ার আগেই তাঁবু ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল। অবশেষে সার্কাস থেকে তাঁকে বিদায় দেওয়ার সময় হয়ে এল।

আমাদের পটুয়া নিবারণ এই সময়েই একজন মজবুত সঙ্গী খুঁজছিলেন—যে তাঁকে তাঁর শিল্পের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। প্রবর্তক সার্কাসের ম্যানেজারের কাছে একদিন দরবার করলেন নিবারণ, কিছু টাকাপয়সা দিয়ে কে. নন্দীকে ছাড়িয়ে আনলেন, তারপর একেবারে বিয়ে করে ঘরে তুললেন।

এই সময়ে আমি একদিন নিবারণ কর্মকারের সঙ্গে দেখা করতে যাই। একখানা ছবির সামনে নিবারণ কর্মকার বসেছিলেন। আমাকে দেখে

সম্ভবত বিরক্ত হলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ আমরা মুখোমুখী চুপচাপ বসে রইলাম। কিছুই বলার ছিলনা। নিবারণ তাঁর ডান হাতটা চোখের সামনে ধরে মনোযোগ দিয়ে কিছু লক্ষ্য করছিলেন। মনে হল তিনি তাঁর ভাগ্যরেখা ও রবিরেখা মিলিয়ে দেখছেন। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন 'আমার দুটো আঙুল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!'

আমি কিছু না বুঝে প্রশ্ন করলাম 'কোন আঙুল!'

উনি ওঁর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী আমায় দেখালেন 'কিছু বুঝতে পারছেন?'

আমি বললাম 'না।'

'আমিও বুঝতে পারছিনা ব্যাপারটা। কিন্তু আঙুল দুটো ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে।'

আমি আঙুল দুটো দেখলাম। স্বাভাবিক বলেই মনে হ'ল। রোগটা ওঁর মানসিক সন্দেহ করে আমি বললাম 'শুনেছিলাম আপনি ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছেন! আর আঁকছেন না!'

'ছেড়ে দিইনি। তবে দেব।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিবারণ 'আঙুল দুটোর জন্যেই ছেড়ে দিতে হবে।'

আমি চুপ করে রইলাম। উনি নিজেই বললেন 'এখন থেকে খেত-খামারের কাজ করব ভাবছি।'

আমি ওঁর সামনের সদ্য-আঁকা ছবিটা দেখছিলাম। পালঙ্কের ওপর মিথুনবদ্ধ নগ্ন নর-নারীর ছবি এঁকেছেন তিনি; আর দেখা যাচ্ছে একটা সাপ পালঙ্কের শিয়রে ফণা তুলে পুরুষটিকে দংশন করতে উদ্যত, মেয়েটি সাপটাকে দেখছে—অথচ কিছুই করছে না; তার চোখ সম্পূর্ণ নির্বিকার। কিংবা এও হতে পারে যে মিথুন তখন এমন পর্যায়ে যে বাধা দিলে তার মাধুর্য নষ্ট হয়—তাই মেয়েটি যা অমোঘ, যা নিয়তি তাকে মেনে নিচ্ছে।

হঠাৎ খুক্ খুক্ করে হাসলেন নিবারণ। আমি উঠে পড়লাম।

চলে আসবার সময় কে. নন্দীকে দেখা গেল—ঘোমটা মাথায় সারা বাড়ী ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছেন। মনে হ'ল সম্মোহন কেটে গেছে—সেই আধোঘুম ও অর্ধস্বপ্ন থেকে ম্যানেজারের লাঠির খোঁচায় জেগে উঠেই অমানুষিক খাদ্য-বস্তুর সম্মুখীন হতে হচ্ছে না বলে তিনি বোধ হয় সুখী। কিংবা কে জানে—আমার দেখার ভিতরে ভুলও থাকতে পারে।

গ্রামে জনশ্রুতি ছিল, নানা রকম গল্প প্রচলিত হচ্ছিল। কিন্তু সার্কাসের সর্বভুক মহিলা'র সঙ্গে পটুয়ার যৌথ জীবন ঠিক কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়াল তা বোঝা যাচ্ছিল না। কেননা, নিবারণ আমাদের আর ডাকতেন না, গেলে বিরক্ত হতেন। কে. নন্দীও পাঁচজনের সামনে কদাচিৎ বের হতেন। ক্রমশ বাইরের জগৎ থেকে দু'জনেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন। এক রকম ভাবে তাঁরা আর পাঁচজনের মনোযোগ থেকে আত্মরক্ষা করে রইলেন।

দীর্ঘদিন পর আমাকে আর একবার ডেকে পাঠালেন নিবারণ। গিয়ে দেখি আঁকবার ঘরে চুপচাপ বসে আছেন নিবারণ। আমি যেতেই প্রশ্ন করলেন 'আমার স্ত্রীকে আপনি চিনতেন?'

থতমত খেয়ে উত্তর দিলাম 'ঠিক কি বলছেন বুঝতে পারছি না। তবে মিস্ কে. নন্দীকে আমরা অনেকেই দেখেছি।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে উনি ডাকিনী কিংবা পিশাচ-সিদ্ধ?'

'না।'

'তবে?'

'তবে কি?'

খুব চিন্তিত দেখাল নিবারণকে। কুঞ্চিত কপালে ছোট চোখে উনি ওঁর চারদিকে স্তূপাকৃতি পটগুলোর দিকে চেয়ে দেখছিলেন। সেই চেয়ে-দেখার ভিতর খানিকটা ভয়ের ভাব ছিল। শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে উনি বললেন 'কুসুম সার্কাসে যা করত তাকে লোকে কি বলে! সেটা কি শিল্প, না খেলা?'

'কে কুসুম?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কুসুম মানে—' হতচকিত হয়ে উত্তর দিলেন নিবারণ—'আমার স্ত্রী।'

'কে. নন্দী?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়লেন নিবারণ 'আমার সন্দেহ ছিল কাঁচা মুর্গী ও সাপের মাথা খাওয়ার ভিতর কোনো শিল্প নেই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখন আমার মনে হয় ধারণাটা ভুল।'

আমি কিছু না বুঝে চুপ করে রইলাম।

নিবারণ বললেন 'সার্কাসে আপনারা কুসুমকে দেখেছেন, আমি দেখিনি। আমি ওর কথা শুনেছিলাম, ওকে বলা হত পিশাচ-মহিলা।' আবার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন নিবারণ 'কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন?'

'কি ?'

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিবারণ। আর কোনো কথা বললেন না। দেখলাম উনি স্থির দৃষ্টিতে নিজের ডান হাতের দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ বললেন 'আমি কুসুমকে বুঝবার চেষ্টা করছি।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন 'হয়ত একটা জীবন সময় অনেক কিছুর জন্যই যথেষ্ট নয়।'

নিবারণ কর্মকার সামান্য পটুয়া—তাঁর চিন্তায় কিছু উদ্ভট ব্যাপার ছিল—এইটুকুই আমরা জানতাম। সব মিলিয়ে মানুষটা আমাদের কাছে ছিল মজার। কিন্তু এখন কেমন সন্দেহ হ'ল—নিবারণের গলার স্বরে, চোখের চাউনীতে অন্যরকম কিছু প্রকাশ পাচ্ছে। হঠাৎ উঠে গেলেন নিবারণ, দরজার বাইরে মুখ বার করে কি দেখে নিলেন, ফিরে এসে নিজে ডান হাতের দিকে পূর্ববৎ চেয়ে থেকে নীচু গলায় বললেন, 'কিছুদিন আগে এক দুপুরবেলা দেখি কুসুম ছাঁচবেড়ার ওপর এসে বসা একটা মোরগের দিকে স্থির চোখে চেয়ে আছে। আমি ওকে ডাকলাম, সাড়া দিল না।' একটু চুপ করে থেকে বললেন 'আপনার কি মনে হয় ?'

আমি মাথা নাড়লাম—জানি না।

নিবারণ বললেন 'আমার মনে হয় স্বাভাবিক মানুষ যা খায়—তা খেয়ে কুসুমের তৃপ্তি হয়না। এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলতে পারেন ?'

আমি আবার মাথা নাড়লাম— না। আমার গা শিউরে উঠছিল।

নিবারণ বললেন 'একদিন আমি ওর খেলা দেখতে চাইলাম। এ প্রথমে রাজী হ'ল না। বলল—সার্কাসে যা দেখাত তার সবটাই ছিল কৌশল। কিন্তু আমার সন্দেহ ছিল। অবশেষে একদিন আমার সাধ্য সাধনায় রাজী হল। গভীর রাত্রে আমার সামনে একটা মুর্গী কাঁচা খেল ও। সে দৃশ্য বড় ভয়ঙ্কর।' বললেন নিবারণ কর্মকার—তাঁর মুখচোখে ভয় ফুটে উঠছিল—যেন চোখের সামনে গভীর রাত্রে একা এক পিশাচ-মহিলার সামনে বসে থাকার সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে এখনো তাড়া করছে। একটু দম নিয়ে বললেন 'কল্পনা করুন ঘরের বৌ যাকে খুব চিনি জানি বলে মনে হয়—হঠাৎ গভীর রাতে তার চেহারা ও স্বভাব বদলে যেতে দেখলে কি মনে হয় !'

আমার কিছুই বলার ছিল না। চুপ করে রইলাম।

/ নিবারণ বলল 'কিন্তু ভেবে দেখলে এ ব্যাপারে বোধহয় ভয়ঙ্কর কিছু নেই।' বলেই খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন নিবারণ, তারপর প্রায় আপন মনে বললেন 'ছবি আঁকার সঙ্গে এর তফাৎ কি? আমি ভেবে দেখছি—অভ্যাস না কৌশল না অসুখ—কোনটা?' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন নিবারণ, আবার নিজের ডান হাতের সন্দেহজনক দুটো আঙুলের দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ বললেন 'আপনার কি মনে হয় যে এ ব্যাপারে ওর কিছুই করবার নেই?'

'কি রকম?' আমি প্রশ্ন করি।

হাসলেন নিবারণ কর্মকার 'যেমন ছবির ব্যাপারে আমার কিছুই করবার ছিল না। নিশি দারোগার মেয়েব ঘটনাটা ভেবে দেখুন।'

'দেখব।' বললাম। কেমন সন্দেহ হ'ল নিবারণের মাথায় কোনো অদ্ভুত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কেননা হঠাৎ এক সময়ে বললেন 'আমার আঙুলগুলো ত' নষ্টই হয়ে যাচ্ছে—'একটু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন 'কুসুমকে বলে দেখব, যদি ও আমার ছবি-আঁকার আঙুল দুটো খেয়ে ফেলতে পারে।' বলেই পুরানো ধরনের খিক্ খিক্ হাসি হাসলেন নিবারণ। হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন 'আপনারা কুসুমকে ভয় করেন, না?'

আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। পাগল আর কাকে বলে! যখন চলে আসি তখনো নিবারণ বিড়বিড় করে যা বলেছিলেন তার অর্থ—ওঁর ছবি-আঁকার আঙুলগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

আমরা ভেবেছিলাম মিস্ কে. নন্দী দেবীচৌধুরানীর মতো প্রফুল্লে রূপান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা যা বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয় কোথাও কোনো গোলমাল থেকে গেল।

এদিকে গাঁয়ের লোকেরা কে. নন্দী কিংবা নিবারণ কারুরই এই গাঁয়ে থাকা পছন্দ করছিল না। তারা বলে বেড়াচ্ছিল কে. নন্দী এবার তাঁর শেষ খেলা দেখাবেন। তিনি বড়ই উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্না মহিলা—সাপ মুর্গীর পর এবার তিনি আরো বড় কিছুর জন্য হাঁ করেছেন। নিবারণের বিপদ ঘনিয়ে এল বলে। মনে হচ্ছিল কে. নন্দীর সেই শেষ খেলাটা দেখার জন্য অনেকেই অপেক্ষা করছে।

ছবি-আঁকা ছেড়েই দিলেন নিরবাণ। ঘর থেকে বড় একটা বেরোতেন না। কিন্তু তাঁর ভিতরে যে একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে একদিন তার প্রমাণ

পাওয়া গেল। গাজনের বাজনা শুনে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ঘর ছেড়ে বেরোলেন তিনি। ডেকে উঠলেন—হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করলেন এবং এই সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত রক্তাক্ত শরীরে অবশেষে বুড়ো শিবতলার বটগাছের নীচে লুটিয়ে পড়লেন। কে. নন্দীর সেবা-যত্নে তাঁর শরীর ক্রমশ সুস্থ হ'ল, কিন্তু রোখ কমল না। পথে পথে ঘুরে বেড়ান আর বুড়ো বাচ্চা সকলকেই ডেকে তাঁর ডানহাতটা দেখান 'দ্যাখো তো, আমার আঙুলগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেন ?'

এই সময়ে একদিন রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কষ্টে চিনতে পারলেন আমায়। বললেন 'শুনেছেন কিছু ? নিশি দারোগা বলে পাঠিয়েছে যে কুসুমকে ত্যাগ করতে হবে। আশ্চর্য !'

আমি কিছু বললাম না। নিবারণের পিঠে হাত রাখলাম। নিবারণ নিজেই বলে চললেন 'কুসুম চলে গেলে আমার আঁকার কি হবে !'

'আপনি আবার আঁকছেন ?

'না।' মাথা নাড়লেন নিবারণ 'আমার আঙুলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন 'কিন্তু কুসুমকে আপনারা ভয় পান কেন ? আমি তো দেখেছি কুসুম সার্কাসে যা করত তাও একটা খেলা। ছবি আঁকা যেমন খেলা, ঠিক তেমনি। কিন্তু মুস্কিল—আমরা কেউই অভ্যাস ছাড়তে পারছি না।' বলেই হঠাৎ হা হা করে হাসলেন নিবারণ 'কয়েকদিন আগে আমি একটা পায়রা মারলাম। তারপর ঘাড় মটকে সেটার গলার নলীর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে গম্ভীর হয়ে বললেন 'মুখ দিতে প্রবৃত্তি হ'ল না। কিন্তু দেখবেন, চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই।'

কয়েকদিন পর নিবারণকে বাস্তবিক দেখা গেল বনড়বীর মাঠে—একপাল ছেলেপুলে ঘিরে ধরেছে তাঁকে, আর মাঝখানে নিবারণ একটা আধমরা কবুতরের পালক দু'হাতে পটপট করে ছিঁড়ছেন, কাঁচা মাংসের জঙ্গলে ব্যগ্র কামড় বসাচ্ছেন। তাঁর মুখের বিস্বাদ, বমনোদ্রেক সব কিছুই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

এরপর প্রায় সবকিছুই ভক্ষণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেন নিবারণ। মাঝে মাঝে জ্যান্ত পাঁঠা-ছাগল কামড়ে ধরেন, কুকুরকে তাড়া করে ফেরেন। দু'বার গাঁয়ের লোক তাঁকে বাঁশ পেটা করে আধমরা করল। লোকে নিবারণের নামের আগে 'পাগলা' কথাটা জুড়ে দিল।

আমার মনে হয় নিবারণ ঠিক পাগল হয়ে যাননি। কে. নন্দী সার্কাসে যখন মুর্গী এবং সাপ ভক্ষণ করতেন—তখন কেউ তাঁকে পাগল বলেনি, বরং অনেকদূর থেকে পয়সা খরচ করে দেখতে গেছে। নিবারণ সম্পর্কে আমার এই মনে হয় যে তিনি তাঁর শিল্পের অভ্যাস পরিবর্তিত করতে চাইছিলেন মাত্র। মনে হয়েছিল ছবি ছেড়ে বাস্তবিক তাঁর শিল্পগুলি এইবার তাঁকে আক্রমণ করতে শুরু করেছিল। তাই তিনি শিল্পান্তরে যেতে চাইছিলেন মাত্র।

এর কিছুদিন পর একদল বেদে এল আমাদের গাঁয়ে। নানারকম খেলা দেখাল ওষুধপত্র শিকড়বাকড় বিক্রী করল। তারপর একদিন ছাউনি গুটিয়ে চলে গেল।

দু'একদিন পর নিবারণ আমার কাছে এসে বললেন 'আমার স্ত্রী কুসুমকে আপনি চিনতেন?'

আমি মাথা নাড়লাম—হ্যাঁ।

হঠাৎ খিক্‌খিক্ করে হেসে উঠলেন নিবারণ, বললেন 'কুসুমের সার্কাসের খেলাগুলো কিন্তু তেমন সাঙ্ঘাতিক কিছু ছিল না। ওর চেয়ে সাঙ্ঘাতিক খেলা আমিই আপনাকে দেখাতে পারি।'

আমি নিবারণকে দেখছিলাম—আগেকার মতোই আছেন নিবারণ। লক্ষ্য করলাম তিনি আর তাঁর ডানহাতের দিকে চাইছেন না এবং তাঁর বগলে মোড়কের মধ্যে কয়েকটা ছবি রয়েছে বলে মনে হ'ল। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'কি ব্যাপার?'

খিক্ খিক্ করে হাসলেন নিবারণ 'কুসুমের সেই খেলাটার কথা বলছিলাম। সেই খেলাগুলো আমিই কুসুমকে দেখাতে শুরু করলাম। কুসুম কিন্তু ভয় পেয়ে গেল। খেলা দেখাতো কুসুম, কিন্তু ঐ খেলা নিজে কখনো দেখেনি সে।' একটু চুপ করে থেকে বললেন 'আমার মতোই অবস্থা হ'ল কুসুমের। তার শিল্পও তাকে আক্রমণ শুরু করল।'

আমি চেয়ে ছিলাম। খানিকটা আন্দাজ করে বিস্মিত না হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম কে. নন্দী কোথায়?'

'ঠিক জানি না। একদল বেদে এসেছিল লক্ষ্য করেছেন?' আমি বুঝলাম। চুপ করে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম 'আপনার আঙুল?,

নিবারণ উত্তর দিলেন না। আস্তে আস্তে ছবিগুলোর মোড়ক খুলে আমার সামনে পেতে দিলেন। প্রথম ছবিটাতেই ছিল দুটো ভয়ঙ্কর কালসাপ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে। আমি আর ছবিগুলো দেখলাম না। দেখবার দরকারও ছিল না।

বুঝলাম, পটুয়া নিবারণকে এবার ঠেকানো মুশকিল হবে। কেননা, তিনি বুঝতে পেরেছেন তাঁর অস্তিত্বের অপরাংশ তাঁর শিল্পকর্মের বিদ্রোহী যাবতীয় ভয়ংকরতা ও হিংস্রতাকে ভক্ষণ করতে সক্ষম।

দেবেশ রায়



জলধর ব্যানার্জির মৃত্যু

সাতান্ন বৎসর বয়সে জলধর বন্দ্যোপাধ্যায় নামক সেই অতি সাধারণ, বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকটির দুটি পুত্র, একটি পুত্রবধূ, স্ত্রী, বিবাহিতা কন্যা রেখে মারা গেলেন। জলধর ব্যানার্জি সেই জাতের লোক, 'বেঁচে ছিলাম' এ-কথাটা ঘোষণা করার জন্য মরা ছাড়া যাদের আর কোনো পথই খোলা নেই। রোগা, বেঁটে, একটু কুঁজো, হাতের শিরাগুলি পাকানো, ভুরুর মাঝখানে তিনচারটি ঘন-পাতলা রেখা—জলধর ব্যানার্জির এই দেহটা একটা আশ্চর্য ভঙ্গিতে তক্তপোষের ওপর পড়েছিল—সেই তক্তপোষটা—যার কাঠের দৃঢ়তা ও অমরতা নিয়ে জলধরবাবু সারাজীবন বাণী প্রচার করেছেন। সেই অমর, একটুও না-নড়া, পাথরের মতো ভারী, একজন রোগা-প্যাটকা লোকের পক্ষে বিশাল তক্তপোষটার ওপর জলধরবাবুর শরীরটা অদ্ভুত মহিমা নিয়ে পড়েছিল, যেন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী দিতে অস্বীকৃত দুর্যোধন কুরুক্ষেত্রের মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছেন।

বাইরে বাঁশ ফাঁড়ার আওয়াজ উঠছে। পাড়ার ছেলেছোকরারা নীরবে প্রায় নিঃশব্দে ব্যবস্থাদি করছে। বাঁশ ফেড়ে নারকেল দড়ি দিয়ে বেঁধে বেঁধে জলধরবাবুকে শ্মশানে নিয়ে যাবার পালঙ্ক তৈরী হচ্ছে। সেই বিশাল পালঙ্ক থেকে জলধরবাবুর শরীরটাকে নিয়ে যাওয়া হবে ঐ দেড়হাত চওড়া বাঁশের খাটে।

জলধরবাবুর দেহটাকে ঘিরে বসে তাঁর স্ত্রী, আর পাড়া-প্রতিবেশিনীরা। পুত্রবধূ বাইরে, জলভরা চোখে যে যা বলছে করে দিচ্ছে! দুই ছেলে একেবারে বাইরের মাঠে দাঁড়িয়ে। মেয়ে শশুরবাড়িতে, তার করা হয়েছে। জলধর-বাবুর আত্মীয়স্বজনরা কেউ খাটের পাশে, কেউ বাইরে। জলধরবাবুর

অফিসের সহকর্মীরা এসেছেন। তাঁদের মধ্যে জলধরবাবুর চেয়ে বয়স্ক একজন বাইরের বারান্দার চেয়ারে হাসপাতালের মেটার্নিটি ওয়ার্ডের বারান্দায় নতুন স্বামী, হবু-বাবার মতো মুখ করে বসে আছেন। সমবেত জনমণ্ডলীকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক, যারা কাজে ব্যস্ত। দুই, যারা এসে একবার মাত্র জলধরবাবুর মরা শরীরটা দেখে, তাঁর কথা আলোচনা করছিল। তিন, যারা একেবারে চুপ—জলধরবাবুকে ধরাধরি করে যখন বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে, সেই বিশাল তক্তপোষটা থেকে ঝাঁপিয়ে মেঝেতে পড়ে কাঁদা শুরু করবে এই অপেক্ষায়।

গত পঁচিশ বছর ধরে জলধরবাবু যে এক ও অকৃত্রিম চেহারায় সকলের কাছে প্রত্যহ আবির্ভূত হয়ে নিজের অস্তিত্বটাকে মুছে এনেছিলেন ঠিক সেই চেহারায় তক্তপোষটার ওপর শায়িত দেহটা সবাইকে চমকে দিয়ে জানাল, আঁ্যা, এ লোকটা বেঁচে ছিল এবং মরে গেল। জলধরবাবু সপ্তাহে একদিন দাড়ি কামাতেন। সেই দিনটি আসবার আর দুদিন বাকি ছিল। একটুখানি চোপসানো মুখ-ভর্তি একরাশ সাদা দাড়ি সেই হিসেবটা ধরিয়ে দিতেই জলধরবাবুর দাড়ি কাটার কথা ও দৃশ্য সবার মনে ও চোখে ভেসে উঠল।

দেয়ালে একটা ঘড়ি। গত চারঘণ্টা ধরে সেটা নিজের খেয়ালখুশিমতো সময় দেখিয়ে ও ঘণ্টা বাজিয়ে জোর করে সবার চোখটাকে নিজের দিকে টেনে এনে জলধরবাবুর দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

বাইরে, কাজকর্ম দৌড়দৌড়ির সুবিধার জন্য একটা সাইকেল দরকার। যতবার সেই দরকারের কথা মনে আসছে, ততবার বাইরের ঘরের কোনায়-রাখা সাইকেলটার দিকে সবাই চাইছে আর চাওয়ামাত্রই তাদের মন জলধরবাবুর দিকে ছুটছে।

দেয়ালে একটা ছবি, কাচ ধূসর, ছবিটাও অস্পষ্ট, তবু বোঝা যায় একটা অভিনয়ের কোনো দৃশ্য।

দেয়ালের ঘড়ি, বাইরের সাইকেল, কোনো এক অভিনয়ের বিলীয়মান ছবি আর জলধরবাবুর মুখের দাড়ি জলধরবাবুর বেঁচে থাকার কথা ঘোষণা করছে। ঘড়িটা চলে এবং সময় বলে, তবে তার সঙ্গে পৃথিবীর আহ্নিকগতির ছন্দের কোনো মিল নেই। সাইকেলটা চলে, তবে তাকে চালানোর কায়দা পৃথিবীর অন্য সব সাইকেল থেকে স্বতন্ত্র। ছবিটা কোন্ এক অভিনয়ের—তপোবন, কোষমুক্ত তরবারি হাতে রাজা, জানুনির্ভর বক্ষনিবদ্ধ-

পানি উন্মুক্ত-কেশা এক রমণী, মৃত এক তপস্বী, আরো দু-একজন, ঝকমক সাজপোশাক পরে কাঠের দেওয়ালে ঝুলছে—বুড়ো বয়সে প্রথম রামায়ণ শোনার স্মৃতির মতো। ভাঙা তোবড়ানো গালভর্তি দাড়ি সেই বিশেষ পদ্ধতিতে উৎপাটিত হবার আশাকায় যেন কণ্টকিত।

এরাই জলধর বন্দ্যোপাধ্যায়। জলধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তক্তপোষের ওপর শায়িত শরীরটা যেন একটা মিথ্যে ব্যাপার। যে জলধর ব্যানার্জি একা, অদ্বিতীয়, বিশিষ্ট, স্বমহিম, সম্রাজ্ঞীর মতো অদৃশ্য ও উদ্ধত, অর্জুনের মতো একাগ্র ও বীর এবং—ব্যর্থ ব্যর্থ ব্যর্থ—এরাই সেই মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকটি।

সবাই যেমন করে সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমুতে যায়, জলধরবাবুর দিনযাপন তা থেকে একটুও ব্যতিক্রম ছিল না। এমন কি যেটুকু ব্যতিক্রম না থাকলে অস্তিত্বটাকেই আলাদা করে বোঝা যায় না, সেটুকুও ব্যতিক্রম জলধরবাবুর ছিল না। জলধরবাবুকে নদীর খড়কুটোর সঙ্গে তুলনা করাটাও ঠিক নয়, কেননা স্রোতে অসহায়ের মতো ভেসে গেলেও খড়কুটোটাই স্রোত হয়ে যায় না। জলধরবাবু একেবারে আর পাঁচজনের মতো, জলধরবাবু-ই আর পাঁচজন। পাড়ার অবিনাশবাবু বা মোহিনীবাবু বা মাখনবাবু বা যতীনবাবু যদি বাজারের মাছের দর বা আমেরিকার রাজনীতি নিয়ে জলধর-বাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে আসেন, জলধরবাবুকে না পেলে তাঁরা সনাতন-বাবু বা সুকুমারবাবু বা গিরিজাপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আলাপ করে যান।

প্রাত্যহিক দিনযাপনের কতকগুলো ঘটনার দিকে বা জীবনযাপনের অপরিহার্য প্রত্যহ-ব্যবহার্য বস্তুগুলোর দিকে নজর দিলে দেখা যায়, জলধরবাবুর কতকগুলো ব্যাপার ছিল, যে ব্যাপারগুলো প্রতিদিনের ঘর্ষণে সমস্ত অভিনবত্ব হারিয়েও একেবারে পুরানো, মরচে-ধরা ও বাতিল হয়ে যায় নি। সেগুলোই জলধরবাবু, আর তার জন্যই, জলধরবাবুর মতো এত সাধারণ, করুণার উদ্রেক করে এত অব্যতিক্রমী, পয়ার ছন্দের মতো নিয়মমাফিক অচঞ্চল ও বিরক্তিকর লোকটির স্ত্রীর পাশে ঠিক অমনি সাধারণ অব্যতিক্রমী অচঞ্চল ও বিরক্তিকর অবিনাশবাবু, মাখনবাবু, যতীনবাবু, মোহিনীবাবু, সনাতনবাবু, সুকুমারবাবু বা গিরিজাপ্রসন্নবাবু রাত্রিবেলা শোন না, যদিও নিজের স্ত্রীর পাশে শুয়ে তাঁরা যত তাড়াতাড়ি

ঘুমিয়ে পড়েন, পরস্ত্রীর পাশে শুলেও তার চেয়ে বেশি সময় জেগে থাকতে পারবেন না।

যে যে কারণে জলধরবাবুকে সবাই জলধরবাবুই ডাকতেন, তার অন্যতম হচ্ছে তাঁর বাহনটি। জলধরবাবু যে সাইকেলটি চড়ে সিংহবাহিনী দুর্গার মতো অবলীলায় পথ চলতেন, তাতে তিনি ব্যতীত আর একজন মাত্র বসতে পারত, সে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। সে পুত্র বর্তমানে শোকাভিভূত। তাই সাইকেলের প্রয়োজন থাকলেও সেই সাইকেলটি ঘরের কোণে পড়ে আছে, বিষ্ণুবিহীন গরুড়ের মতো। ঠিক জানা যায় না, জলধরবাবুও বলতে পারতেন না, তবে, আনুমানিক পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে এই জাপানী সাইকেলটি ও সেই জাপানী দেয়ালঘড়িটি জলধরবাবু কেনেন তখনকার এক পুজো-স্পেশ্যাল ট্রেন থেকে। এ দুটো কবে যে ঠিকমতো চলত তা স্বয়ং দেবতাও বলতে পারেন না। সাইকেলটা চলে, চলে, চলে আর পেছনের মাডগার্ড আর চেন-হুইলে একটানা অর্কেস্ট্রা বাজে ঝন-ঝন-ঝন, আবার কখনো কিন্-কিন্ করে আওয়াজ ওঠে—সেতারের সবচেয়ে সরু তারটায় টোকা দিলে যেমন হয়। সিটে বসলেই সিটটা ঘুরে যায়, সিটের সেই মুখটা ঘোরানোতে হাত থেকে হ্যাণ্ডেল ছিটকে যেতে পারে। তখন, একটা বিপরীত চাপ দিয়ে সেটাকে সোজা করে নিতে হয়। আড়াইটি করে প্যাডলের পর একটু বিরাম, আবার এক-দুই-আধ: বিরাম; এক-দুই-আধ: বিরাম। যদি কখনো ওই আধটা এক হয়ে যায় বা সোয়া হয়ে থাকে—প্যাডেলটা খসে যাবে। সেই একতালে চলতে হবে এক-দুই-আধ, এক-দুই-আধ। ব্রেক কষলেই ব্রেক হয় না, ওটাকে ডানদিকে টেনে ওপরে তুলতে হয়—মোটরের গিয়ার দেবার মতো। এতেই নিশ্চিন্ত নয়। এ সাইকেলটার স্বাধীনতা-বোধ আছে। তাই আরোহীর নির্দেশ তার কাছে সদামান্য নয়। নিজের খেয়ালখুশিতে সে কখনো বাঁয়ে যায়, কখনো ডাইনে চলে বেঁকে বেঁকে। তখন আরোহী নিতান্ত অনুগত না থাকলে অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য পতন।

প্রতিদিন সকালে জলধরবাবু সাইকেলটাকে মেঝেতে শোয়াতেন, তারপর একটা কাঠের বাক্স থেকে নানারকম যন্ত্রপাতি বের করে আমস্তক বল্টু টাইট করতেন, তেল দিতেন, মুছতেন, এক-একটা ফুটোর মধ্যে ফুঁ দিয়ে ধুলো পরিষ্কার করতেন—জন্মরোগা ছেলের যেমন শুশ্রূষা করেন মা!

সাইকেল-সেবার পর ঘড়ি-সেবা। ঘড়িটাকে তিনিই সেই আদ্যিকাল থেকে দম দিয়ে আসছেন। প্রতি রবিবার সকালে সেটা মেঝের ওপর উপুড় করতেন, তার ভেতরের কলকব্জাগুলো সাফ করতেন, তেল দিতেন। কিন্তু এত সেবা ঘড়িটির সহ্য হয় নি। প্রায়ই ছোটখাটো পার্টস হারিয়ে যেত। অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন সেটা পাওয়া যেত না, তখন জলধরবাবু তার কিংবা সুতো দিয়ে সেটার একটা চিরদিনের জন্য আপাতত ব্যবস্থা করতেন। ফলে, ঘড়ির কাঁটা কখনো দু-চার ঘণ্টা আগুপিছু ছাড়া নড়ত না। আর পৃথিবীর এই গোলার্ধের এই দেশটির অন্যান্য সব ঘড়িতে যখন আটটা বাজে, এ ঘড়িটা নির্বিবাদে তখন ছটা বা দশটা দেখাত, এবং গম্ভীরভাবে তিনটে ঘণ্টা বাজিয়েই থেমে যেত! সাইকেল যেমন জলধরবাবুর দ্বিতীয় পুত্র এবং তিনি ব্যতীত আর কারো পক্ষে চড়া সম্ভব ছিল না, এ ঘড়িটার দিকে জলধরবাবু ছাড়া আর কারো তাকানো তেমনি অসম্ভব ছিল। এ ঘড়ির সময় একেবারে জলধরবাবুর নিজস্ব, ঘড়ির বাজনা শুনে, কাঁটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে একটা যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করে জলধরবাবু ব্যস্ত বা শান্ত হতেন। জলধরবাবুর এমন আরো কিছু কীর্তি ছিল। বিয়ের সময় পাওয়া তাঁর স্ত্রীর সেলাইয়ের মেশিনটা থেকে তিনি দীর্ঘদিনের চেষ্টায় সুতো বের হওয়াটাই বন্ধ করে দিয়েছেন। এর জন্য তাঁর স্ত্রী মাঝে মাঝে তাঁকে দায়ী করতেন। সে দায়িত্ব নীরবে মেনে নিয়ে জলধরবাবু সাইকেলটাকে বেগবান, ঘড়িটাকে প্রাণবান ও কলটাকে সূত্রবান করবার সাধু প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন।

জলধরবাবু দাড়ি কামাতেন সপ্তাহে একদিন। আজ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পরশুদিন তাঁর দাড়ি কামাবার দিন ছিল। এবং সেই মৃত জলধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখের দাড়িগুলো এমন খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে যে, পরশুদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকলে জলধরবাবু যে তাঁর সেই বিশেষ পদ্ধতিতে দাড়ি কামাতেনই এ বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই।

কাচ-ভাঙা আলমারির উপর থেকে বেরোত টিনের একটা লম্বা কৌটা, তার ভেতর থেকে বেরোত একটা ছোট আয়না, তাতে এক জলধরবাবুই মুখ দেখতে পারতেন, লোম উঠে-যাওয়া একটা ব্রাশ, একটা ভাঙা কাচের গ্লাস, একটা ব্লেড, একটা মরচে-পড়া সেফটি-রেজার। এগুলো নিয়ে জলধরবাবু বাইরের ভাঙা বেঞ্চটায় গিয়ে বসতেন। তারপর সেই ভাঙা

কাঁচের গ্লাসটার জল নিতেন। এরপর সেই ব্লেডটাকে সেই গ্লাসের ভেতরে গুনে গুনে আটাত্তরবার ঘষতেন। এই গোনা আর ব্লেড ঘষার মাঝখানে যদি কেউ এসে কোনো কথা বলত, জলধরবাবু চেঁচিয়ে উঠতেন— "দিলে তো গোনাটা নষ্ট করে।" তারপরে আন্দাজমতো একটা ধরে আবার গোনা শুরু করতেন—পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ, সাঁইত্রিশ।...

বাড়িটা জলধরবাবুর নিজের। তার মেঝের সিমেণ্ট চটে, ভেঙে, এবড়োখেবড়ো, খুঁটিগুলো সাবেকি ঢঙে অটুট। বাড়ির কথা উঠলেই আহ্লাদে গদ্‌গদ হয়ে যেতেন জলধরবাবু: "এ-কী আজকালকার বাড়ি হে! একেবারে আসল শালগাছের আস্ত খুঁটি—এত বছর গেল, তবু একটুও নড়চড় নেই। দেখ না, মেঝে ভেঙে গেছে, কিন্তু খুঁটিতে একটুও চিড় খায় নি।" জলধরবাবু নিজের মনেই খুঁটির গায়ে হাত বোলাতেন আর হাসতেন।

বাজারটাও জলধরবাবু নিজেই করতেন। বাজারের থলি নিয়ে তিনি যখন হাঁ-হাঁ করতে করতে বাড়ি ফিরতেন তখন সমস্ত ভঙ্গিতে একজন মহা-দিগ্বিজয়ীর ভাব ফুটে উঠত। ভারত জয় করে সুলতান মামুদ যেন ব্যস্ত হয়ে ঢুকছেন গজনির প্রাসাদে—'এসব দেশ জয় করার মতো সামান্য ব্যাপারে আমাকে কেন যে তোমরা ব্যস্ত কর'—এ-রকম একটা সহজ কৃতিত্বও ও অনায়াস-সাফল্যের ভাব ফুটে থাকত জলধরবাবুর সমগ্র চেহারায়। কেউ যদি জিজ্ঞেস করত—"কত করে আলুর সের আনলেন।" অপাঙ্গে দৃষ্টি দিয়ে জলধরবাবু জবাব দিতেন—"সাড়ে তিন আনা।" "বাজারে যে দেখলাম সাত আনা করে।" এ-প্রশ্নের জবাবে জলধরবাবু কোনো জবাব দিতেন না, একটা চাউনি দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন, "আমার নাম জলধর বাঁড়ুজ্জে, ও-সব ফট্‌ফটি আমার কাছে চলবে না!"

কুমোর প্রতিমা তৈরি করে। সাজে-সজ্জায় ঝলমলো দুর্গা প্রতিমাকে সে খরিদ্দারের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু তখনো পুজোর প্রতিমা, প্রতিমা হয় না। কুমোর খরিদ্দারের হাতে তুলে দেয় মা দুর্গার বর্শাটি, যেটা অসুরের রক্তাক্ত বুকে বসিয়ে প্রতিমার করন্যস্ত করা হয় পূজা-মণ্ডপে।

জলধরবাবু মরে পড়ে আছেন। একটা ভাঙা সাইকেল, ভাঙা ঘড়ি, জলধরবাবুর সেই মরে যাওয়াটাকে প্রত্যক্ষ করাচ্ছে। আর দেওয়ালে ঝুলছে যে ছবিটি—সেটাই একটা জীবিত অধুনা মৃত জলধরবাবুর আত্মা।

জলধরবাবু নাকি কোন্ এককালে অভিনয় করতেন। সীতায় তারা, আলমগীরে উদিপুরী, জনায় জনা, নরনারায়ণে দ্রৌপদী সেজে এককালে নাকি জলধরবাবু মঞ্চ কাঁপাতেন। দেয়ালে ঝোলানো ঐ ছবিটা সীতা নাটকের। তারা-বেশী জলধরবাবু রামচন্দ্রকে অভিশাপ দিচ্ছেন। তবে সাধারণত আর সকলের মতোই জলধরবাবুও সে-কথা ভুলে থাকতেন। যদি কোনোদিন জলধরবাবুর জ্বর আসত, তবে সারাদিন সারারাত ধরে জলধরবাবুর দ্রৌপদী. সীতা, জনা বা উদিপুরী বেগম হয়ে চেঁচাতেন। গত দশবছর ধরে জলধরবাবুর জ্বর আসে নি। তবে বিকারগ্রস্ত তিনি হয়েছিলেন মরার আগে আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে। সেই আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে জলধরবাবু একবারের জন্যও পাণ্ডব-প্রাসাদ, অযোধ্যা বা মোঘল-অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে তাঁর এই অতিপ্রিয় ঘরে ফিরে আসেন নি।

গত আটচল্লিশে ঘণ্টা বাদে দশবছর আগের কোনো এক রাত জলধর-বাবুকে না-ঘুমিয়ে কাটাতে হয়েছিল হস্তিনাপুরে, অযোধ্যায় আর দিল্লীতে। এই দুটি 'অভিনয়ে'র মাঝখানে দশবছরের দীর্ঘ সুস্থতা—সুতরাং অনভিনীত দিনগুলি।

গত দু-রাতের সঙ্গে সে-রাতের এই একটিই মিল। তখনো খুকীর বিয়ে হয় নি। সে-রাতে সিনেমা দেখে ফিরে আর কোনোদিন সিনেমা দেখতে যায় নি জলধরবাবু। সেই সিনেমা দেখার ফলে বিরক্ত মনে, ঝিম ধরা মাথায় বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন, সিনেমা না-দেখেও. বিরক্তি আর ঝিম-ধরা বোঝার মতো সচেতন না-থেকেও বিনিদ্র কাটিয়েছেন গত দুটো রাত। সেই রাত এবং গত দুটো রাতই—বিনিদ্র ছিলেন, তাই বলে জাগ্রত ছিলেন না, স্বপ্ন আর জাগরণের মাঝখানে এক মঞ্চের আলো-আঁধারিতে ঘুরপাক খেয়েছেন।

দশবছর আগের সেই সকালে: জলধরবাবু বাইরের ঘরে মেঝের ওপর সাইকেলটাকে শুইয়ে প্যাডলের জটিলতায় কোনো এক বিশেষ ফুটোয় ফুঁ দিয়ে বাতাস ঢোকাবার চেষ্টা করছিলেন। খুকী এসে ডেকেছিল—"বাবা"। জলধরবাবু সেই ফুটোটার বিপরীত দিকে আঙুল চালনা, একটা সুতো জিভ দিয়ে ভিজিয়ে সরু করে সেই ফুটোর মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা, ইত্যাদিতে ব্যস্ত ছিলেন, এবং তাঁর নিরুত্তর কণ্ঠের সামনে খুকী সামনে একটা বিশেষ বিরক্তির পর ডাকছিল—"বাবা"। অবশেষে যখন সুতোটা

সেই ফুটো দিয়ে ঢোকে নি ময়লার মাঝপথে ঠেকে গেছে, তখন জলধরবাবু খেঁকিয়ে উঠেছেন খুকীর ওপর—"কি সকালে এসে বাবা বাবা করছিস। বাবা কি করবে রে, অঁ্যা।" ঠিক সেই সময়ের ঘরে খুকীর মা ঢুকে জবাবটা দিয়েছিলেন—"বাপ আর কী করবে, ঘরে বসে বসে সাইকেল, ঘড়ি আর সেলাইকলটার সর্বনাশ করবে! মেয়েটা একটু সিনেমা যেতে চাইছে, সেদিকে—।" মূলপ্রস্তাবের জবাব না দিয়ে জলধরবাবু ভুরু কুঁচকে বলে উঠেছিলেন, "কেন, কালই তো আমি সেলাইয়ের কলটায় ছাতা সেলাই করলাম।, স্ত্রী বলে উঠেছিলেন—"তাহলে তো আরো ভালো।" স্ত্রী চলে যাবার পর বহুক্ষণ জলধরবাবু ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, "কেন বাবা, কাল তো ছাতার কাপড়টা বেশ সেলাই করলে।" "না—মানে কাল সেলাই করতে গিয়ে দেখলাম চলছে না, হাতেই সেরে নিলাম"—বলতে বলতে জলধরবাবু ঘরে গিয়ে কলটা উপুড় করে নিয়েছিলেন। বহুক্ষণ পর যখন কিছুতেই একটা স্ক্রু খুঁজে পাচ্ছেন না, ঢং-ঢং-ঢং তিনটে ঘণ্টা শুনে তাকিয়ে দেখেন সাতটা পঁচিশ। সেই ঘড়ির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মনে মনে কী একটা হিসেব করে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—"আরে সাড়ে দশটা বেজে গেল!" সেদিন, আফিস যাবার সময় জলধর-বাবুর হাতে পানের কৌটোটা দিতে দিতে খুকী বলেছিল—"বাবা যাবে তো? অনুরূপা দেবীর মন্ত্রশক্তি।" "তাই নাকি?" "হ্যাঁ"। পানটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে কিছুক্ষণ কী ভেবে জলধরবাবু বলেছিলেন, "আচ্ছা তৈরী থেকো, তিনটের সময় আমি আফিস থেকে আসব।" "তিনটের কি? ছটার শো।" "হ্যাঁ টিকিট না পাওয়া গেলে তোমর জন্য আরো একটা দিন নষ্ট।" তারপর সাইকেলটাকে ঘর থেকে নামাতে নামাতে ডেকেছিলেন, "খুকী।" খুকী সুধিয়েছিলেন, "বাণী করছে কে রে?" এক চিত্রতারকার নাম করেছিল খুকী। কী একটা ভাবতে ভাবতে সাইকেলে চেপে ঘূর্ণমান সিটটাকে সোজা করে এক-দুই-আধ প্যাডল করতে করতে জলধরবাবু আফিসে গিয়েছিলেন।

আর কী একটা ভাবতে ভাবতেই সে-রাতে সিনেমা দেখে এসে না খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। জলধরবাবুর এককালে বাণীর পাঠ করেছেন। সিনেমার অভিনয় দেখে তাঁর সেই স্মৃতি জেগেছে। আর সেই স্মৃতির অভিনয়ের পাশে নায়িকার অভিনয় অতি তুচ্ছ আর ব্যর্থ হয়ে গেল। জলধরবাবুর কেমন এক বিশ্বাস এল তিনি যা পেরেছেন আর কেউ তা পারে নি, পারে না।

নায়িকার ব্যর্থতায় সিনেমা-হলে প্রথমে তাঁর বিরক্তি এল, তারপর রাগ হল, তারপর করুণা এল, তারপর বাড়ি ফিরতে ফিরতে দয়া এল, অবশেষে অনেকদিন পর সিনেমা দেখার জন্য মাথাধরায় ও জটিল চিন্তায় ঘুম না আসায় রাতের কোনো একসময় নায়িকার ওপর তিনি খুশিই হয়ে উঠলেন। তার না পারার জন্যই যেন জলধরবাবুর পারাটা এত বড় হয়ে উঠল। সে রাতে বিনিদ্র ও অজাগ্রত জলধরবাবুর চোখের সামনে তাঁরই এক বিগত, অজ্ঞাত, অপূর্ব কীর্তি জেগে উঠেছিল। ফুলশয্যা, চারিদিকে আলো আর ফুল, একটি মেয়ে বেনারসী আর গয়নায় ঝকমক হয়ে বসে আছে পালঙ্কে, ভাদ্রের ভরা নদীর মতো শরীরটা স্থির, ঢিলখাওয়া রাজহাঁসের মতো ঘাড়টা দীর্ঘ, শক্ত, উৎসুক—কিছুদূরে নতমুখে বরবেশী যুবক।...সেই মেয়েটি চিঠি পড়ছে, চোখে আগ্রহ, আশা, ঠোঁটে সঙ্কোচ, হাঁটায় উপেক্ষা। চিঠি ধরে থাকা দশটা আঙুল খেলে খেলে কথা কইছে। চিঠির কাগজ দুমড়ে যাবার খচমচ আওয়াজ, আলসেমিতে শিথিল কণ্ঠস্বর! কখনো ঠোঁট বেঁকানো, কখনো হাসি, কখনো কখনো হাই তোলা ভাব—কিন্তু সবটুকুর মধ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে ফেলতে চেপে রাখা।

সে-রাতে একমাত্র জলধরবাবুর ঘড়িটা তার বিচিত্র ঘণ্টা বাজিয়ে গেছে, কিন্তু তিনি তা শুনতে পান নি।

সে রাতের সঙ্গে মরার আগের দু রাতের ওটুকুই সাদৃশ্য। সে-রাতের পর জলধরবাবুর কোনোদিন অসুখও করে নি, তিনি সিনেমাও দেখেন নি। তাই, দশবৎসর পর মৃত্যুর আগের দুরাত দুদিন জলধরবাবু সে রাতের মতো বিচিত্র এক জগতে বাস করেছিলেন।...

...মোগল অন্তঃপুরে বেগমের প্রকোষ্ঠ। জাফরিকাটা জানলার ওপারে চিক। উদিপুরী বেগম পালঙ্কের ওপর বসে সেতার বাজাচ্ছেন। শাহানশাহ বাদশাহ আলমগীরের প্রবেশ। প্রথমে সেতারের ঘাটের উপর আঙুল থামল উদিপুরীর। খুব জলদে কমোদ বাজাচ্ছিলেন উদিপুরী...ঐ জলদের মধ্যেই আলমগীরের প্রবেশ। ঢুকে তিন পা হেঁটে উদিপুরীর দিকে চাইলেন, উদিপুরী ঠিক শমের মাথায় ঘাটের ওপর আঙুলটাকে থামিয়ে দেন। উদিপুরী সোজা চেয়ে আছেন আলমগীরের চোখের দিকে, সোজা, সরল দৃষ্টি, দুই দৃষ্টির মাঝখানে থেমে যাওয়া সেতারের গমক।...সেতারের ধ্বনি মিলিয়ে না যেতেই, পালঙ্কের ওপর সেতারটাকে শুইয়ে, লাল সালোয়ার আর

বেণীতে সাপের ঝিকিমিকি খেলিয়ে নামলেন উদিপুরী। আলমগীরের দিকে সোজা তাকিয়ে সামনে এগিয়ে কোমর বেঁকিয়ে কুর্নিশ করে বললেন—জাঁহাপনার অসীম অনুগ্রহ। আলমগীর চোখ তুলে চাইলেন।…

…সম্মুখে নবদূর্বাদলশ্যাম রঘুপতি রাম। শম্বুকের মৃতদেহ থেকে রক্ত গড়িয়ে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পড়ছে, রামের হাতের ধনু শিথিল, তারার নিশ্বাসে আগুন, কম্পিত কণ্ঠে অভিশাপ—"সহস্র বান্ধব মাঝে রহিবে একাকী, তোমার প্রাণের ব্যথা কেহ বুঝিবে না।"

…রুক্ষ, পিঙ্গল, সাপের মতো বেণী বাঁ হাতে ধরে গজগমনে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন—"করিতে সন্ধির ভিক্ষা হস্তিনানগর এখনই কি চলিবে গোবিন্দ?" জিজ্ঞাসার শেষে একটা মৃদু ঢেউয়ে ব্যঙ্গ।…

…আলুলায়িত কেশ, বিস্ফারিত দৃষ্টি, চঞ্চল চরণ, দুহাতে তালি বাজাতে বাজাতে হা হা করে হেসে উন্মাদিনী জনার প্রবেশ—"জনা চলে প্রতিহিংসা প্রতিবিধিৎসিতে।"…

সূর্য যখন উঠছিল, জলধর বাঁড়ুজ্জে নামক সাতাত্ত বৎসর বয়সের সেই ভদ্রলোক দ্রৌপদীর মতো গরিমায়, তারার মতো তেজে, সীতার মতো সাহসে জনার মতো মত্ততায় ও উদিপুরীর মতো ঔদাস্যে—মরে গেলেন।

শ্মশানযাত্রার বাঁশের পালঙ্ক তৈরি হল। ক্যামেরাম্যান এল। জলধরবাবু চারপাশে বিমর্ষ আত্মীয়জন। সাতদিন পর যখন সেই ছবিটি টাঙানো হল তখন দেখা গেল, সারাজীবনে জলধরবাবু মাত্র দুটো ফটো তুলেছেন। একটাতে তারা সেজে রমাকে অভিসম্পাত দিচ্ছেন—"সহস্র বন্ধুর মাঝে রহিবে একাকী," আর একটাতে অনেক বন্ধুজন প্রিয়জনের মাঝে মরে পড়ে আছেন।

জলধরবাবুর দ্বিতীয় পুত্র সেই সাইকেলটায় চড়তে পারে। শোকটা শেষ হয়ে গেলেই সে সাইকেল চালাবে। তবে তার কব্জিতে ঘড়ি আছে। জলধরবাবুর ঘড়িটা দম না পেয়ে থেমে যাবে।

চিতায় জলধরবাবুর দেহটাকে ঘিরে আগুন এত উচ্ছ্বসিত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আলাদা করে দেখা যায় না। তীব্র কটু গন্ধ। আগুনের তীব্র আঁচে শিরায় টান লেগে জলধরবাবুর ডান হাতটা একটা ভঙ্গিমতো করে উঠে পাশে প্রসারিত হল আগুনের সীমানায়। শ্মশানে জলধরবাবুর একজন বয়স্ক সহকর্মী ছিলেন, তিনি বললেন: "আমি সম্রাট আলমগীর," বলবার সময় শিশিরবাবু হাতের তেলোটা অবিকল ঐ ভঙ্গিতে উল্টে দিতেন।

বুদ্ধদেব গুহ



দূরবীনের দু'দিক

মেঘের এইমাত্র ঘুম ভাঙল।

সারা রাত টুপুর-টাপুর করে রানীগঞ্জ টাইলের ছাদের উপর বৃষ্টি নরম সুরে আলতো পায়ে নেচেছিল। মাটির সোঁদা গন্ধ ভাসছিল হাওয়ায়। দূরের বস্তীতে কোনো ওঁরাও মেয়ের বিয়ে ছিল বুঝি কাল রাতে। দ্রিদিম-দ্রিম্ দ্রিমিমি দ্রিমের ঘুমপাড়ানী একঘেয়ে বিষণ্ণ শব্দ ভেসে এসেছিল শাল-জঙ্গলের বৃষ্টিভেজা ঘন সবুজ চুল পিছলে। কাল মাদলের শব্দটা বড় একঘেয়ে বিষণ্ণ লেগেছিল মেঘের। তালে কোনো বৈচিত্র্য নেই অথচ এর সমস্ত মাধুর্য ঐ একঘেয়েমিতেই।

যেহেতু প্রাকৃতিক এই পরিবেশে বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য, যেহেতু কোনো পাখি একই সুরে ডাকে না, ডাকে না একই পর্দায়, বিভিন্ন ফুল ফোটা ও ফুল ঝরার নিঃশব্দ সুরেলা আরোহণ ও অবরোহণের গা-শিউরানো প্রক্রিয়াতেও যেহেতু কোনো সাম্য নেই—এই পারিপার্শ্বিক বৈচিত্র্যতে ভারসাম্য আনতে দিগন্তরেখার উপরের সন্ধ্যা তারার স্থির সবুজাভ নিত্য একঘেয়েমির মত মাদলও এক সুরে এবং একই লয়ে ঝরে বুঝি।

ভোর হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ভোরের দিকে বড় ভাল লাগছিল। বিছানাতে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে মেঘ বাইরের ঘুম-ভাঙা প্রকৃতির ভৈরবী শোনে। কোমল রে আর কড়ি মা বৃষ্টি-চুমু রাতের পর রোদরাঙা সকালবেলায় পাখির স্বরে শিশুর খেলায়, বাছুরের ডাকে বিকীরিত হয়ে ওঠে।

ওর শরীরের মধ্যে যে এত আনন্দ ও আনন্দর উৎস লুকনো ছিল তা আগে কখনও জানেনি মেঘ। মেঘের বয়স কত? বয়স কি বয়সে হয়? কারোরই? মণি-মাণিক্য সবই ছিল লুকনো, অনুভূতি, উত্তেজনা সমস্তই

ছিল; কিন্তু সুপ্ত; কাল রাতে তার শরীরের অন্ধকার ভাণ্ডারে কোনো সাহসী এবং বড় কোমল দস্যু এসেছিল ভালোবাসার নরম মশাল জ্বেলে। ওর সাত রাজার ধন যা ছিল সব কেড়ে নিয়ে গেল সেই দারুণ চোর। সর্বস্বহৃত হবার পরই শুধুমাত্র জানতে পেল যে, ওর শরীরের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে সর্বস্বহৃত হয়েও আবার সম্পূর্ণ হতে পারার নিরন্তর কোনো জটিল প্রক্রিয়া চলেছে—আনন্দ বিকরিণ বিতরণের সঙ্গে আনন্দর জোগান যেন কোন্ অজানা গোপন উৎস হতে উৎসারিত হচ্ছে।

শরীরকে ও ঘৃণা করত, অশুচি বলে জানত; কিন্তু প্রকৃতির এই আশ্চর্য অনাবিল সৌন্দর্যের মধ্যে; চারিদিকের এই সমস্ত কিছু অলিখিত অথচ অমোঘ বিধানের মধ্যে যে ওর প্রাকৃত প্রকৃতি এমনভাবে সুপ্ত ও নিহিত ছিল, ফুল ফোটা, পাখি ডাকার মধ্যে তার নারী শরীরেরও যে এত মিষ্টি একটি সুনির্ধারিত ছন্দ ছিল তা ও এই এতগুলো বিবশ বছরে কখনও জানেনি।

যদিও জেনে মেঘের খুব ভালো লেগেছিল; জীবন, সুখ, আনন্দ এই সব কিছুর এক বিশেষ মানে খুঁজে পেয়েছিল, যদিও প্রথম কাল রাতে—তবুও সেই মুহূর্তে এক গভীর বিষন্নতা ওকে দারুণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

ফেলেছিল, কারণ যে পুরুষ ওর শরীরে কাল আরতি করেছিল এবং মেঘকে সেই আরতির আর্তির ভাগ দিয়েছিল অভগু সাম্যবাদীর মত, সে মেঘের স্বামী নয়। সে মেঘের কেউ নয়। এই ক্ষণিক, মধুর আনন্দের তীব্র সুখ ও জ্বালাভরা সম্পর্কর কোনো পরিণতি নেই।

এই সত্যটা ওর চেতনায় কাকতাড়ুয়ার মত ভাস্বর হতেই এই সকালের সব সুগন্ধ, শান্তি, ভালোলাগা ওর সুখ ভয়ার্ত পাখির মত চেতনা ছেড়ে উড়ে গেল। দূ—রে।

বাইরে থেকে রোদ উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে বলল, পাখি, পাখি; মেঘ পাখি। দৌড়ে এসো।

প্রথমে মেঘ বুঝতে পারেনি। বড় ঘোরের মধ্যে ছিল ও। হঠাৎ ওর পাশে চোখ ফেরাল। সাদার মধ্যে নীল ফুলফুল বেডশীটটা কুঁকড়ে-মুকড়ে আছে। রোদের বালিশটা দোমড়ানো মোচড়ানো। কাল এই বিছানায় কালবৈশাখী ঝড় উঠেছিল। যখন বাইরে বৃষ্টি।

খুব বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলল মেঘ।

বাইরে থেকে রোদ চেঁচিয়ে ডাকল, মেঘ প্লিজ, দৌড়ে এসো—সালিম

আলির বইটা নিয়ে এসো টেবল থেকে—আমি এখান থেকে নড়তে পারছি না—চোখ সরালেই হারিয়ে যাবে পাখিটা। না, না; একটা নয় দুটো। দুটো পাখি!

মেঘ উঠল। শরীরে প্রথম বড় ভার ম । তারপরেই বড় হালকা লাগল। পাখির মত হালকা। ভাবল, ও উড়ে যাবে।

তারপর ড্রেসিং টেবল থেকে সালিম আলির বইটা তুলে নিয়ে বাইরে এল। এসেই চমকে গেল।

কাল প্রথম সন্ধ্যের অন্ধকারে এসে এই ফরেস্ট বাংলোয় উঠেছিল। ভাল দেখতে পায়নি চারপাশ। অনুমান করেছিল শুধু। এখন রোদে চারিদিক ঝলমল করছে। পাহাড়ী নদীটা—উপত্যকা—বর্ষার সবুজ ভরন্ত মাথা উঁচু সবুজ বালাপোশ-মোড়া পাহাড়। লাল মাটির সুঁড়ি পথ। সতেজ ঘাস, পাতা; সব।

বাঁ দিকে চেয়ে দেখল বারান্দার সামনে সাদা বেতের চেয়ারে বসে আছে রোদ। কাল রাতে পরা সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরে। অন্য চেয়ারের উপর পা। বেতের টেবলের উপর টি-কোজীতে মোড়া টি-পট—চায়ের কাপ; ট্রেতে সাজানো। আর ওর কোলে কালো দূরবীনটা।

মেঘ কাছে যেতেই হাত থেকে সালিম আলির বইটা কেড়ে নিয়ে দ্রুত পাতা ওল্টাতে লাগল রোদ। পাতা ওল্টাতে বাঁ হাত দিয়ে, ডান হাতে দূরবীনটা এগিয়ে দিল মেঘকে। বলল শীগগিরী ছাখো। এখুনি উড়ে যাবে হয়তো।

এই মুহূর্তে রোদের সামনে এমন ফিঙের মত উজ্জ্বল কালো সুরেলা একজন পাখি দাঁড়িয়ে থাকা সত্বেও রোদ যে একটা অন্য পাখি নিয়ে এত মাতামাতি করবে ও করছে এই ভাবনাটাই মেঘকে বিরক্ত করে তুলল।

তবু রোদের কথা মত দূরবীনটা তুলে ধরল দু হাতে—তারপর ঝাঁকড়া গাছটার মগডালে রোদের নির্দেশমত খুঁজতে লাগল পাখিটাকে।

দূর থেকে ও বাসের নম্বর পড়তে পারে, মিছিলের লাল শালুতে কি লেখা আছে পড়তে পারে, পাখি দেখতে পারে না। ও শহরে লেপ্টে থাকা ভেসে-বেড়ানো মেঘ। প্রকৃতির মেঘ নয় ও।

অনেকক্ষণ কিছুই দেখতে পেল না মেঘ। দূরবীনের দুটো কাঁচেই রাশ রাশ সবুজ এসে ধাক্কা দিতে লাগল, হড়োহুড়ি করতে লাগল; মেঘের মনে হল ওর চোখ দুটোই সবুজ হয়ে যাবে।

বলল, কই ? দেখতে পাচ্ছি না ত ?

রোদের শক্ত পুরুষালী হাত দুটো মেঘের কাঁধের দুপাশে নেমে এলো—ওর নরম হাতের পাতার উপরে তার শক্ত হাত—তারপর দূরবীনের রেগুলেটরটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা জায়গায় এনে রোদ বলল, আবার ছাখো, দেখতে পাবে। উত্তেজিত গলায় বলল, তাড়াতাড়ি করো, নইলে উড়ে যাবে।

মেঘ এবার গাছটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। গাছের পাতাগুলো কত বড় বড় দেখাচ্ছে। শুকনো সরু ডালগুলোর গায়ে কালো পিঁপড়ে দেখতে পেল ক'টা। এক বড় ডাল থেকে দুটি করে ছোট ডাল উঠে গেছে ওপরে।

মেঘ মিথ্যা বিরক্তি দেখিয়ে বলল, পাখি কই ?

রোদ সত্যি বিরক্তিতে বলল, তুমি কি কানা ? অমন লাল পাখিটাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না ? অমন লাল দেখেছ কখনও ?

তারপর রোদ মনে মনে বলল, প্রথম যৌবনের স্বপ্নের মত কোমল স্কার্লেট ! লাল বললে ঠিক বলা হয় না। এই লালের কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই।

দেখেছি, দেখেছি। বলে ওঠে মেঘ।

তারপর মেঘ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। অস্ফুটে বলে ওঠে, আঃ, কী সুন্দর ! নিজের অজ্ঞাতে। পাখিটা কি মেঘের চেয়েও সুন্দর ? নরম, রেশমী স্কার্লেট রঙা ছোট পাখিটা—খুব ছোট নয়, বুলবুলির চেয়ে বড়—কালো মাথা। ও মাঃ, পাশের পাখিটা কি পাখি ? হলুদ বসন্ত ?

রোদ হাসল, বলল, না। হলুদ বসন্ত নয়। বই দেখে বলব। দুটোর একটাকেও চিনি না আমি। এত সুন্দর পাখি দেখিনি কখনও আগে। একটা লাল, একটা হলুদ, নিশ্চয়ই এক জাতের নয়। কিন্তু এমন বিহেভ করছে যেন মনে হয় জোড়া।

মেঘ চোখে দূরবীনটা লাগিয়ে রেখেই বলল, তুমি আর আমি কি একরকম দেখতে ? জুড়ি মাত্রকেই কি একরকম হতে হবে ?

তারপর নিরুচ্চারে বলল, তুমি পাহাড়ী বাজের মত সাদা, শক্তিমান, প্রবল প্রচণ্ড—আর আমি কালো কোকিলের মত। কালো আমার গায়ের রঙ, কালো আমার চোখের তারা, মিষ্টি আমার গলার স্বর। তুমি কর্কশ, কটা, সবল শারীরিকভাবে, আর আমি কোমল, নরম, দুর্বল। দুর্বলতা তোমার শনি ; দুর্বলতা আমার বৃহস্পতি। কিন্তু তুমি আমি কি জোড় বাঁধিনি—ক্ষণকালের জন্যে হলেও ?

রোদ বলল, আমরা ত মানুষ।

মেঘ বলল, মানুষরা কি পাখি নয়?

রোদ বলল, হলে ভাল হতো। কিন্তু নয়। মানুষরা অনেক নিকৃষ্টতর জীব।

ডালটা ঝাঁকিয়ে পাখি দুটো হুস্‌স্ করে উড়ে গেল।

রোদ মাথা নীচু করে বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছিল—পাখি দুটোও উড়ে গেল, ও-ও মুখ তুললো; বলল, পেয়েছি।

তারপরই বলল, স্ট্রেঞ্জ! আরে! ওরা যে একই পাখি। এক জোড়া। এই ছাখো ছবি। দেখেছো—পুরুষ আর নারী। দু রকম দেখতে।

মেঘ দুরবীনটা টেবিলে নামিয়ে রাখল।

বলল, তুমি ছাখো, আমি চা খাই। তুমি আর খাবে?

খাবো। দু চামচ চিনি।

জানি।

চা ঢালতে ঢালতে মেঘ বলল, নাম কি পাখি দুটোর?

স্কার্লেট মিনিভেট। বড় সুন্দর। তাই না?

মেঘ কথা বলল না। চুপ করে থাকল। চায়ের কাপ এগিয়ে দিল রোদকে।

রোদ কিছুক্ষণ মেঘের দিকে চেয়ে রইল। কাল রাতের কাজল লেগে গেছে চোখের কোণে।

রোদ বলল, তুমিও সুন্দর। খুব সুন্দর। স্কার্লেট মিনিভেটের মতই। ঐ পাখিরাও হয়তো লাল হলুদ পালকের নীচে তোমারই মত কালো!

কাল ঘরের মধ্যে, আধো অন্ধকারে, বৃষ্টির শব্দের মধ্যে যা লজ্জাকর ছিল না সেই রাতের স্মৃতিকে এক আকাশ আলোর নীচে এনে দাঁড় করালে লজ্জা করে। লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিল মেঘ।

রোদ খুব আস্তে আস্তে নীচু গলায় মেঘের পিঠে হাত রেখে বলল, কাল তোমার ভাল লেগেছিল?

মেঘের কানের লতি বেগুনী হয়ে উঠল। বুলবুলি ডাকছিল ফিসফিস করে। কাঠবিড়ালী ভেজা মাঠ বেয়ে দ্রুত দৌড়ে যাচ্ছিল অন্যদিকে। উপত্যকার উপরে এক ঝাঁক হলুদ প্রজাপতি উড়ছিল। মেঘের ভীষণ ভাল লাগছিল।

রোদ এবার মেঘের কানের লতিতে নিজের গাল ছুঁইয়ে বলল, কি? লাগেনি ভাল?

মেঘ অস্ফুটে হাসল। বলল, চা চল্‌কে যাবে। কি করছ?

রোদ আবার বলল, জীবন চল্‌কে যে কত কিছু পড়ে ধুলোয় ফেলা যায় তার বেলা? কাপ চল্‌কে চা পড়লেই দোষ?

আমি অত কথা জানি না তোমার মত।

বল, ভাল লেগেছে কি না?

মেঘ এবার হাসল। হাসলে ওকে আরও সুন্দর দেখায়। বলল, জানি না।

রোদ বলল, জানো ভাল করেই। বলবে না তা বললেই হয়।

বেশ! আমি ঐরকমই। সব কথা বলা যায় না, বলতে পারি না আমি।

রোদ মেঘের গ্রীবাতে ওর ঠোঁট ছোঁয়াল। বলল, এই জন্যেই ত তোমাকে এত ভালবাসি। তুমি বড় মেয়েলী। আজকাল মেয়েলী মেয়েরা উধাও হয়ে যাচ্ছে।

মেঘ বলল, তা জানি না।

তারপর বলল, তিনদিনের একদিন ত ফুরিয়ে গেল। আজকের প্রোগ্রাম কি?

তুমিই ঠিক করো।

আহা! আমি কি তোমার মতো এই জায়গাটা চিনি, জানি? আমি জঙ্গল পাহাড়ের কি জানি? তুমি যেখানে নিয়ে যাবে, যাবো।

এখন কোথাও যাওয়া-টাওয়া নয়। জাস্ট রিলাক্স করবো। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর তোমাকে ঐ পাহাড়ের উপরের ভাঙা দুর্গে নিয়ে যাবো। ভাল লাগবে। রোদ বলল।

কেন! আমার কপালে কি ভাঙা দুর্গ ছাড়া আর কিছু নেই? পোড়ো-বাড়ি, ভাঙা দুর্গ আমার ভাল লাগে না। গা ছমছম করে। আমাকে সুন্দর কিছু জীবন্ত ভরন্ত জিনিস দেখাও। পড়ন্ত জিনিস নয়। মেঘ বলল।

হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে দূরে একটা গাড়ি আসার আওয়াজ হল।

মেঘ শঙ্কিত হয়ে উঠল। বলল, কারা যেন আসছে! যদি কেউ আমাদের দেখে ফেলে একসঙ্গে?

দেখলে, দেখবে। আমরা কি স্কার্লেট মিনিভেট? আমাদের দেখার কি আছে? আমাদের দেখার জন্যে এতদূরে লোকে আসবেই বা কেন?

গাড়ির শব্দটা কিন্তু জোর হচ্ছে।

হোক। একটা গাড়ি আসছে, তা ত বোঝাই যাচ্ছে।

আমি ভিতরে যাই, ভয়ার্ত গলায় মেঘ বলল।

রোদকেও একটু চিন্তান্বিত দেখাল। কিন্তু স্বাভাবিক গলায় বলল, যেতে চাও যাও; চায়ের ট্রেটা নিয়ে যেতে বলো চৌকিদারকে।

তারপর বলল, ব্রেকফাস্ট কখন খাবে?

মেঘ বলল, কারা আসছে এখন ছাখো। ব্রেকফাস্ট খাবে না মারধোর খাবে, তা কি বলা যায়?

রোদ স্বগতোক্তির মত বলল, গাড়িটা এখনো অনেক দূরে আছে। ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে উঠছে।

তারপর বলল, তুমি যদি বড়ই হয়েছ স্বাবলম্বী হয়েছ, তাহলে এত ভয় পাও কেন?

আমি ভয় পাই না। বলেই মেঘ উঠে দাঁড়াল।

রোদ বলল, কিসের ভয় তোমার?

মেঘ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, তুমি বুঝবে না, তুমি অনেক বোঝো হয়তো; সব বোঝো না।

রোদের গলায় বিরক্তির সুর লাগল। বলল, বলবে না তাই-ই বল। কথা ঘোরাও কেন?

মেঘ মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল রোদের দিকে। বলল, তোমারা স্বার্থপর পুরুষ কি বুঝবে? বললেও কি বুঝবে? আমার ভয়টা তোমারই জন্যে। তোমাকে হারানোর ভয়ও বলতে পারো।

তারপর চলে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, তোমার ত অনেক আছে, অনেক; সবই আছে জীবনে; আমার ত তুমি ছাড়া আর কিছু নেই। তুমি কি করে বুঝবে আমার ভয়ের কথা?

বলেই, মেঘ ভিতরে চলে গেল।

গাড়ির শব্দটা কাছে এসেছে অনেক। একেবারে কাছে এল। একটা জীপ। কিন্তু বাংলোর হাতায় ঢুকলো না, সামনের কাঁচা লাল মাটির

রাস্তা বেয়ে পাহাড় গড়িয়ে লো-গীয়ারে গুটুর্ গুটুর্ করে নামতে লাগল।

রোদ চেঁচিয়ে ডাকল, এই ভীতু, এবারে এসো ; ভয় চলে গেছে।

॥ ২ ॥

মেঘের আপত্তি থাকায় সত্যিই পোড়ো দুর্গে যায়নি ওরা। মেঘকে নিয়ে রোদ হাঁটতে বেরিয়েছিল বনের পথে। বিকেলে চা খাওয়ার পর। দুপুরে ওরা দুজনে চাইনীজ চেকার খেলেছিল। রোদ বলেছিল. এই রকম কোনো সুন্দর জায়গায় ঘরে বসে কিণ্ডারগার্টেনের ছেলেমেয়ের মত খেলা ক্রিমিন্যাল ওয়েস্ট অব টাইম।

মেঘ বলেছিল যে, জীবনের বহু সহস্র দিন ত তোমার বা অন্য কারো ইচ্ছা মত চলেছ এবং ভবিষ্যতের সহস্র দিনও চলবে। তিনটে দিন আমাকে দেবে বলেছিল—ভুলে গেলে?

রোদ হেসেছিল। বলেছিল, ফেয়ার এনাফ্। তোমার উকিল হওয়া উচিত ছিল, যা হয়েছে তা না হয়ে।

বিকেলের রোদের সোনা গাছগাছালির গায়ে এসে পড়েছে, লাল মাটির পথের উপর কালো ছায়ার ডোরাগুলো পড়ে পথটাকে একটা অতিদীর্ঘ বসে-থাকা বাঘের পিঠ বলে মনে হচ্ছে। ময়ূর ডাকছে থেকে থেকে উপত্যকা থেকে। দুপুরে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। বৃষ্টি থামার পর থেকেই তিতির-গুলো পাগলের মত ডাকাডাকি শুরু করেছে চার পাশে। বাংলোর পিছনের গ্রাম থেকে গরু ডাকল হাম্বা-আ-আ-আ করে। গরুর ডাকের মধ্যে কেমন এক আশ্চর্য বিষণ্ণতা আছে যা এই বর্ষার বিকেলের বৃষ্টি-ভেজা সোঁদা-গন্ধ প্রকৃতির মনের সুরের সঙ্গে বাঁধা।

রোদের সঙ্গে কিছুক্ষণ পায়ে হেঁটে ঘুরেই ভারী ভাল লাগছে মেঘের। বন-জঙ্গলকে গাড়ি থেকে, ট্রেন থেকে, প্লেন থেকে দেখা এক, আর পায়ে হেঁটে দেখা অন্য।

রোদের হাত ধরে ও যেন এক নতুন আশ্চর্য জগতে এসে পৌঁচেছে এই বিকেল বেলায়, যে জগতের কোনো খোঁজই ও রাখেনি কখনও।

রোদ হাঁটতে হাঁটতে মেঘকে গাছ চেনাচ্ছে। ঐ যে দেখছো জংলী

ঝোপগুলো এবং বড় বড় গাছ? ওগুলোর নাম কাঠপুত্‌লী। পাতাগুলো দেখেছে? শাল-সেগুনের মাঝামাঝি?

ওমাঃ কী সুন্দর নাম! মেঘ বলে উঠল।

ঐ যে সোজা ঋজু গাছটা উঠেছে—ড্রিল-করা সোলজারের মত ডাল দুপাশে সমান্তরালে ছড়াতে ছড়াতে—ওটার নাম মিশুল!

গাছটা ভারী পুরুষ পুরুষ, টানটান কী লম্বা! মেঘ বলল, রোদের বাঁ হাত নিজের হাতে জড়িয়ে নিয়ে।

রোদ মেঘের দিকে তাকালো একবার। একটা লেবু রঙে সিল্কের শাড়ি পরেছে মেঘ লেবু রঙা ব্ল'উজের সঙ্গে। ওর শরীরেও যেন গন্ধরাজ লেবুর গন্ধ পেল রোদ। রোদ ভাবল এত বিদুষী, সুন্দরী, আত্মসচেতন মেঘ এই জঙ্গলে এসে কেমন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। তারপর ভাবল, সকলেই হয়। প্রকৃতির মধ্যে এলে হতেই হয়।

ঐগুলো কি ফল? কী সুন্দর! মেঘ আ'ঙুল দেখিযে শুধোল।

রোদ বলল, ওগুলোকে এখানে বলে কাঁকোড়। ঐগুলো দিয়ে মালা গেঁথে পরে বন-পাহাড়েব মেয়েরা। আর ঐ যে ঝোপগুলো দেখছো, ওগুলোর নাম টোঁটর। লাল লাল ফল ধরে ওতে শীতকালে। টক টক ফল। খায় এরা।

মেঘ মন্ত্রমুগ্ধের মত বলল, চারিদিকে যে এত গাছ তুমি সবার নাম জানো?

রোদ হেসে ফেলল। ওর কথার ধরন দেখে। বলল, সেটা আর কী এমন বাহাদুরী! যে জংলী, সে জঙ্গলটুকুও ত চিনবে! তবে সকলের নাম কী আর জানি? কিছু কিছু জানি।

বলো না, প্লিজ বলো। মেঘ আদুরে গলায় বলল।

রোদ হাসল। বলল, তুমি একটা পাগলী। এখন গড়গড় করে আধ ঘণ্টা গাছের নাম বলি আর কী?

ঈস্, আমার শাড়িতে চোর-কাঁটা লেগে গেল। মেঘ চিৎকার করে উঠল। প্রকৃতি-প্রেমে বাধা পড়ল ওর।

রোদ নীচু হয়ে শাড়ির ফলস-এর ঠিক উপর থেকে সবুজ ফলের মত কাঁটা-ভরা একটা ফল বের করে ছুঁড়ে দিল জঙ্গলে। বলল, চোরকাঁটা নয় এগুলো, এগুলোকে এরা বলে লটৃলটিয়া।

কী নাম রে বাবা! বলে, মেঘ হাসল।

একটা ছোট্ট হানিসাকার ভ্যারাইটির পাখি ডানদিকের একটা গমহার গাছের ডালে বসে ডাকছিল। ঐ একটি ছোট্ট পাখির মিষ্টি স্বর কী করে যে ঐ আদিগন্ত নৈঃশব্দকে ভরে দিচ্ছিল বারে বারে তা দেখে মেঘ অবাক হচ্ছিল।

মেঘ বলল, এই পাখিগুলোকে এখানের লোকেরা কি বলে?

রোদ হাসল। বলল, নাম শুনলে তুমি হেসে ফেলবে।

কী বলো না।

ফিচ্‌ফিচিয়া।

ইয়ার্কি? না? বলে, মেঘও হেসে উঠল।

তারপর বলল, আমাকে বোকা ভেবে যা-তা বানিয়ে বানিয়ে বললেই হল। আমি গিয়ে চৌকিদারের কাছে সব ভেরিফাই করব।

স্বচ্ছন্দে।

হেসে বলল রোদ।

তারপর বলল, আমার জানার পরিধি বড় সীমায়িত। কিন্তু যতটুকু জানি, তাতে কোনো ফাঁকি নেই।

মেঘ বলল, বাবা! কতদূরে চলে এলাম। ফেরার পথে ত অন্ধকার হয়ে যাবে। কোনো বিপদ হবে না ত?

অন্ধকার হবে না। এখানে রোদ চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ আলো থাকে।

মেঘ মুখ তুলে চাইল রোদের দিকে। রোদের বাহুতে ঘন হয়ে এল ও। ফিসফিস করে বলল, আমার জীবনেও যেন তা হয়।

রোদ কথা বলল না, চুপ করে হাঁটতে লাগল। রোদ জানে যে যখন খুব ভাল লাগে তখন কথা বলে সে ভালোলাগাটা নষ্ট করতে নেই।

মেঘ বলল, ঐ পাথরটায় বসবে—ঐ বড় কালো পাথরটা? রাস্তার পাশে? ডানদিকের খাদটা কতদূরে নেমে গেছে, না?

বসবে, চলো!

ওরা দুজনে পাথরটার দিকে এগিয়ে গেল।

রোদ প্রথমে ভালো করে দেখে নিল পিঁপড়ে কি বিছের গর্ত-টর্ত আছে কি না তারপর মেঘকে হাত ধরে উপরে তুললো, বলল, বোসো।

মেঘ বসলে, ওর পাশে এসে রোদ বসলো।

অনেকক্ষণ মেঘ কথা বলল না।

নীচের উপত্যকায় শঙ্খিনী নদীটি এখন ভরা যৌবন। লাল ঘোলা জল বয়ে চলেছে তাতে ঘন-গর্জনে। অসংখ্য শালের আর পলাশের চারা গজিয়ে উঠেছে তার দুপাশে। ঘন আণ্ডারগ্রোথে ভরে গেছে পাশ বরাবর অনেকখানি জায়গা। খাদের ওপাশের পাহাড়টার পিঠটা বলদের কুঁজের মত উঁচু হয়ে উঠেছে পশ্চিমে। এক ঝাঁক টিয়া ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ করতে করতে নদী-রেখা ধরে সোজা খাদের মধ্যে উড়ে গেল। কোথায় যাবে ওরা কে জানে? মেঘ ও রোদ যেখানে বসে আছে তার পিছন দিকে পিউ-কাঁহা ডাকছে থেকে থেকে। আসন্ন সন্ধ্যার সমস্ত খুশবু, শব্দের ঝুমঝুমি উড়তে লেগেছে, বাজতে লেগেছে চারপাশে। প্রকৃতি মায়ের রাতের ভাঁড়ার খোলার চাবির ঝুম্‌ঝুমির মত পাহাড়ী ঝিঁঝিরা ঝুম্‌ঝুমিয়ে বেজে উঠছে চারপাশের গাছে-পাতায়।

মেঘ অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইল। আকাশের রোদ আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল। মেঘের পাশে রোদ তখন স্থির।

হঠাৎ মেঘ বলল, জানো, হনলুলুতে ওরা নৌকো করে প্যাসিফিকে সূর্যাস্ত দেখতে নিয়ে যায়। কত ট্যুরিস্টরা যায়—দেখে বাঃ বাঃ করে—। ওরা আমাদের দেশে আসে না কেন বলো ত? আমিও ত গ্লাসবটম্ বোটে করে কোরাল রীফ্ দেখেছি, দেখেছি ওখানের সূর্যাস্ত। কিন্তু কই? এমন নির্জন সৌন্দর্য, সৌন্দর্যে এমন শান্তি কখনও তো বোধ করিনি? এমন সূর্যাস্ত কোথাওই দেখিনি।

রোদ স্বগতোক্তির মত বলল, আমাদের দেশের মত সুন্দর দেশ পৃথিবীতে নেই।

সেই নীচের নদীর ঝর্ঝর, আসন্ন সন্ধ্যার বনমর্মর ঘরে-ফেরা পাখির ডাককে স্থগিত রেখে মেঘ দুহাতে রোদকে আকস্মিকভাবে জড়িয়ে ধরে বলল, আমি তোমার জন্যে সব করতে পারি, আমার সর্বস্ব দিতে পারি তোমাকে, তুমি আমাকে কতখানি ভালবাস বলো? বল যে, তুমি আমাকে চিরদিনই এমনি করে ভালবাসবে?

রোদ হাসল। বলল, তোমার প্রশ্নটা চার বছরের ছেলের মত হল।

উত্তরটাও তেমন করেই দিতে হয়। বলতে হয় যে, "আকাতের তমান ভালাবতি।"

সবতাতে ইয়ার্কি ভাল লাগে না। মেঘ বলল।

রোদ বলল, চিরদিন কি একইজনকে একইরকম করে ভালোবাসা যায়? আমি অন্তত জানি না; পারি না।

তারপর বলল, তুমি সামনে তাকিয়েও এই মুহূর্তে তোমার নিজের কথা ভাবতে পারলে? আমার কথাও? আমি ত এমন পরিবেশে এমন জায়গায় এলে সব ভুলে যাই।

তোমার কথা আলাদা। শ্লেষের সঙ্গে মেঘ বলল।

রোদ বোঝাবার গলায় বলল, এইরকম জায়গায় এসে একজনকেই ভালোবাসা যায়, একজনকেই ভালোবাসার কথা মনে পড়ে।

মেঘ বলল, অত জানি না। আমি আমার ভালবাসাব সবটুকু ক্ষমতা দিয়ে তোমাকে ভালোবেসেছি, তোমাকেও আমায তেমন করে বাসতে হবে। সবসময় ভালোবাসতে হবে।

একমাত্র আমাকেই। বলে দিলাম!

রোদ চাপা হাসি হাসল। কিছু বলল না জবাবে।

তুমি সবচেয়ে বেশী কাকে ভালোবাসো এ-পৃথিবীতে? স্থির দৃষ্টিতে রোদের মুখে চেয়ে আবারও শুধালো।

আমাকে। আমাকেই।

রোদ বলল। নদীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। মুখ না ফিরিয়ে।

—তুমি কী স্বার্থপর!

—আমরা সবাই স্বার্থপর। কেউ বুঝতে পারি সে-কথা, কেউ পারি না। কেউ স্বীকার করি, কেউ করি না।

তুমি স্বার্থপর হতে পারো। আমি নই।

বলছিই ত আমি স্বার্থপর। আমার কাছে আমিই সবচেয়ে ইমপর্ট্যান্ট্। আমি আছি বলেই তুমি আছ, এই পৃথিবী আছে, অন্য সকলে আছে, পৃথিবীর সমস্ত কিছুই আমাকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। সবকিছুই আমি আমারই চোখ দিয়ে দেখি, আমার সুখ আমার দুঃখ দিয়ে বিচার করি। আমিই যদি না থাকি, তাহলে তুমি থাকলে, কি অন্য কেউ থাকল কি সমস্ত পৃথিবী থাকল তাতে আমার কী যায় আসে?

তোমার সুখটাই সব? আমার সুখটা তোমার কাছে কিছু নয়? মেঘ বলল।

কিছুই নয়। যদি-না তোমার সুখের মাধ্যমে আমি সুখী হই। রোদ বলল।

মেঘ বলল, যাকগে, শোনো রোদ, আমি তোমার জন্যে শুধু তোমারই জন্যে তোমাকে প্রায় জোর করেই এখানে এনেছি তিনটে দিনের জন্যে। ঝগড়া করতে এখানে আসিনি।

রোদ পাথর থেকে নামল। স্নেহের গলায় বলল, তা জানি। ঝগড়া করতে আসোনি; শুধুই ভালোবাসতে এসেছো।

মেঘ পা দুটো শক্ত করে সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, তুমি আমাকে ঈনসা করছো?

মোটেই না। তুমি যদি তা মনে করো তা হলে আমার পক্ষে চুপ করে থাকাই ভালো।

তারপর রোদ বলল, নামো, বেলা পড়ে গেছে। বর্ষাকাল অন্ধকার হয়ে গেলে পথে সাপের ভয় আছে।

ওমা! সাপ! বলেই মেঘ লাফিয়ে নামল রোদের সাহায্য ছাড়াই। তারপর ওর পাশে পাশে ফেরার পথ ধরল।

রোদ বলল, সকলেই পথের সাপকে ভয় করে, বুকের সাপকে নয়। আশ্চর্য!

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না।

কিছুক্ষণ চলার পর মেঘ বলল, আমার ওপর রাগ করলে?

নাঃ। উদাসীন গলায় রোদ বলল।

তবে?

রাগ নয়, বলতে পারো অনুকম্পা।

সুন্দরী, গর্বিতা, বিদুষী মেয়ে রাগে জ্বলে উঠল। বলল, অনুকম্পা? হাউ ডেয়ার উ্য!

রোদ হাসল। বলল, ঠিক তাই! তুমি জীবনে না পারবে কাউকে ভালোবাসতে, না পাবে কারো ভালোবাসা।

মেঘ রাগত স্বরে বলল, ডু উ্য মীন ম্যারেড লাভ? তুমি কি আমাকে অপমান করছ আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী নই বলে এবং কখনও তা হবে না বলে?

তুমি একটি আটারলি সিলী. ইন্‌সিপিড্‌ মেয়ে।

রোদ ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ গলায় বলল।

মেঘ ঘাড় বেঁকিয়ে চুল ঝাঁকিয়ে বলল, শাট্‌ আপ্‌।

তারপর জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতে বলল, তোমার সঙ্গে এসে কী ভুলই না করেছি। এরকমভাবে থাকার চেয়ে চলে যাওয়া অনেক ভাল। আমি চলে যেতে চাই। আমি এক্ষুনি যেতে চাই।

তুমি চলে যাও। সঙ্গে দুজন লোক দিয়ে দিচ্ছি গ্রামের। কোলকাতা অবধি তোমার সঙ্গে যাবে। তোমারই গাড়ি, তুমিই চালিয়ে এসেছো। যেতে বাধা কোথায়?

কেন, আমি কি একা যেতে পারি না? সারা পৃথিবী ঘুরলাম, বিদেশে রইলাম এত বছর, আমি কি অবলা নারী?

তুমি অবলা নও। তবে জঙ্গলের পথ-ঘাট তোমার জানা নেই। এখানের বিপদ-আপদ সম্বন্ধে তুমি অনভিজ্ঞ।

শান্ত গলায় বলল রোদ।

আমি অন্য লোক নিয়ে যাবো না। তুমি নিয়ে এসেছ, তুমিই নিয়ে যাবে। ইউ আর ডিউটি-বাউণ্ড।

আমি আমার ছুটি ফুরোলেই ফিরব। পরশুর পরদিন। আমি তোমার খেলার পুতুল নই। কারোরই পুতুল নই আমি। আমি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় চলে থাকি। তা তোমার এতদিনে জানা উচিত ছিল।

এক্ষুনি ফিরতে হবে। তোমার সঙ্গে এক মুহূর্তও থাকতে চাই না। আমিও নিজের ইচ্ছাতে চলি। তোমার মুখ দেখতে চাই না আমি।

হঠাৎ রোদ মেঘের মুখের দিকে তাকাল।

রোদ একবার ভীষণ ঝলসে উঠবে মনে হল, ওর অনেক অশান্তি ও শ্রান্তিতে পীড়িত শিরা উপশিরাগুলোতে রক্ত ঐ বর্ষার ঝরনার মত দাপাদাপি করে উঠল। তারপরই শান্ত হল।

কী ভেবে রোদ বলল, ঠিক আছে। যা তোমার খুশী তাই-ই হবে। বাংলোয় ফিরেই তাহলে গোছগাছ করে নাও। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। এই ডিসিশানের নড়চড় হবে না কিন্তু।

ঠিক আছে দাঁতে দাঁত চেপে বলল মেঘ।

বাংলোর পথে আর কোনো কথা হলো না। ঝিঁঝি ডাকতে লাগল

একটানা। ছুটো পেঁচা শূন্যে ওদেরই মত ঝগড়া করতে করতে কিঁ-চি, কিঁচি কিচর্-কিচর্ করে ডাকতে ডাকতে ওদের সামনে সামনে উড়তে লাগল।

বাংলোয় পৌঁছে রোদ বলল, আমি বাথরুমে যাচ্ছি। এক্ষুণিই বেরোব। তুমি তৈরী হয়ে নাও। গোছগাছ করে নাও।

বাথরুম থেকে মিনিট দশেক পরে বেরিয়ে রোদ দেখল মেঘের স্যুটকেস প্যাক করা হয়ে গেছে। ফ্রু্রী থেকে প্যাস্ট্রি এনেছিল কিছু আর চীজ—স্ট্র। প্যাকেটগুলো খাওয়ার ঘরের টেবলের উপরই পড়ে রইল।

নিজের স্যুটকেস গোছাতে গোছাতে চৌকিদারকে ডাকল রোদ। বলল, মাল উঠাও ঔর খাতা লাও তুমহারা।

—রাত্‌কা খনা তো বন্ গ্যয়া সাব। খনা খাকে যাইবে।

বিনীত গলায় চৌকিদারকে বলল রোদকে।

সে আবারও বলল, মেমসাহেব সাথ্ মে হ্যায়—বেগর-খনা রাত্‌মে জঙ্গলমে নহী যানা চাহিয়ে।

রোদ উত্তর না-দিয়ে নরম কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল, খনা বন্ গ্যায়া হ্যায় ত তুমহারা বাচ্চোঁকো বাঁট দো। তারপর খাওয়ার ঘরের প্যাকেটগুলো দেখিয়ে বলল, উ সমান্ ভি লে লেনা।

কেরোসিন বাতিতে ভাল দেখা যায় না। নিজের জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে আরও মিনিট দশেক গেল। ওর স্যুটকেসটাও নিয়ে গেল চৌকিদার বস্তীতে তার বৌয়ের কাছে পাঠিয়ে দিল।

মেঘকে কোথাও পাওয়া গেল না। বসার ঘরেও নয়। অন্ধকারে গেল কোথায়? বাংলোর পিছনের হাতায় বাবুর্চিখানার সামনে মেঘকে একটা চেয়ার পেতে বসে থাকতে দেখল রোদ। বাবুর্চিখানার বারান্দায় চৌকিদারের লণ্ঠনটা জ্বলছে। ধুঁয়ো উড়ছে খুব। লণ্ঠনের আলোটা অন্ধকারটাকে গভীরতর করে তুলেছে যেন। জোনাকি জ্বলছে জঙ্গলে, হাজার হাজার জোনাকি। দূর থেকে শম্বরের গম্ভীর ধাতব ডাক ভেসে আসছে ঘ্বাক্ ঘ্বাক। চারিদিকে চাপচাপ অন্ধকারকে এক পরিব্যাপ্ত অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক শম্বর বলে মনে হচ্ছিল।

রোদ বাংলোর পেছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলল, আমি তৈরী।

মেঘ কোনো কথা বলল না।

রোদ আবার বলল, দেরী হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। এ-পথে হাতী থাকে প্রায়ই।

তারপর আরও একটু চুপ করে থেকে নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল, আর দেরী করলে হবে না।

এমন সময় চৌকিদার হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, সাব্ গাড়িকা চাক্কামে বিলকুল হাওয়া নেহি হ্যায়।

কেয়া ?

বলেই, রোদ তাড়াতাড়ি গেল। গিয়ে দেখে, সত্যিই হাওয়া নেই। সামনের ও পিছনের একটা করে চাকার হাওয়া একেবারেই নেই। প্যাংচার হলে এমনটি হতো না। বিকেলেও বেরোবার সময় লক্ষ্য করেছিল টায়ারের হাওয়া ঠিকই ছিল। কেউ হাওয়া খুলে দিয়েছে। স্টেপনী একটাই আছে। সুতরাং……।

চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করে জানল পনেরো মাইল দূরে বাস রাস্তায় টায়ার সারানো মিস্ত্রী ও হাওয়া দেওয়ার মেসিন আছে।

নিশ্চয়ই চৌকিদারের ছোট ছেলেরা ও তাদের বন্ধু-বান্ধবদের কাজ। ওরা গাড়ির কাছে ঘুরঘুর করছিল। রোদ খুব রাগারাগি করল। চৌকিদারও অপ্রতিভ হল ভীষণ। বলল, হাম আভি যাতা, হারামীকো বাচ্চোঁকো ঠিক্‌সে শিখলায়েগা।

কাঁহা যাতা হ্যায় ? রোদ শুধালো।

ঘর ; বস্তীমে। চৌকিদার বলল।

রোদ তাকিয়ে দেখল, মেঘ এসে সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়েছে।

রোদ কিছু বলবার আগেই মেঘ বলল, এখন কি হবে ?

কি আর হবে ? কালকের দিন ত পুরো লাগাবে টায়ার পাঠিয়ে হাওয়া দিয়ে আনতে বা সারাতে। বাঁকে করে টায়ার ঝুলিয়ে পায়ে হেঁটে পনেরো মাইল যাবে পনেরো মাইল আসবে। কম দূর ত নয়।

মেঘ প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে বলল, ভাল্লো !

বলেই, বারান্দার চেয়ারে বসে পড়ল।

রোদ বারান্দায় উঠে এল।

বারান্দায় লণ্ঠনটা জ্বলছিল। চোখে লাগছিল বলে সেটাকে ঘরের ভেতরে দরজার আড়ালে রেখে এল।

বাইরে আকাশ মেঘে ঢাকা পড়েছিল। বর্ষার রাতে দমবন্ধ অন্ধকার চোখে মুখে থাপ্পড় মারছিল।

জোনাকির ওড়া ও ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোনো কিছুর নড়াচড়া বা শব্দ ছিল না। হাতার মধ্যে অন্ধকারে থপ্‌থপ্‌ আওয়াজ তুলে ব্যাঙ লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল। ব্যাঙ ধরতে সাপেরাও ঘোরাফেরা করতে পারে।

রোদ ইজিচেয়ারটা পেছিয়ে নিয়ে বারান্দায় থামে দুপা তুলে আরাম করে বসলো। একটা সিগারেট ধরালো। তারপর চুপচাপ করে অন্ধকারে তাকিয়ে রইল। ওর মনে হল দু চোখের মণির মধ্যে দিয়ে চাপ জমাট বাঁধা অন্ধকার ওর সমস্ত মস্তিকের কোষে কোষে ছড়িয়ে যাবে। মৃত্যুর আগেও কী এমন হবে? ভাবল রোদ; যখন সব রোদ মুছে যাবে রোদের জীবন থেকে?

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না।

মেঘ হঠাৎ বলল, কে এমন করল?

তা-ই ত ভাবছি। চৌকিদারের ছেলে-টেলে হবে! আর কে? এখানে আমাদের সঙ্গে কারো ত শত্রুতা, চুরি-ডাকাতিও হয় বলে শুনিনি আগে।

যদি চোর-ডাকাতে করে থাকে? যাতে আমরা এখান থেকে চলে যেতে না পারি। —তার জন্য হয়ত করেছে। উদ্বেগের গলায় মেঘ বলল।

দামী জিনিসের মধ্যে এখানে কী আছে? এক তুমি ছাড়া ত দামী কিছুই নেই। তোমার শরীরের যা দাম তা ডাকাতি করার জন্যে মতলব এঁটে কেউ যদি কিছু করে থাকে ত অন্য কথা। ডাকাতরা ত তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি চুরি করতে পারবে না।

মেঘ ভয়ে সোজা হয়ে বসল। বলল, যদি রাতে ডাকাতরা আসে?

তখন দেখা যাবে। আমার কাছে পিস্তল আছে। তবে পিস্তল দিয়ে আজকালকার ডাকাতদের ত ঠেকানো যাবে না, তারা সেমি-অটোম্যাটিক ওয়েপ্‌নস্‌ নিয়ে আসে।

মেঘ বলল, আজ ভয়ে ঘুম হবে না। রাতে।

রোদ বলল, আচ্ছা আমরা যখন বেড়িয়ে ফিরে আসি তখন কি চাকাগুলো লক্ষ করেছিলে? আমরা যখন গেছিলাম, তখন কেউ হাওয়া খুলে দেয়নি ত?

তখন ত অন্ধকার। দেখব কী করে?

বলেই, মেঘ দৌড়েএল রোদের কাছে। বলল অ্যাই আমার ভয় করছে

গো, বাইরে বসে থেকো না, সব এমন করে খোলা রেখে। কেউ গায়ের উপর এসে পড়লেও দেখতে পাবে না অন্ধকারে।

রোদ বলল, তা ঠিক ; কিন্তু এলে শুনতে পাবো।

অন্ধকারে বুঝতে পারবে কেউ এলে ? অবাক গলায় মেঘ শুধলো।

রোদ বলল,হুঁ:, জঙ্গলের রাতে চোখের চেয়ে কানই ত বেশি কাজের।

অনেকক্ষণ পর মেঘ বলল, আমি একটা কথা বলব ?

বলো। বলল রোদ।

মেঘ বলল, আমি কিন্তু এখনও রেগে আছি।

ফারসট্ ক্লাস। জেনে খুশী হলাম। রাগ পড়লে আমাকে জানিও।

তারপর একটু চুপচাপ।

হঠাৎ রোদ বলল, চৌকিদার আসছে।

কি করে বুঝলে ? মেঘ শুধলো।

দেখতে পাচ্ছি যে।

বাজে কথা।

সত্যিই পাচ্ছি। অন্ধকারের মধ্যে কালো জিনিস নড়লে তাও দেখা যায়—অন্ধকারতর দেখায় কালোকে। আর সাদা ত দেখা যায়ই।

ভাল্লুকও ত হতে পারে। বলেই, মেঘ চেয়ার ছেড়ে দৌড়ে ঘরে গেল।

পরক্ষণেই আবার একা একা ঘরে থাকতে না-পেরে, রোদের কাছে এল।

চৌকিদার খুক্ করে একটু কাশল।

বলল, হুজৌর, বহুত পীট্‌কে আয়া শূয়ারকা বাচ্চোঁকো।

রোদ বলল, বহুত্ বুঢ়া বাত্। বাচ্চোঁকো পীট্‌না নেহী থা॥

চৌকিদার বলল, উলোগ্ তুরন্ত্ উ খনা ভি খতম কর দিয়া। মুসীব্বতকা বাত্। আভি্ ক্যা করেগা ? কোয়া পাকায়গা ?

খিচুড়ী।

ওপাশ থেকে বলে উঠল মেঘ।

মুগ্‌কা ডাল্‌সে। ওথা মীর্‌চা ডাল্‌কে! সাথ্‌মে মুচ্‌মুচ্ করতে আলু ভাজা আর পেঁয়াজী।

রোদ হেসে ফেলল। চৌকিদার ঘাবড়ে গেল।

রোদ চৌকিদারকে বুঝিয়ে দিল। তারপর বলল, এখন আমাদের একটু চা খাওয়াও। মালপত্র গাড়ি থেকে নামিয়ে নাও।

চৌকিদার আসতে মেঘ আবার ওর চেয়ারে গিয়ে বসেছিল। চৌকিদার একে একে মালপত্র সব নামিয়ে চলে যেতেই বলল, একটা কথা বলব ?

বলো।

আমার রাগ কিন্তু আর নেই। আর একটুও ঝগড়া হবে না। যতটুকু থাকব। তুমি দেখো।

অতি উত্তম কথা। তাহলে আমার কাছে আসা হোক। রোদ বলল।

বলার আগেই মেঘ দৌড়ে এলো। এসে ইজিচেয়ারের হাতলে বসল। ও রোদের ডান হাতটা ও দুহাতে তুলে নিজের কোলের উপর রাখলো।

বিকেলের হাঁটাহাঁটিতে একটু ঘেমেছে মেঘ। প্রসাধনের গন্ধ, সিল্কের শাড়ির মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে ওর বিকেলের ঘামের গন্ধ মিশে গেছে। মেঘের গায়ের গন্ধটা এখন লেবুপাতার মত। সমস্ত মস্তিষ্ক ভরে যায় সেই গন্ধে। বোদ বুঁদ হয়ে রইল।

মেঘ বলল, তোমার সঙ্গে জঙ্গলে আসা একটা এক্সপিরিয়েনস্। তুমি যে কখনও শহরে যাও, শহরে থাকো, তোমাকে এই পরিবেশে দেখলে মনেই হয় না।

রোদ বলল, থ্যাঙ্ক উ্য। তোমার সঙ্গে জঙ্গলে আসাও একটা এক্স-পিরিয়েনস। সকলের ভাগ্যে হবে না, সইবেও না।

মেঘ সামান্য শব্দ করে হাসল একটু।

তারপর বলল, তুমি তখন আমাকে অভিশাপ দিলে কেন ? বলো এবারে আমি এত আপ্‌সেট হয়ে পড়েছিলাম যে কী বলব ?

রোদ বলল, বুঝতে পেরেছিলাম।

বলো না প্লিজ—কী বলছিলে ভালো করে বুঝিয়ে বলো—আমি বুঝতে চাই শুনতে চাই কী বলছিলে।

রোদ সোজা হয়ে বসল। বলল, বলছি। মনোযোগ দিয়ে আমার জ্ঞানদান শোনো। একবারও ইনটারাপট করবে না কিন্তু।

বলো, শুনব, সত্যিই মনোযোগ দিয়ে শুনব।

রোদ হেসে ফেলল। বলল, দূর এরকম বক্তৃতার মত এসব বলা যায় না। কনসেপটটা ইনটারেসটিং—তুমি না-মানতেও পারো—অনেকেই মানেন না—কিন্তু আমারও একটা পয়েনট আছে।

তারপর একটু কেশে বলল, জানো মেঘ, আমার মনে হয়, আমরা কেউই কাউকে আমাদের হৃদয়ের সর্বস্বতা দিয়ে ভালোবাসতে পারি না। মানে তুমি যেরকম ভালোবাসার কথা বলেছিলে। অর্থাৎ আমাদের ভালোবাসার ক্ষমতাকে নিঃশেষিত করে আমরা কেউই কেবলমাত্র অন্য একজনকেই ভালোবাসতে পারি না। পারি না, কারণ, আমাদের প্রত্যেকের সত্তাই খণ্ডর সমষ্টি। অখণ্ড নয়। আমাদের বুকের মধ্যে অনেকগুলো টুকরো আছে, সেই টুকরোগুলো বাচ্চাদের কাঠের বাড়ি বানানোর খেলার টুকরোর মত। সব টুকরো সব জায়গায় খাপ খায় না। একটা টুকরো শুধুমাত্র তার পরিপূরণ যে শূন্যে হতে পারে সেই শূন্যতাতেই স্থান পায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, বলতে হয়, আমারা কাউকেই পরিপূর্ণভাবে পাইও না। পেতে পারি না পরিপূর্ণতায় প্রায়শঃই; দিতেও পারি না। তুমি যদি আমাকে পেয়ে থাকো তাহলে পেয়েছো আমার একটি টুকরোকে—আমি পেয়েছি তোমার টুকরকো—সে টুকরো-দুটি চিরদিনই আমার এবং তোমার। শুধুমাত্র আমাদেরই। তোমাকে টুকরো করে যা পেয়েছি এবং আমাকে টুকরো করে যা দিয়েছি তা আমিও দিতে পারবো না কাউকে; তুমিও না। যা আমরা পারি, তা এই খণ্ডটুকুকে অথবা খণ্ডের স্মৃতিটুকুকে ঝেড়েমুছে উজ্জ্বল করে রাখতে যাতে প্রাত্যহিকতার, সময়ের, বয়সের ছাপ না-পড়ে এতে।

মেঘ অন্ধকারে অনড় হয়ে বসে শুনছিল।

চৌকিদার চা এনে দিল। মেঘ চা বানিয়ে রোদকে দিল, নিজে নিল।

মেঘ বলল, বলো থামলে কেন? মেঘের গলাটা ভারী শোনাল।

রোদ চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, জানো এতসব কথা সকলকে বলা যায় না। বললে সকলে বোঝেও না। নিজের বুকের মধ্যেও কথাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়েই থাকে। যখন প্রকাশ করব বলে ভাবি, তখন ঠোঁটের কাছে তাদের নাগাল পাই না।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে রোদ বলল, খুব আস্তে আস্তে, আমরা নিজেরাও কি আমাদের অখণ্ডরূপে কখনও পাই? আমাদের নিজেদের কাছেও আমরা খণ্ড, বিচ্ছিন্ন, অধরা। সেইজন্যেই কখনও ভুলেও ভেবো না যে, কাউকে সব দিয়েছো বা সব পেয়েছো কারু কাছ থেকে। আমি শরীরের কথা বলছি না। শরীরটা নিতান্ত গৌণ। আমরা মানুষ। প্রধানত মন নিয়েই আমাদের লেন-দেন। আমরা একশ ভাগের নব্বুই ভাগই মনের

মানুষ আর দশ ভাগ শরীরের। মনের সঙ্গে শরীর যেখানে একসুরে গায় না সে গান, গান নয়; সে মিলন জান্তব মিলন। মানুষের মিলন নয়।

মেঘ অস্ফুটে বলল, তাই-ই যদি হয় তবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বিশ্বস্ত, খুশি, স্বামী-স্ত্রীও কি একে অন্যকে পরিপূর্ণভাবে পায় না বলে তোমার ধারণা?

রোদ হাসল। বলল, আমারই ধারণা—ঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, যে-পরিপূর্ণতার কথা তুমি বলছ, তা পরিপূর্ণ নয়, একক ত নয়ই। সেই পরিপূর্ণতা সংসারের মধ্যে থেকে উৎসারিত হয় বিভিন্ন ধারায়—বাবা, মা, ভাই-বোন, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা প্রত্যেকের কাছ থেকে। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে একজন মানুষের খণ্ড মিলন কিন্তু তার মানেই এই নয় যে, এতগুলি সম্পর্কের সঙ্গে তার লেন দেন বলেই পরিপূর্ণতার মধ্যে তার পরিপ্লুতি ঘটেছে। একাধিক খণ্ডের পরিপূর্ণতা আর সামগ্রিক পরিপূর্ণতা সমার্থক নয়। মেঘ বলল, বেশ গোলমেলে হয়ে গেল ব্যাপারটা। তুমি বলতে চাইছ পরিপূর্ণতায় কাউকেই আমরা পেতে পারি না, দিতে পারি না। তাই?

কাউকে পারি না যে, এ-কথা বলতে পারি না। পারো; পারি; একজনকে। আজ বিকেলে যখন আমরা বসেছিলাম, সামনের দিকে তাকিয়ে তখন সেই আশ্চর্য আদিগন্ত প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে তোমার মনে যে অনুভূতি হয়েছিল তা কি কোনো মানুষকে ভালোবাসার চেয়ে অনেক তীব্রতর নয়? তুমি মা হওনি। যখন হবে, তখন জানবে যে অপত্যস্নেহ প্রেমের চেয়ে অনেক গভীর বোধ। কিন্তু এ-কথাও বুঝবে কখনও হৃদয়ের অন্তস্তলে যে, অপত্যস্নেহের চেয়েও কোনো গভীরতর, ব্যাপ্ততর, তীব্রতর বোধ আছে।

রোদ হঠাৎ থেমে গেল।

মেঘ বলল, বলো?

রোদ বলল, তুমি এই অবধিই বুঝবে মেঘ। পরেরটুকু বুঝবে না, আমি বললেও না। কারণ এর পরেরটুকু বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, হৃদয়গ্রাহ্য; অনুভূতিগ্রাহ্য। তুমি বিজ্ঞানী, তুমি ভগবান মানো না। আমি মানি। মূর্তি মানি না, ধর্ম মানি না; কিন্তু ঈশ্বর মানি। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হঠাৎ হঠাৎ হয়ে যায়। যোগাযোগটা আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। তাঁর যখন খুশী তিনি আলো হয়ে আসেন, হাওয়া হয়ে আসেন, রোদ হয়ে, মেঘ হয়ে আসেন, ফুলের বাস, পাখির ডাক হয়ে, শোক হয়ে, আনন্দ হয়ে, বরাবর তিনি আসেন, এসে

পরিপূর্ণতায় আপ্লুত, শুদ্ধ, বিমুগ্ধ করে আবার পরমুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যান। এ কথা বোঝাতে পারার জন্যে আমাকে তোমায় ক্ষমা করতে হবে।

মেঘ বলল, তোমার মধ্যে গভীরতা আছে। আমার মধ্যে নেই। আমি তোমার মত করে ভাবতে চাই না, পারিও না। সব বুঝতেও না।

হঠাৎ রোদ থেমে গেল।

বাইরের আকাশে তখন মেঘ সরে গিয়ে এক-এক করে তারা ফুটছিল—সবুজ আলো ঝরছিল অন্ধকারে, বুনো চাঁপার গন্ধ ভাসছিল হাওয়ায়; রাতচরা পাখি ডাকছিল। গা শির্ শির্ করছিল ভেজা হাওয়ায়।

মেঘ ভাবছিল।

রোদ ভাবছিল।

কেউ কথা বলছিল না।

রোদ ভাবছিল ওকি যাত্রাদলের লোক? নইলে কেউ এত বড় বড় কথা এক নাগাড়ে এতক্ষণ বলতে পারে? তারপরেই রোদের মনে হল, ও নিজে বোধ হয় বলেনি। কখনও এত কথা ও ভাবেওনি। এই অন্ধকারের মধ্যে কে যেন তাকে দিয়ে বলাল—অনেকদিন যেসব কথা কাউকে বলতে চেয়েছিল, স্বপ্নে যেসব কথা ছুঁয়ে গেছিল ওকে, কিন্তু যা কখনও বলতে পারেনি। মেঘ উপলক্ষ হলো।

বড় হালকা লাগছিল রোদের। বড় ভালো লাগছিল। ঝিঁঝির ডাক, বুনো চাঁপার গন্ধ, সোঁদা মাটিতে শ্যাওলার হালকা বাস। ও চোখের পাতা ফেলছিল আর ওর চোখের মণির সঙ্গে লক্ষ্য যোজন দূরের অনামা তারাদের যোগ ঘটছিল এক মসৃণ সরল সবুজ আলোকরেখায়।

অনেক অনেকক্ষণ পর, যেন বড় দূর থেকে মেঘ বলল, চলো গা ধোবে না? মিছিমিছি সব প্যাক করা হলো। আবার ত সবই খুলতে নামাতে হবে।

হুঁ। স্বগতোক্তির মত বলল রোদ।

রোদ হঠাৎ বলল, কাল রাতে তুমি কী সাবান মেখেছিলে?

মেঘ বলল, ওমা! আমি ভাবছিলাম, তোমাকে জিজ্ঞেস করব তোমার সাবানটার কথা। তোমার সাবানটা আমাকে দেবে?

রোদ হেসে বলল, নিজের শরীরের সুগন্ধ কি নিজের জন্যে? বোকা!

ঘরে যেতে যেতে মেঘ বলল, একটা কথা বলব? রাগ করবে না?

আমি তার আগে তোমাকে একটা কথা বলি! রোদ মেঘের মুখের কথা কেড়ে বলল।

বলো।

গাড়ির চাকার হাওয়া তুমিই খুলেছো? তাই না?

ঈসস্ কী অসভ্য! বাচ্চা মেয়ের মত হেসে উঠল মেঘ।

বলল, তুমি জানতে? জেনেশুনেও এতক্ষণ চুপ করে ছিলে কেন?

চুপ করে ছিলাম এই জন্যে যে, চৌকিদারের ছেলের বয়স আর তোমার মনের বয়স একই। ছি: ছি:! ছেলেটাকে মার খাওয়ালে।

সরী, আয়্যাম্ একস্ট্রিমলী সরী? বলল মেঘ।

॥ ৩ ॥

ওদের দুজনেরই গা-ধোওয়া হয়ে গেছিল। শোয়ার ঘরে খাটের ওপরে আগোছালো হয়ে ওরা কাছাকাছি আধশোয়া ছিল। চৌকিদারের খিচুড়ি হয়নি তখনও।

মেঘ হঠাৎ বলল, তুমি এত সব কথা যে বললে, এ নিয়ে চান করতে করতে ভাবছিলাম। সত্যি এমন করে যে দেখা যায়, ভাবা যায় আমার জানা ছিল না। তুমি এত ডিট্যাচড্ হয়ে এসব দ্যাখো কি করে?

রোদ হাসল। বলল, তুমিও পারবে।

তারপর একটু পরে বলল, কাল সকালে দুরবীনটা উল্টোদিকে ধরে বাইরে, আমার সামনের চেয়ারে বসে আমাকে দেখো—দেখবে আমি কতদূর চলে গেছি—চমৎকার দেখাবে কিন্তু—টেবল-চেয়ার সব—আমার সমস্ত পারিপার্শ্বিক পরিবেশসুদ্ধু আমি বহু দূরে চলে গেছি দেখবে—নিখুঁত পরিচ্ছন্ন দেখাবে তখন আমাকে—অনাবিল।

এমনি করে দূরবীনের উল্টোদিক দিয়ে যেদিন নিজেকে নিজে দেখতে শিখবে সেদিন তুমিও পারবে।

অবাক হয়ে মেঘ বলল, মানে?

রোদ বলল, নিজের বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের পরিবেশ পারিপার্শ্বিক সব ছাড়িয়ে এসে দূর থেকে নিজেকে চুপি চুপি দেখতে পেলেই তুমি নিজেকে নিজের নিজস্বতায়, স্বকীয়তায় আবিষ্কার করবে। সত্যি বলছি; দেখো তুমি।

মেঘ বলল, আমি অত সব দেখতে চাই না। জানতে চাই না। বলছি ত। কাল রাতের মত, তোমার হাতে মাথা দিয়ে শুয়ে, তোমার কাছে, খুউব কাছে থেকে তোমার মধ্যে আমার আমিকে হারিয়ে ফেলতে চাই। তুমি তোমার মস্তিষ্ক দিয়ে ভালোবাসাকে কেটে টুকরো টুকরো কোরো, বুদ্ধিমানের ভালোবাসার প্রকৃতি বিচার কোরো—আমি ততক্ষণ বোকার মত আমার হৃদয় ভরে তোমাকে ভালোবাসবো। তুমি তোমার মত হয়ে; থেকো; আমাকে আমার মতই থাকতে দাও।

রোদ হাসল। খুশী দেখালো ওকে, একটু বিব্রতও।

ও বলল, তুমি তাহলে বোকাই থাকতে চাও। দূরবীনের উল্টোদিক দিয়ে দেখতে চাও না কিছু? দেখোই না একদিন। সোজা দিক দিয়ে ত সকলেই দ্যাখে। তুমি সকলের থেকে আলাদা হতে চাও না?

মেঘ বলল, চাই না, একটুও চাই না। বলে রোদের ডান হাতটা ওর ঠোটের কাছে তুলে নিল দু'হাতে। ওর ঠোটে ঘষল রোদের হাতের চেটো।

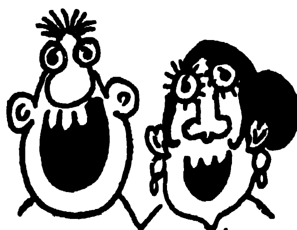
বলল, আমি সাধারণই হতে চাই, থাকতে চাই।

রোদ অধৈর্য গলায় বলল, কিন্তু কেন?

মেঘ বলল, আমি সুখী হবো বলে, চিরদিন সুখে থাকবো বলে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বত্রিশপাটি দাঁত



চোদ্দ বছরের পুরনো দম্পতি শুয়ে আছে চোদ্দ বছরের পুরনো খাটে, চোদ্দ বছরের পুরনো বিছানায়, ঢাউস একটা লেপ গায়ে দিয়ে। লেপের অন্তঃকরণটি প্রাচীন বাইরের খোলটি নবীন মারকিন। খুব কম পাওয়ারের নীল একটা আলো পায়ের দিকের দেয়ালের গায়ে জ্বলছে। ক্রীম রঙের দেয়ালের গা বেয়ে সবুজ ধারায় গড়িয়ে এসে একটা ফটোর কিনারায় আটকে গেছে। তলার দিকে গভীর একটা ছায়া। ছায়া ফেলেছে ওই নিদ্রিত দম্পতি। রাগ রাগ মুখ করে ডানপাশে বিকাশ, বাঁপাশে অল্প একটু ঘোমটা টেনে আরতি। আরতির মুখে ঠিক হাসি নয়, হাসির ওয়াশে চাপা বিজয়িনীর মুখ। ফটোগ্রাফার বিকাশের বুকের একপাশে আরতির কাঁধটা লেপ্টে দিয়ে অন্তত ওই ছবিটা যতদিন না ধূসর হয় ততদিন এই প্রমাণ রেখে গেছেন— তোমরা দুজনে দুজনের বড় কাছের মানুষ। কাছাকাছি, পাশাপাশি থেকে লেপ্টা-লেপ্ট করে সংসার কর। কমলি যখন পাকড়েছে মিঞা, সহজে নেহি ছাড়েগা। দরকোচা মারা ফোড়ার গায়ে তোকমারির পুলটিসের মত আটকে থাকবে। সম্পর্ক যত শুকোবে আঠা তত আঁটোসাঁটো হবে। ছবিটা বছর সাতেক আগের যে রাতে, যে মেজাজে তোলা তাতে ছবির ফ্রেমে একজন থাকলে আর একজনের থাকা উচিত ছিল না। থাকলেও দুজন দুপিঠে থাকলে উচিত বিচার হত। ছবি তোলা নিয়েই সন্ধ্যের ঝগড়া রাত আটটা নাগাদ কাপ ডিশ ছোঁড় ছুড়ির পর্যায়ে এসে যখন আরো বড় কিছুর দিকে বাঁক নেবে নেবে করছে ঠিক তখনই ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড বিশালসমরেশের আগমন। সমরেশ দুপক্ষকে সংযত করে বিকাশকে ফ্রয়েড শেখালো। ফ্রয়েড সাহেবের

কায়দা। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর একদিনই একটু খিটিমিটি হয়েছিল অতি সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে—মুরগীর মাংস। তারপর সেই রণক্ষেত্রে সমরেশ নিজেই উদাহরণ হাজির করেছিল। সে নাকি প্রতি সপ্তাহের গোটা রবিবারটাই বৌয়ের পায়ে জবাফুলের মত উৎসর্গ করে দিয়েছে। ছোটো এক কামরার ফ্ল্যাটে দুজনে মুখোমুখি বসে থাকে। আদর টাদর করে। পাকা চুল তুলে দিয়ে সাহায্য করে। উকো দিয়ে গোড়ালী মেজে দেয়। পেটিকোটের দড়ি পরিয়ে দেয়। কখনো গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যায়। টানা ট্যাকসিতে লেকে নিয়ে গিয়ে ঝালমুড়ি খাওয়ায়। পিঠের মাশরুম স্পঞ্জ দিয়ে সাফা করে দেয়। সামান্য একটা ছবি নিয়ে এই দক্ষযজ্ঞ! মিটসেফ থেকে নতুন কাপ ডিশ বের করে তিনজনে চা-চানাচুর খেয়ে রাত নটা নাগাদ আই ভি স্টুডিওতে গিয়ে বিকাশ বৌ নিয়ে ফ্লাড-লাইটের সামনে বসেছিল। ফটোগ্রাফার কানু পকেট থেকে চিরুনি বের করে বিকাশের টেরি ঠিক করে দিয়েছিল। দুজনের সেই মুহূর্তে সাগরপ্রমাণ মানসিক ব্যবধান থাকলেও দৈহিক ব্যবধান কমাতে কমাতে রুটির বুকে রুপণের মাখন করে দিয়েছিল। একটু হাসি হাসি মুখ হয়নি। দেরিতে আসা কেরানির দিকে অফিসের বড়বাবুর তাকানো মুখের মত হয়ে গিয়েছিল।

সেই মাল দুটি এখন লেপের তলায়। মশারির বাইরে মেঝের ওপর পৌষের শীত হামা দিচ্ছে। বন্ধ জানলার বাইরে শীত হি হি শব্দ করছে। বিকাশ এমনিই একটু ঘুমকাতুরে তার ওপর শীত, তার ওপর লেপটা সারাদিন ছাদে রোদ খেয়ে আরতির প্রথম যৌবনের মত মোলায়েম গরম হয়েছে, তার ওপর নতুন ওয়াড় পড়েছে। আগের রাত পর্যন্ত যে ওয়াড় ছিল তাতে সারা রাতে পালা করে হয় স্বামী না হয় স্ত্রী হারিয়ে যেত। দরকারের সময় গলা শুনতে পেলেও কেউ কাউকে খুঁজে পেত না। বেশ ঘুলঘুলি সাইজের গোটা কতক ফর্দাফাই ছেঁড়া। সেই গবাক্ষ দিয়ে ঘুমের ঘোরে হয় বিকাশ না হয় তার বৌ লেপের খোলের গভীর জগতে সেঁদিয়েবসে থাকতো। কখনো কখনো খোলের মধ্যে দুজনের দেখা হয়ে যেতো। সেটা অবশ্য চানস। বেশির ভাগই একপক্ষ বাইরে, একপক্ষ ভেতরে। কয়েক রাত আগে আরতিই গিয়েছিল লেপের উদোম লাল টকটকে বুকে উষ্ণতা খুঁজতে। তারপর দুঃস্বপ্ন দেখেই হোক কি লেপ আর ওয়াড়ের যৌথ আদরে দম আটকে গিয়েই হোক গোঁ গোঁ শব্দ করে বিকাশের ঘুম চটকে দিয়েছিল। বিকাশ কারার

ব্রিগেডের কায়দায় একটানে ঘুলঘুলি ঘুলঘুলি ফর্দাফাঁই করে গোঁ গোঁ—আরতিকে লেপের গভীর জগৎ থেকে উদ্ধার করে এনে ভেবেছিল—খোলের মধ্যে মানুষ ঢোকার মত লেপ ঢোকানোটা যদি সহজ হত! মুক্ত আরতির ব্যাপারটা ছিল অন্য। আলো দেখতে না পেলে তার দম আটকে বোবা লেগে যায়। হঠাৎ চোখ খুলে দেখি নীল আলো নেই। চরাচর ব্যাপ্ত করে গভীর ঘন অন্ধকার। তুমি নেই, আমি নেই কেউ নেই, কেউ নেই, গোঁ গোঁ। কালই তুমি ওয়াড়ের কাপড় কিনে আনবে। কি রাক্ষুসে ওয়াড়ের বাবা। কোন দিন দেখবো দুজনই ওর মধ্যে মরে কাঠ হয়ে আছি। ভাগ্যিস তুমি বাইরে ছিলে, স্যর ল্যান্সেলট। তোমাকে উদ্ধার করার জন্যে লেডি অফ দি শ্যালট। সদ্য উদ্ধার প্রাপ্ত রাজকন্যা আরতি এরপর যা করেছিল আরো সুন্দর। ওয়াড়ের একটা ঘুলঘুলির মধ্যে দুটো পা ঢুকিয়ে দোলায় শুয়ে সেয়ানা শিশু যেভাবে খলবল করে পা ছোঁড়ে, বিছানায় অর্ধ-শোয়া হয়ে সেইভাবে পা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে লেপের খোলটাকে ছিড়ে কুটিকুটি করে একটা তৃপ্তির হাসি হেসে বলেছিল, শত্রুর শেষ রাখতে নেই, দাও এক গেলাস জল গড়িয়ে দাও। এতবড় একটা কাজের পর যে কোনো স্বামীরই উচিত স্ত্রীকে এক গেলাস জল কেন, এই শীতের রাতে লেমনেড মিশিয়ে এক কাপ জুস দিয়ে জিন কলিন্স ঠোটের ডগায় তুলে ধরা। জলের গেলাসটা ঠক করে কোনের টেবিলে রেখে আরতি আদেশের সুরে বলেছিল, কালই চ'মিটার পুরু-সংকল্প। স্ত্রীর এঁটো গেলাস কে আর এই রাতে ধুতে যায়। সেই গেলাসে সেই জল ঢেলে স্ত্রীর না-চুমুক-দেওয়া অংশটা আন্দাজ করে জল খেতে খেতে বিকাশ বলেছিল—মাসের শেষ, তলানি গোটা দশেক টাকা পড়ে আছে, মাসটা কাবার করে ওয়াড়ের কাপড় আনা যাবে।

আহা শুধু লেপ গায়ে দেওয়া যায় নাকি, খারাপ হয়ে যাবে না!

দিন চারেকে কি আর উনিশ-বিশ হবে। খোলে ঢোকালেই কি যৌবন ফিরে আসবে।

এমন লেপ পাচ্ছো কোথা, বাবা একটা সেরা জিনিস দিয়ে গেছেন। যেমন গরম, তেমন নরম, তেমনি বিশাল! ছেলে, মেয়ে, স্বামী স্ত্রী প্লাস একটা পাশবালিশ ঢোকা তলিয়ে যাবে।

আলো নিভিয়ে সে রাতের মত সেরা লেপের ধূসর লাল জগতে তলিয়ে যেতে বিকাশ যে কথাটা ভেবেই ছিল সোচ্চারে বলতে পারেনি তা হল

শ্বশুর মশাই সেরা দুটি বাঁশ তাঁর ঝাড় থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন, একটি লেপ আর সেই লেপের তলায় ঢোকার সংগী লেপাক্ষি আরতি। লেপটা অবশ্যই বড়, আশাতীত বড়, লেপ যিনি দিয়েছিলেন তাঁর হৃদয় তাঁরি মেয়ের হৃদয়ের চেয়ে বড়। প্রথম বিয়ের হুটোপাটির তিন মাসে বিকাশ মনে মনে লেপটার প্রশংসা না করে পারেনি। বেড়ে ফ্যামিলি সাইজ। নতুন বিছানায় ঔরঙ্গাবাদের রেশমী চাদরে দুটো পিচ্ছিল প্রাণী যখন মাছের মত কিল-বিল করত গড়ের মাঠের মত বিশাল লেপ তখন বিশ্বাসঘাতকতা করে বাইরের শীতলতায় কোনদিন তাদের ফাঁস করে দেয়নি। একটি সন্তানের আগমন এবং তার বোধবুদ্ধি হবার পরও লেপ তার অন্তরালে মাঝেসাঝে একটু বেশি কাছাকাছি একটু বেশি সাহসী হবার সুযোগ করে দিয়েছে। এখন এই মধ্য বয়সে সংসার যখন সব নির্যাস নিংড়ে নিয়েছে, শরীর যখন সব বাষ্প মোচন করে বাতিল বয়লার হয়ে গেছে তখন এ-লেপ বাঁশ ছাড়া আর কি! মনে তো এখন গুনগুন গান, কম্বলবস্ত্র, কৌপীনমস্ত ; খলু ভাগ্যবন্ত। এই লেপ রোজ সকালে তাকেই তো পাট করে ভাঁজ করে গুছিয়ে রাখতে হয়। সেই সময় নড়া ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। ঘাড়ে করে ছাদে রোদ খাওয়াতে তোলার সময় মালুম হয়, সংসারের ভার একটি স্ত্রীলোককে বহনের ভার। গ্রীষ্মে সিলিং থেকে দোলানো জাফরী কাঠের পাটাতনে ঝোলাতে গিয়ে টাল খেতে হয়। তারপর বৎসরান্তে শীত যখন জানালার কাঁচে নাক রেখে ধোঁয়াটে নিশ্বাস ছাড়ে তখন আবার চেয়ারের ওপর টুল রেখে শরীরের ভারসাম্য বজায় সেই লেপ নামাতে হয়। প্রথমে নামে লেপ সঙ্গে সঙ্গে নামে ধুলো, নামে বড় মাকড়সা, নেংটি ইঁদুর, তেলাপোকা।

নতুন ওয়াড়ের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে সেই লেপের তলায় প্রথমে ঢুকেছে বিকাশ, পাশে এসে কুকুরকুণ্ডলি হয়ে শুয়েছে আরতি। সারা বছর এইটাই তার শোবার ধরন। বিকাশ চিরকালই বুকে হাতদুটো ভাঁজ করে রেখে চিৎ হয়ে শোয়। জাগ্রত অবস্থায় ঠোঁট দুটো বোজানো থাকে। ঘুমোলে শরীর যেই আলগা হয়, নিচের ঠোঁটটা বাজে কাঠের জানলার মত অল্প একটু বেঁকে ফাঁক-দাঁত হয়ে যায়। তারপর যতই সে ঘুমের গভীরে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে থাকে ততই সেই ছুঁচো ফাঁক মুখ দিয়ে শিসের মত এক ধরনের হিস হিস শব্দ বেরোতে থাকে। দুজনের এই দুধরনের শোয়া নিয়ে মাঝে দিনকতক দুজনের মধ্যে দক্ষযজ্ঞ হয়েছে। আরতির ঘুম পাতলা।

ভাঙা বাড়ির ফাটলে হাওয়ার শব্দের মত বিকাশের ঘুমন্ত সাইরেনে ঘুমোতে না পেরে আরতি বিকাশকে ঠ্যালামেরে জাগিয়ে দিয়ে প্রথম প্রথম অনুরোধ করেছে—পাশ ফিরে শোও। অনুরোধ যখন বিফোল হয়েছে তখন বালিশ নিয়ে মেঝেতে নেমে শোবার ভয় দেখিয়েছে। অবশ্য নেমে শোয়নি। কখনো। মেঝেতে বড় রিপু ভয়—ইঁদুর, আরশোলা, বিছে। বিকাশ আবার 'দ' হয়ে শোয়া পছন্দ করে না। এইভাবে যারা শোয় তাদের চরিত্র ভয়প্রবণ। মনে মনে তারা অসহায়, অবলম্বন খুঁজছে। অবলম্বন হিসেবে বিকাশ তো পাশেই রয়েছে। তবে কেন 'দ' হয়ে শোয়া। তার মানে বিকাশের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল নয় সে। তাছাড়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। সোজা হয়ে শোও। আরতি আদেশ মান্য করার চেষ্টা করেছে। চিৎ হয়ে শুয়েছে। তারপর ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে শুয়ে আবার যে-কে-সেই। ঘুমন্ত আরতির দুটো পা টেনে সোজা করতে গিয়ে বিকাশ হয়ে গেছে—দারা সিঙের কাঁকড়া প্যাঁচ। টেনে খোলা যায় না। হিষ্টিরিয়া রোগীর দাঁতি লাগা চোয়াল। অবশেষে দুজনেই দুজনকে মেনে নিয়েছে। জাগরণের ইস্টিসান না পৌঁছনো পর্যন্ত বিকাশের ইঞ্জিন ষ্টিম ছাড়বে। খটাস করে আরতির পায়ের খিল খুলবে না।

দূরে রাস্তার বাঁকে শীতের রাতের কুকুর ঝাপসা কুয়াশার ভূত দেখে কাঁদছে। দেয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলাম বাইরের প্যাসেজে হাইহিল জুতো পরে পায়চারি করছে। বিকাশের মুখ দিয়ে হাওয়া শিসের শব্দে অক্সিজেন কার্বন ডাই অকসাইড আদান প্রদান করছে। আরতি হাঁটু দিয়ে নিজের হজম যন্ত্র চেপে বদহজমের সাধনা করছে। কোথাও কোনো গোলমাল নেই। ছেলে আর মেয়ে আলাদা ঘরে বেহুঁশ। খাবার ঘরের মিটসেফ ইঁদুর পাঁপড় চিবোচ্ছে। বাথরুমের কলে টিনের বালতিতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। একতলা থেকে দোতালায় ওঠার সিঁড়ির উত্তরের জানলায় ভাঙা কাঁচ দিয়ে অন্ধকারের সঙ্গে আলো আর সাদা কোয়াশার মিশেল তৈরি হচ্ছে।

বিকাশের ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। এক ঘুমে রাত কাবার করার মত পরিশ্রম সে এখনো করে। কোথায় যেন একটা বেড়াল ডাকছে ম্যাও ম্যাও করে। না, পাশাপাশি কোনো বাড়িতে নবজাতক শীতে ওঁয়া ওঁয়া করছে! না দূরে নয়তো ঘরে! ঘরে বেড়াল! ঢুকলো কি করে! জানলা দরজা সবইতো বন্ধ! মনে হচ্ছে বিছানায়! লেপের তলায়! কে রে! বিকাশ

কান খাড়া করে শুনলো। তার ডানপাশে লেপের মাথাটা জড়িয়ে গোল আর সেই গোল বস্তুটির তলা থেকে শব্দটা আসছে—উরে বাবারে! উরে উরে। উউ! বিকাশ গোটানো লেপটাকে আরতির মাথার তলা থেকে টেনে সোজা করল। লেপের সঙ্গে কিছু উস্কো চুল লেপের বাইরে বেরিয়ে এল। বিকাশ এইবার লেপটা উল্টে আরতির মুখটা বের করল। শব্দটা বেশ স্পষ্ট আর সুরেলা হল—উরে, উউ, উরে। দুহাত দিয়ে গাল চেপে ধরে 'দ'-আরতি আর্তনাদ করছে। বিকাশ হাত দিয়ে বস্তুটিকে সোজা করল। নীল আলোয় মুখে যন্ত্রনা স্পষ্ট, চোখে জল। কি হল কি? অ্যাঁ কি হোলো! বলবেতো কি হল!

দাঁত, উরে বাবারে দাঁত।

দাঁতে আবার কি হেলো?

ভীষণ যন্ত্রণা!

পাশ ফিরে শোও। কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে রাখো, কমে যাবে। মাঝ-রাতে দাঁতের যন্ত্রণার এর চে ভাল দাওয়াই বিকাশের জানা ছিল না।

পাঁশ ফিঁরে শুঁলে কিঁ হবে গোঁ!

কি গোঁ গোঁ করছ তখন থেকে! ভূতে ধরল নাকি! বিকাশ বিরক্তিটা ঠিক চেপে রাখতে পারলে না। বেশ নরম গরম বিছানায় দিব্য ঘুম দিচ্ছিল। কোনো ভালো স্বপ্নও হয়তো দেখছিল। আরতির অ.়ার রাগ আর অভিমান দুটোই বেশি। প্রকাশ, চোখের জলে। অস্বাভাবিক মুখের ধরনে। বেশ তোলো হাঁড়ির মত মুখ হলেই বুঝতে পারে বিকাশ—খেপী খেপেছে। ছেলেবেলায় আরতির আদরের ডাক নাম ছিল খেপী। বিয়ের পর বিকাশ অন্যান্য লুক্কায়িত তথ্যের সঙ্গে এটা জেনেছে। বিকাশের খোঁচা খেয়ে, আরতি ঘুরে বিকাশের দিকে পিছন ফিরে শুলো। চোখে দাঁতের যন্ত্রণার জলের সঙ্গে অভিমানের ডোজ যুক্ত হল। বিকাশ বুঝতে পারে না বিপদে পড়েও মানুষ কি করে রাগতে পারে! বিপদের প্ল্যাটফর্ম হল বন্ধুত্বের, সমপর্ণের হাত মেলাবার। বিকাশ বালিসে আধশোয়া হয়ে বললে—একেই তুমি রাগপ্রধান এখন দাঁতের ব্যাথায় একেবারে কালোয়াতী। যখন সাবধান করেছিলুম তখন শোনোনি কেন? এখন

মরো? লেপের ভেতর থেকে উত্তর এল-কি সাবধান করেছিলে? উঁহুঁ হুঁ। সরি।

প্রথম হোলো চিনি, চাযে সাধারণ মানুষ ক চামচে চিনি খায়? ম্যাক্সিমাম দু চামচে। তুমি। তিনে গিয়েও তোমার থামতে আপত্তি চার হলেই ভাল হয়। ভাবছো আমাকে বাঁশ দিচ্ছো, আজ্ঞে না নিজেকেই নিজে দিচ্ছো বাঁশ। আমার কি হবে। কাঁচকলা! খাওনা মাসে বিশ কিলো চিনি খাও যতদিন চাকরি আছে দিয়ে যাবো, সেভিংস নীল। চোখ বুজলেই হাতে হারিকেন। চিনি চকোলেট রসগোল্লা. সন্দেশ দাঁতের যম। এখন সামলাও ঠ্যালা।

বিকাশ দম নেবার জন্য থামলো। যদিও ভীষণ যন্ত্রণা তবু আরতি চিনির খোঁটার ওর না দিয়ে পারলো না।

বিশ কিলো কবছ। গত মাস ওঁরে বাবারে, রেশন ছাড়া দশ কিলো বাড়তি এসেছে। তাও এক কিলো মনুর মার কার্ড থেকে ম্যানেজ করেছি। উঁহুঁ হুঁ!

দশ কিলো চিনির দাম জানো। দু'কিলো চার দাম জানো! একটা বড় কফির দাম জানো? শালা গৌরী সেনরে? ভেবে ভেবে চুল পেকে গেল। জানার মধ্যে জানো, ড্রেস সার্কেল ব্যালকনি স্টল?

ঠিক আছে দিনে দুবার চা খেতুম কাল থেকে খাবো না। পারি নিজে রোজগার করে খাবো?

—মাসে পকেট মেরে রোজগার তো কম হয় না?

—শেষ মাসে তো সবই হাতিয়ে নাও। চিনি, চিনি, চিনি নিজে তো দিনে বার দশেক চায়ে-তে কফিতে খাও তাও একে রানে রক্ষে নেই দোসর লক্ষ্মণ। বন্ধু বান্ধবের তো অভাব নেই। তারপর রোজ চাটনি।

চাটনির জন্যে বড় বাজার থেকে ভেলি এনে দি পাঁচ কিলো। চাটনিতে চিনি ঢোকাচ্ছো কি? আর নিজের বন্ধুদের কথা ভুলছো কি করে? রামের মা, রমাদি ভুলো কল্যাণী বাপের বাড়ি। —তারা ন মাসে, ছ মাসে আসে। এর ওপর চুরি আছে।

—চুরি! বিকাশ শুয়ে পড়েছিল, আবার আধ-শোয়া হোলো। চুরি-চুরি, মিথ্যে কথা ধাপ্পাবাজি এসব সহ্য করতে পারেনা। পৈতৃক গুণ। বিকাশ বললে, মনুর মাকে কাল সকালেই ডিসচার্জ। শেষ মাস, হাতে টাকা নেই।

যেখান থেকে পারি ধার করে, এক মাসের মাইনে, নাকের ডগায় ছুঁড়ে দিয়ে গেট আউট। তোমার অসুবিধে হয় যদ্দিন না লোক পাচ্ছি তুমি নিজেই বাসন মাজবে।

উরে বাবারে? পুরোটা না শুনেই উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। মন্থর মা তোমার মার আমলের লোক, সে সব থাকতে চিনি চুরি করতে যাবে কোন্ আক্কেলে? চোর তোমার ছেলে আর মেয়ে। সারাদিন মুঠো মুঠো চিনি ধ্বংস।

বিকাশ সোজা উঠে বসল গ্যাঁট হয়ে। বড় বড় মাথার চুল খামচে ধরে কিছুক্ষণ এমন ভাবে বসে রইল যেন বজ্রাঘাত হয়েছে। মুখে ছি-ছি শব্দ। ছি-ছি ছি-ছি, তুমি তো আগে কখন বলনি। চোর, চুরি। এত খাচ্ছে। তবু চুরি ইস্, ইস। এই নীচতার তো একটা ব্যবস্থা করতে হয়! ইমিডিয়েটলি একটা ব্যবস্থা করতে হয়। বিকাশ কোল থেকে লেপটা ফেলে দিল।

কি ব্যবস্থা তুমি করবে! এই রাত আড়াইটের সময়? ধরে ঠেঙাবে?

ঠ্যাঙা ঠ্যাঙি আমার কোষ্ঠীতে নেই। বুঝলে! ওসব মধ্যযুগের জিনিস আধুনিক কালে অচল, আমার হল অন্য টেকনিক। সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেণ্ট। একমাস আর কিছুনা স্রেফ চিনি খাইয়ে যাব মুঠো মুঠো কিলো কিলো।

আরতি যন্ত্রণায় আর একবার কুঁই কুঁই করে উঠে বললে—দাওনা। যদি তোমার কাছে কোনো বড়িমাড় থাকে!

—থাকলেও দোবো না। কথায় কথায় তোমার বড়ি। অষ্ট প্রহর শুধু হরিনাম সংকীর্তনের মত, তোমার মাথা ধরা না হয় বুক ধড়ফড় ন হয় পেটে ব্যথা এখন গোদের ওপর বিষফোঁড়া, দাঁতের যন্ত্রণা। শরীর নিয়ে ইয়ারকি। গোটা গোটা সুপুরি খাবার সময় মনে ছিল না কাঠ খেলেই আঙরা দাস্ত হয়।

বাগানে এতগুলো সুপুরি গাছ, আমি না খেলে খাবেটা কে?

—গাছগুলো বেড়া দেবার পারপাসে পূর্ব পুরুষরা করেছিলেন। তোমার সুপুরি বিলাসের জন্যে করা হয়নি। বেশী সুপুরি খেলে কি হয় জানা আছে? দাঁত যায়, কিডনীতে স্টোন হয়, ক্যানসার হয়। ইমপোটেণ্ট হয়ে যায়?

—সে আবার কি?

—সে বোঝার ক্ষমতা থাকলে রোজ রাত্তিরে পাশে শুয়ে শুয়ে ঘণ্টাখানেক

ধরে বাঘিনীর হাড় চিবোবার মত কটাস্ কটাস্ করে আস্ত আস্ত সুপুরি চিবিয়ে নিজের বারটা বাজাতে না। স্লেভ অফ হ্যাবিটস। তোমার জন্যে আমার এতটুকু করুনা নেই? তোমার বার মাসে তের পার্বন! আইবুড়ো বেলায় দাঁত মাজতে? আরতি কোনো উত্তর দিলনা। দাঁত চেপে পড়ে রইল। বিকাশ মশারির একটা পাশ তুলে তেড়ে ফুঁড়ে নেমে পড়ল? ভেবেছিল মেঝেতে পা দিয়েই অভ্যস্ত জায়গায় চটি জোড়া পেয়ে যাবে। পায়ের পাতা ঠাণ্ডা মেঝেতে ছ্যাঁক করে উঠলো। কি হল? মাথা নিচু করে দেখলো একপাটি জুতো উল্টে আছে আর একপাটি চলে গেছে খাটের তলায়। বাঃ বাঃ? লাথি মেরে জুতোটাকে খাটের তলায় পাঠিয়ে দিয়েছো? কেনো একটা সেনস্ অফ ডিসেন্সি নেই? মরো শালা এখন হামাগুড়ি দিয়ে? দাঁতের যন্ত্রণা? বিকাশ বিকৃতি গলা করল? দাঁতের যন্ত্রণাতো সাতখুন মাপ।

খাটের তলাটা যেন আরো ঠাণ্ডা। পাশ থেকে আলো গড়িয়ে এসে যেটুকু দেখা যায়! এটা আবার কি! ও উলের গোলা? সোয়েটা'র হচ্ছে না গুষ্টীর পিণ্ডি হচ্ছে? জুতো উদ্ধার করে বিকাশ ফিরে এল? চটি পায়ে দিয়ে ফটাস ফটাস করে খানিক ঘরময় ঘুরলো। তোমার আর কি? কাল সকালে ছটার মধ্যে বেরোতে হবে কে এক শালা আসছে এবার পোর্টে। এদিকে সারারাত ঘুম নেই।

তুঁমি ঘুমোঁও নাঁ। আঁমার জন্যে তোঁমায় জাগতে হবে না। আমার জন্যে যম জাগবে।

তুমি যমের অরুচি। চোদ্দ বছর দেখছি তো? একটুতেই কাতর। মনে আছে সেবার? ভীষণ ব্যাপার, ভীষণ ব্যাপার, চলাও স্পেসালিষ্ট। বত্রিশ টাকা চোট? কি ব্যাপার! না একটু কোলাইটিস মত হয়েছে। দাও জোলাপ। অল ক্লিয়ার। তোমাকে জানিনা, আদরের ননী!

—তুমি শুয়ে পড় না আমি মরছি মরতে দাও।

দাঁতের ব্যাথায় কেউ মরে না। অন্যকে মারে। অত চিৎকার করার কি আছে? মনে আছে? আমার একবার কার্বাঙ্কল হয়েছিল?

আরতি চুপ করে রইল।

তার মধ্যেই তোমার সিনেমা চলছে, যাত্রা চলছে, বোনের বাড়ি চলছে।

ছ ছটা মুখ। যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি। মুখে টুঁ শব্দটি নেই। মনে মনে বলছি, কা তব কান্তা! পিসিমা এসে ড্রেস করে দিয়ে যাচ্ছেন। বিবেকানন্দের টেকনিক চালাচ্ছি। ব্যাথার জায়গা থেকে মনটা উইথড্র করার চেষ্টা করছি।

আরতি চুপ করে থাকতে পারল না। না, তোমার জন্যে তো আমি কিছুই করিনা, সব করেন তোমার পিসিমা?

—যাক্ তোমার সঙ্গে আমি মাঝরাতে তর্ক করতে চাই না। তুমি করছো কি করিনি সে বিচার ওপরে গিয়ে হবে। এখন তোমার জন্যে আমাকে কিছু করতেই হয়? বিয়ে যখন করেছি?

বিকাশ দরজা খুলে বাইরে বেরোলো। দরজার ডানপাশে সুইচ বোর্ড। আগের মত চোখ চলেনা। ঠাণ্ডা, থৈ-থৈ অন্ধকারে কোমর ভাঙা জলে যেভাবে হাঁটে সেই ভাবে বিকাশ এগিয়ে গিয়ে আলোর সুইচ টিপল। থিরিক থিড়িং শব্দ করে বসার জায়গায় মাথার ওপর ফ্লোরেসেণ্ট বাতি জ্বলে উঠল। মাঝ রাতে আলোর যেন চোখ ফোটে। চারদিক ঝলসে গেল। এখন! এখন আমাকে কি করতে হবে? দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেপে ধরে বসার জায়গার সোফাটোফার দিকে বিকাশ এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন অশরীরী কোনো ডেন্টিষ্ট ওখানে বসে আছে? বিকাশের গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি। গরম বিছানা লেপের তলা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে বেশ শীত করছে। এই গরম ঠাণ্ডায় হঠাৎ জ্বর হয়ে গেলে বেশ কিছু টাকার ধাক্কা। সোফার ওপর দলা পাকানো আরতির চাদর। শোবার আগে গা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। চাদরটা তুলে বার দুয়েক ঝেড়ে বিকাশ চাদরটা গায়ে জড়ালো। উঁ হিঙের গন্ধ বেরোচ্ছে? ভদ্র মহিলার কি যে অভ্যেস? পর্দা চাদর বিছানার উদ্বৃত্ত বেড কভারের অংশ, বালিসের ঝালরে, শাড়ির পশ্চাদ্দেশে সুযোগ পেলেই খুচুং করে হাত মুছে দেবে। কড়াইশুঁটি হিং দিয়ে আলুর দম খাওয়া হয়েছে রাতে। হাত ধোবার পর স্মৃতিটুকু রেখে গেছে চাদরে।

না, একটু ভাবা দরকার? বারণ করা সত্ত্বেও চামচে চামচে চিনি আর কটর মটর সুপুরি খাওয়ার ঠিক সাজাই হয়েছে? মরুক যন্ত্রণায়?. কিন্তু সারারাত ঘুমোতে দেবেনা যে? অনবরত উঁ আঁ করবে। যখন হাঁচি হয় তখন ননস্টপ পঞ্চাশটার কম থামেনা। ডেঙ্গু জ্বর হলে চিৎকারে লোক জড় করে ফেলে। এর ওপর একাদশী অমাবস্যায় পায়ের গোছে বাতের কামড়

আছে। তুমি আর কি বুঝবে বল গদামগুম। থেকে থেকে খাটে পা ছুঁড়বে। পায়ের ওপর একটু দাঁড়াবে গে।? দাঁড়ালে পায়ের কিছু থাকবে! প্যাকাটির মত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। গদামগুম। কি হচ্ছে কি? ওঃ চিবোচ্ছে? অগত্যা? দাও একটু হাত দিয়ে টিপে দাও? চোদ্দ বছরের পুরনো বৌ মাতৃসমা? ভুজঙ্গ ডাক্তারের কমপাউণ্ডারকে ধরে ইনজেকশান দেওয়াটা শিখতেই হবে দেখছি? তারপর গোটাকতক মরফিয়ার অ্যাম্পুল যোগাড় করে রাখতে হবে। বিয়ের ছ'মাস বড় জোর এক বছর পর্যন্ত বৌয়ের ভিরকুটি সহ্য করা যায়, মন্দ লাগেনা? তারপর যতক্ষণ ঘুমোয় ততক্ষণই শান্তি। দাঁতের এখন কি করা যায়? মারো এক ঘুষি। ঝরঝর করে যে কটা ঝরে যায়? চুল ঝরে টাক হয়ে গেল? পাতাঝরে গাছ কঙ্কাল হয়ে গেল, বয়েস ঝরে বুড়ো মরে গেল, মেদ ঝরে মেরুদাঁড়া বেরিয়ে গেল, গোটাকতক দাঁত ঝরে যেতে কি হয়? ঝরলে যে গেরস্থর কল্যাণ হয়। দাঁড়াও দিচ্ছি তোমায় দাওয়াই? জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কিছু না জানলে সাংসার করা উচিত নয়। শুধু ডাক্তারে রক্ষে নেই, থেরাপী, সার্জবী গাইনী ই এন টি দাবা সি' ক্যাসিয়াস ক্লে পি সি সরকার রকিফেলার সব গুলিয়ে অ্যালয় করে স্বামী ঢালাই করলে তবে যদি এ যুগে বাঁচা যায়।

দোতলায় বিকাশের বাবা থাকেন। বিকাশের ছেলে আর মেয়ে তাঁর কাছেই শোয়। মৃতদার বৃদ্ধ একটু সঙ্গ পান। সারা রাত ঘুমোতে পারেন না। যতক্ষণ নাতি, নাতনী জেগে থাকে সমানে বকর বকর করেন। যেন সমবয়সী তিন বন্ধু? বিকাশ জানে বৃদ্ধ জেগেই আছেন। মৃদু আলো দরজার তলা দিয়ে একটু আভা'র মত লাল মেঝের ওপর ঠিকরে এসেছে। দরজা ভেজানো। ভেতর থেকে ছিটকিনি টানা নেই। বারে বারে বাথরুমে যেতে হয়। শীতকালে একটু বেশিই। বিকাশ দরজা খুলতেই মশারির ভেতর থেকে আপাদমস্তক লেপ মুড়ি একটি বসা মূর্তি প্রশ্ন করলেন, কি চাই! সঙ্গে সঙ্গে বললেন, সব ঠিক আছে। ভেবেছেন ছেলে, ছেলের খবর নিতে এসেছে। বিকাশ মশারির কাছাকাছি আসতেই লেপের ওপর দিকে একটি দাড়ি-গোঁফওলা মুখ বেরোলো। সুদূর অতীত থেকে বৃদ্ধ নিজেকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনলেন। মাথার ওপর লেপটেনে চারিদিকে বেশ একটা অন্ধকার তৈরী করে অনিদ্রার রুগী সারারাত অতীতের মানুষদের কাছে টেনে আনেন। সেই কলেজের দিন? কেমিষ্ট্রির প্রফেসার। ফিজিকসের প্রফেসার দে।

হাওড়ার ভাসমান সেতু। ইডেনগার্ডেনের গোরা ব্যাণ্ড। শিব ভাদুড়ির ফুটবল। আমার দিন তো চলে যায় মা, চলে যায় মা!

কথা না বাড়িয়ে বিকাশ কাজের কথাটা পেড়ে ফেলল—আপনার কার্বলিক অ্যাসিডের শিশিটা একবার দেবেন?

দাঁত কনকন? করে? তোমার!

আজ্ঞে না, আপনার বৌমার!

লেপটা মাথা থেকে ঘাড়ের ওপর নেমে এল। একটা হাতও বেরোলো। হাতটা তুলে দক্ষিণ পশ্চিম কোনের টেবিলের দিকে প্রসারিত করে বললেন, সোজা চলে যাও ড্রয়ারটা খোলো একটা সাদা চাবি পাবে। বিকাশ নির্দেশ পালনের জন্যে এগিয়ে গেল। প্রথমে বাঁ দিকের ড্রয়ারটা খুললো। খুলতেই একগাদা গোল করা ফুলো সিরিশ কাগজ মেঝেতে পড়ে গেল।

উঁহু, উঁহু ওটা নয়, ওটা নয় ও ড্রয়ারটা নয় ডানদিকেরটা খোলো।

বিকাশ নীচু হয়ে সিরিশ কাগজগুলো আবার গোল করে যথাস্থানে ঢোকালো। মাঝে মাঝে সারারাত বৃদ্ধ সিরিশ কাগজ দিয়ে দরজা ঘষেণ। চার বছর ধরে চলেছে। ঘুমোতে যখন পারিনা তখন ব্যর্থ চেষ্টা নিয়ে বিছানায় না পড়ে থেকে সংসারের খরচ বাঁচাই। চার বছরেও কাঠের গ্রেন তেমন মসৃণ হয়নি। রং লাগাবি কি! লাগালেই হোলো! রঙতো এক সেকেণ্ডের ব্যাপার। ঘষাটাই আসল। আজ্ঞে, কয়েকটিন রং, সব শুকিয়ে গেল? শুকিয়ে যাবে কোথায়? সল্টভেন্ট দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

ডান দিকের ড্রয়ারে ছুরি, কাঁচি, গজাল, পেরেক, বাটালি রয়ে।

—পেয়েছিস! না, যাবো? আরে সামনেই তো আছে, একেবারে ওপরে। না পেলে বল?

—এই ড্রয়ারে আছে যখন পাবো নিশ্চয়ই! আশাবাদী বিকাশ হতাশ না হয়ে হাতের আঙুল বাঁচিয়ে চাবি খুঁজতে লাগল। বাবার রাখা তো, সহজে কি পাবো।

—পেলি না? কি আশ্চর্য! যে জায়গায় আছে অন্ধও খুঁজে পাবে। চোখ বুজিয়ে হাত দে তো! বিকাশ গুন গুন করে গান গাওয়ার সুরে বললে পাচ্ছ না তো, পাচ্ছিনা গেল কোথায়, কোথায় গেল!

বিকাশের বাবা নেমে এলেন, সর দেখি। হাঁটকালেন কিছুক্ষণ! আশ্চর্য। গেল কোথায় এদের জন্য আর কিছু রাখা যায় না। গেছে! দূর করে

কোথায় ফেলে দিয়েছো এই গুচোচ্ছি, এই সব লণ্ড ভণ্ড করে দিচ্ছে! বিকাশের ছেলে আর মেয়ের উদ্দেশ্যে চোখাচোখা কিছু বিশেষণ প্রয়োগ করতে করতে বৃদ্ধের হঠাৎ কি খেয়াল হোলো—দাঁড়া দেখি? বিছানায় চলে গেলেন। মাথার বালিশ উল্টে বললেন, হিয়ার ইউ আর আই অ্যাম সরি, আই অ্যাম সরি! মশারির ভেতর থেকে চাবিটা বের করতে করতেই নাতিকে আদর হল—হুনোটা। একটু আগের গালাগালটা আদর দিয়ে পাললা সম্মান করলেন।

বিকাশকে চাবিটা দিলেন। বাক্সটা খোলো। উত্তরের দেয়ালে টুলের ওপর রংচটা লোহার ক্যাশ বাক্স। খুলেছিস! আজ্ঞে হ্যাঁ। ডানদিকের খোপের থামটা তোল, নীল ফিতে বাঁধা আর একটা চাবি পাবি। পেয়েছিস! আজ্ঞে হ্যাঁ। নিয়ে আয়।

বিকাশ চাবি হাতে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় রইল। উত্তরের ঘরের তালা খুলে আলমারির মাথায় আর একটা সাদা চাবি পাবে। আলমারিটা খুললেই একেবারে নিচের তাকের বাঁদিকে কাঁচের স্টপার লাগানো একটা শিশি পাবে।

আলমারির মাথায় একসার বই দাঁড় করানো। একটা দাড়ি কামাবার টাকপড়া বুরুশ, গোটাকতক ওষুধ আর সাবানের বাকসো হরলিক্সের শিশিতে চিনি একটা দূরবীন! যাক্ চাবিটা পেয়েছে। শিশিটাও সহজে গেল। শোনা, জাস্ট একটু টাচ করে দেবে। জিভে যেন না লাগে, সঙ্গে সঙ্গে ফোস্‌কা হয়ে যাবে। থুতু ফেলে দিতে বলবে। ওঃ দাঁতের ব্যথা সাংঘাতিক ব্যথা—দন্তশূল পিত্তশূল অম্লশূল। সব শূলের ক্যাটিগরি।

বিকাশ শিশি হাতে নেমে এল। বেশ সুন্দর শিশিটা। মেট্রো প্যাটার্নের ছিপি। প্রায় আধশিশির মত অ্যাসিড। আরতি লেপ মুড়ি দিয়ে ডানপাশে কাত হয়ে বাবারে মারে করছে।

—ওঠো! দাঁতের যন্ত্রণার যম এনেছি! ওঠো লাগিয়ে দি!

—কি জিনিস।

ওঠোই না! সরু কাঠিতে একটু তুলো জড়াও।

—তুলো এনেছো!

—নিচে নেই?

—নিচে তুলো কোথায়! তুলো তো ওনার কাছে।

—আবার যেতে হবে? বৃদ্ধ মানুষকে বারে বারে বিরক্ত করা?

আরতি উঠে বসেছে। বিকাশ জোরে আলোটা জ্বালাল! দাঁড়াও, তুলো নিচেই আছে। আমার মাথার বালিসে একটা ফুটো আছে। আঙুল ঢোকালেই তুলো আসবে।

—কি যে বল! শিমূল তুলায় হয় না কি? আর ও ফুটো তোমাকে বড় করতে দিচ্ছে কে!

বিকাশ আবার ওপরে উঠলো। একটু তুলো।

আবার সেই এক প্রক্রিয়া। ডানের ড্রয়ারে চাবি। সেই চাবি দিয়ে, উত্তরের ঘরের চাবি আলমারির মধ্য। সব্বার ওপরের তাকে এক-সার বইয়ের পেছনে একটা ছোটো বাক্সো। সেই বাক্সে তুলো।

আরতির হাঁটুর ওপর আয়না, পাশে একটা বড় দইয়ের ভাঁড়। অ্যাসিডে তুলো ভিজিয়ে তুলো জড়ানো কাঠিটা বিকাশ সাবধানে আরতির হাতে দিয়ে বললে, তুমি৻ময় মত এতখানি হাঁ করে যে দাঁতের গোড়ায় যন্ত্রণা হচ্ছে, সেই গোড়ায় টুকটুকরে দুবার ঠেকিয়ে দাও! সাবধান জিভে বা অন্য কোথাও যেন না লাগে, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তারপর ওই ভাঁড়ে বারে বারে থুতু ফেলো।

প্রথমে আরতি বেশ বড় করে হাঁ করল। দেখার মত হাঁ অনেকটা তাড়কা রাক্ষসীর মত। হাতে ধরা তুলে জড়ানো কাঠিটা মুখের সামনে নিয়েও এলো। বিকাশ ফিল্ম ডিরেক্টারের মত নির্দেশ দিল ঠিক হ্যায় ঠিক হ্যায় লাগাও লাগাও। হাঁ বন্ধ হয়ে গেল। না বাবা ভয় করছে।

—ভয়ের কি আছে! বাবা দিনে বার সাতেক করে দেন। যে রোগের যে দাওয়াই। পুড়িয়ে না দিলে কমবে না।

—না, বাবা দরকার নেই তুমি অন্য কিছু দাও!

—অন্য কিছু দাও। বিকাশ ভেংচি কাটলো। অন্য কিছু কি দেবে। যেমন কুকুর তার তেমন মুগুর। তুমি হাঁ কর আমি বরং একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল কায়দায় লাগিয়ে দি।

—তা কখনো হয় নাকি। বত্রিশটা দাঁতের কোন দাঁতটায় হচ্ছে তুমি বুঝবে কি করে। নিজের চুলকোনি অপরকে দিয়ে চুলকোনো ঠিক হয়! হচ্ছে ওপর পাটির কশের দাঁতে।

—তাহলে এক কাজ করি ডিশে খানিকটা গ্লিসারিন ঢেলে আনি।

মধুর মত আগে খানিকটা চেটে নাও। জিভে একটা কোটিং পড়ে যাবে। অ্যাসিড লাগলেও পুড়বে না।

—কি যে তোমার অদ্ভুত পরামর্শ। মরছি আমি দাঁতের জ্বালায়, তার ওপর গ্লিসারিন চেটে পেট খারাপ হয়ে মরি আর কি!

—তোমার মত ভীতু মেয়েমানুষের সংসার করা উচিত হয়নি বুঝলে! ভাল ভাল পুষ্টিকর ওষুধে গ্লিসারিন থাকে জানো বীয়ারে এই এতটা গ্লিসারিন থাকে। বোতল বোতল খেয়ে সব ইয়া ভুঁড়ি বাগাচ্ছে।

—কি দরকার বাবা অত অশান্তিতে! তোমার একটা বড়ি দাওনা। কোন রকমে রাতটা কাটাই! তারপর দেখা যাবে কাল সকালে।

—বড়ি থাকলে তো দেবো। সব সময় কি স্টকে থাকে নাকি! এ কি আলু পেঁয়াজ, চাল ডাল। অ্যাসিডই এ রোগের একমাত্র দাওবাই। না পোড়ালে তোমার ঘুমের বারোটা আমারও ঘুমের বারোটা। আরতি আবার হাঁ করে হাতটা জিভের কাছাকাছি নিয়ে গেল রেডি ওয়ান টু থ্রি, লাগাও।

—ভয় করছে! আরতি প্রায় জলভরা চোখে বিকাশের দিকে অসহায়ের মত তাকালো।

—দাঁড়াও। আর একটা বুদ্ধি এসেছে। আমার কাছে লম্বা একটা খাম আছে প্রায় তোমার জিভের মাপে। মা কালীর মত জিভটা বার কর, পরিয়ে দি, খানিকটা প্রোটেকসান হবে।

বিকাশ সত্যি সত্যি একটা সরু লম্বা খাম নিয়ে এল। ছেলের জন্যে ছবি আঁকার তুলি কিনেছিল, সেই সময় খামটা এসেছিল। ডগার দিকটা সহজে ঢুকলো। আটকে গেল জিহ্বামূলে। তা যাকগে! মানুষের অবাধ্য অবোধ জিভ সাধারণত ডগা খেলিয়েই সব কিছুর স্বাদ, বিস্বাদ পেতে চায়। ডগা দিয়েই ছোবল মারতে চায়। সেইটাকেই যখন খাপে পোরা গেছে আর ভাবনা কি!—নাও লাগাও। টুকটুক করে বারকতক ঠেকিয়ে দাও! ওঁ শান্তি!

আরতি, যতটা ভীষণ কাণ্ড হবে ভেবেছিল, ততটা হল না। খুব খানিকটা লালা বেরোলো। সারা মুখে অদ্ভুত একটা লাইফবয়, লাইফবয় গন্ধ। সেই চিড়িক ধরানো মাথা ঝন ঝন করা অদ্ভুত মিনমিনে ব্যাথাটা সত্যিই যেন একটু কমে গেল।

ঘরে আবার নীল আলো জলে উঠলো। পূবের জানালার কাঁচের মাথায় শুকতারা দেখা দিয়েছে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের মত রাত একটু একটু করে দিনের দিকে ঘুরে চলেছে। একটু পরেই আলমবাজারের চটকলের গম্ভীর ভোঁ বেজে উঠবে। পাশের চায়ের দোকানে কেটলি, চামচে নাড়ার শব্দ উঠবে। সামনের রাস্তায় মানসবাবুর ব্রংকাইটিসের ভীষণ কাশি শোনা যাবে। লেপের তলায় বিকাশের পায়ে নিজের পা কাঁচি করে আরতি বললে, ভোরে আর আমায় ডেকোনা, চাটা তুমিই কোরো।

বিকাশ কোনো উত্তর দিলনা। সে তখন অন্য জগতে। ফুড়ুত ফুড়ুত করে তার নাক ডাকছে।

অ্যালার্মের শব্দে বিকাশ ধড়মড় করে উঠে বসল। সেকেণ্ড খানেকের মধ্যেই ঘুমের ঘোর কেটে গিয়ে মনে পড়ল গতরাতের ঘটনা। ভাগ্যিস অ্যালার্মটা দিয়ে রেখেছিলাম! তাই তো ঘুম ভাঙলো! উনি তো পড়ে পড়ে আটটা অবধি ঘুমোবেন? রাতে ভালো ঘুম হয়নি, দাঁতের যন্ত্রণা। চায়ের জলটা তুমি চাপাও পিজ। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে তিনশো দিনই যদি চা করে খেতে হয় তাহলে বিবাহ করেছিলাম কি কারণে। এই তো আমি বিকাশ চন্দ্র ঝড় হোক জল হোক, অসুখ হোক যাই হোক, অফিস তো বাবা যেতেই হয় ফোর্টিন ডেজ ক্যাজুয়াল লিভ, চোদ্দ দিনে একদিন আর্নড লিভ। আর বাজার! শীতে একদিন অন্তর, গ্রীষ্ম বর্ষায় রোজ? আর রোজ মাছ খেতে চাইলে এভরিডে। তখন তো নাকিসুরে বলা যাবে না, আমি আজ বাজার যেতে পারছি না। অ্যাই ওঠো, ওঠো। সরে শুচ্ছো কি! ছটার মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। অফিসের গাড়ি আসবে। আরতির সাড়া শব্দ না পেয়ে লেপের একটা কোন ধরে জল ছবির মত ওঠালো। যাঃ তেরিকা এটা তো সেই ম্যাগনাম বালিসটা। বাঃ বেড়ে কায়দা। ছেলে ঠকানো কারবার? শিশুকে স্তন্যপান করাতে করাতে একটু ঘুম এলেই মায়েরা এই ভাবে পাশে, পাশ-বালিশ শুইয়ে কেটে পড়ে। গেল কোথায় সাত সকালে? দাঁতের যন্ত্রণায় সুইসাইড করেনি তো। চটি গলিয়ে ফটরপটর করতে করতে বিকাশ ঘরের বাইরে গেল।

দেখেছো এই শীতে শুধু একটা চাদর জড়িয়ে বাইরের সোফায় জড়ো সড়ো

হয়ে বসে আছে! সামনে খালি কাপ? চা করে একলা একলা খাওয়া হয়েছে। হায় প্রেম। এইভাবে ড্রাই হয়ে গেলে। বিকাশ সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুজে পা দুটো গাড্ডু করে আরতি বন্দনার মত বসে আছে। ঘাড়ের কাছে গোল খোঁপা স্নো-বল চন্দ্রমল্লিকার মত ভাঙচুর হয়ে আছে। কি গো! এখানে এইভাবে বসে! অ্যাই! চিৎকার করেই বিকাশের মনে হল সকালেই দু ছেলের মার সঙ্গে এতটা জোরগলায় সোহাগ করা চলে না। কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলল অ্যাইই।

দুটো হাঁটুর মাঝখান থেকে আরতির মুখটা উঠে এল। ওরে বাবারে! এ কার মুখ! বিকাশের স্ত্রীর। না রাবণের। তেড়া বাঁকা শাঁকালু। ডানপাশটা ফুলে ডিমের মত মুরগী বা হাঁস নয়, একেবারে রাজহাসের ডিম যে গো! কি করে করলে? এক রাতেই এতটা বাড়। যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। আরতির চোখের কোল বেয়ে বেশ বড় সাইজের মুক্তোর দানার মত এক ফোঁটা জল গড়িয়ে এল? এখন কি হবে! উত্তরে আরতি একটা হাত ওপরে তুললো। ঈশ্বর জানেন কি হবে। মুখ দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না। সমগ্র মুখ গহ্বরে বিশাল একটি আওয়া।

এ বস্তুকে সামলানো বিকাশের জ্ঞান বুদ্ধির বাইরে। সেল্‌ফ মেডিকেশান আর চলবে না। চা করতে করতে বিকাশের মনে পড়ল, কোথায় যেন পড়েছিল, জামগাছের ছাল পুড়িয়ে দাঁতের গোড়ায় লাগালে উপকার হয়। এও পড়েছিল, একবার ঠাণ্ডা জল একবার গরম জলে পালা করে কুলি করলে, কিছু একটা হয়। কিন্তু যেরকম ফুলেছে তাতে তো কোনো টোটকায় চলবে না! সারাদিন বেচারা খাবেই বা কি! মহা মুশকিল! ওই শরীর নিয়ে রাঁধবেই বা কি করে! অন্ত হরি মটর। আমাকে তো এখুনি বেরোতে হবে।

আরতির সামনে চায়ের কাপ নামিয়ে বিকাশ জিজ্ঞেস করল, রান্না বান্নার কি হবে।

আড়চোখে চায়ের কাপটার দিকে তাকিয়ে আরতি ঠোট ফাঁক না করে যা বলল তা অনেকটা এইরকম শোনালো, উম ববো বো বকমে! বো বকমে।

বাবা! এ আবার কি ভাষা! বিকাশ তাড়াতাড়ি একটা স্লিপপ্যাড আর পেনসিল এগিয়ে দিল। প্লিজ, বাংলা অথবা ইংরেজীতে লিখে দাও।

আরতি খুব বিরক্ত মুখে লিখলো, কোনো রকমে হবে।

তুমি কি খাবে?

আরতি লিখলে, জল পর্যন্ত সহ্য হচ্ছে না, গরমও নয় ঠাণ্ডাও নয়। অতএব উপোস।

বাঃ তা কখনো হয়। কিছু একটা খেতেই হবে। সারাদিন উপবাস করে থাকবে কি।

আরতি একটু হাসল। বিকাশ অবাক হয়ে দেখলে, মুখটা ঠিক যেন ন্যাকড়ায় জড়ানো একতাল ডালভাতে।

আচ্ছা! বেশ পাতলা করে খিচুড়ি খেলে কেমন হয়।

উত্তরে আরতি এমন ভাবে মাথা নাড়ল বিকাশ যেন বিষ খেতে বলেছে!

তাহলে দুধ দিয়ে সুজি ফুটিয়ে খেলে কেমন হয়?

বিকাশ বেশ বুঝলো আরতি মুখ বাঁকালো তবে মুখটা এমনিই তেড়া বেঁকা হয়ে আছে বলে বোঝা গেল না। না, বিকাশের আর কথা বলার সময় নেই। অন্যদিনের চেয়ে অন্তত দু'ঘণ্টা আগে বেরোতে হবে। আজ আবার লোড শেডিং-এর নির্ঘণ্ট। এখনি ফচাত করে পাওয়ার চলে যাবে সঙ্গে সঙ্গে কলের মোটা জলের ধারা মূত্রধারা হয়ে অশ্রুধারা হয়ে যাবে। দৌড়ে একবার দোকানে যেতে হবে সুজি, রতনের দুধ দুটো বড় নরম পাক। ব্যবস্থা করে দিয়ে না গেলে, পরে ঝগড়া ঝাটির সময় খোঁটা খেতে হবে। বৌদের ওপর তো বিশ্বাস কি নির্ভরতা কোনোটাই রাখা চলে না। কুকুরের বদমেজাজের মত। মাথায় হাত বুলোচ্ছে, হাত বুলোচ্ছো, পটাপট লটাপট লেজ নাড়ছে। পরক্ষণেই কি হোলো ঘ্যাক করে কামড়ে দিল। এই হলায় গলায় এই আদায় ক্যাচকলায়!

রতনের দোকানে দুধের লাইনে দাঁড়িয়ে বিকাশের হঠাৎ মনে পড়ল, আরে রতনের মার কাছে অব্যর্থ দাঁতের মাদুলি আছে বলে শুনেছে! একবার চেষ্টা করে দেখলে হয় না! মোষের মত মুসমুসে রতন বড় হাতা উঁচু গলা উলিকট গেঞ্জি পরে বিশাল একটা ব্যারেল থেকে অ্যালমুনিয়ামের মগ ডুবিয়ে ডুবিয়ে ক্রেতাদের ঘটিতে বাটিতে, গেলাসে ক্যানে ছিড়িক ছিড়িক করে দুধ ঢালায় ভীষণ ব্যস্ত। দুধ আবার দুরকমের গরু, মোষ! এখন কি আর মাদুলির কথা জিজ্ঞস করা যাবে! বিকেলে! বিকেলেও দুধ। গভীর

রাতে। তখন আবার ছানার ডাঁক। দুপুরে! দুপুরে নাক ডাকিয়ে ঘোরের মত ঘুম। রতনের গায়ে গতরে সোনা মোড়া আহ্লাদী বৌয়ের নিশ্চয়ই দাঁতের যন্ত্রণা হয় না। কি করে হবে! দৈবতো হাতের মুঠোয়। কি সুখের জীবন। লেখাপড়া শিখলেই মানুষের যত অশান্তি, যত দুঃখ। লেখা পড়া করিবে মরিবে দুঃখে!

বিকাশের পাত্রে দুধ ঢালছে রতন। রতনের মুখে বিকাশ কখন হাসি দেখেনি! ডিসট্রিকট মেজিসট্রেটের মুখের মত। বিকাশ একগাল হাসল। যদি রতন হাসে তাহলে মাদুলির কথাটা পাড়বে। সে মুখই নয়। সব সময় একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব। পয়সা হলে যা হয়। জল বেচে পাঁচতলা বাড়ি, গাড়ি। দোকানে ফোন, বাড়িতে ফোন। টি ভি! ফ্রিজ! তবু বিকাশ তাক করে কথাটা ছুঁড়লো—শুনেছি আপনার মার কাছে দাঁতের মাদুলি পাওয়া যায়।

হ্যাঁ যায়! বিকাশকে হাতের ঝটকায় লাইনচ্যুত করে, পরবর্তী খদ্দেরকে পোজিশানে এনে রতন বলল, এখন পাওয়া যাবে না।

কেন স্যার! বিকাশ স্যার বলে সম্বোধন করে ফেলে নিজেকেই নিজে গালাগাল দিল। ব্যক্তিত্বের অভাব। তেমন ব্যক্তিত্ব থাকলে এক ধমকে বৌয়ের দাঁত ব্যথা ভাল করে দেওয়া যায়। আগেকার যুগের মেয়েদের অসুখ করলে টুঁ শব্দটি করার উপায় ছিল কি? রতন দুধ দিতে দিতেই বললে—মা তীর্থ করতে গেছেন। এক মাস পরে ফিরবেন।

হয়ে গেল! এক মাস তো ওই ফোলা মুখ ঝুলিয়ে রাখা যায় না। নিজের দাঁত হলে কথা ছিল না। এ বাবা বৌয়ের মুখ! ফোলা মুখ যেই চুপ্‌সে যাবে অমনি ছুটবে বাক্যবাণ। কোরামিনের বাবা। মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করে হরিমুদির লাটে-ওঠা দোকানের রকে গিয়ে বসবে, ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে থাকবে বিচিত্র জগৎসংসারের দিকে। কি হয়েছে দাদা! দাদা বোবা। গৃহিণী ঝেঁটিয়ে শুধু কর্তাকেই বের করেননি, মগজটিকেও ধোলাই করে দিয়েছেন। একেবারে ভ্যাকুয়াম।

এক হাতে সুজি, অন্য হাতে দুধ নিয়ে বিকাশ উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি ঢুকলো। এখুনি দৌড়োতে হবে এয়ারপোর্ট। তাহলে তুমি একটু সুজির পায়েস করে, ঠোঁট দুটোকে তর্কচঞ্চুর মত করে, স্টেনলেস ষ্টিলের চামচ দিয়ে আস্তে আস্তে টাগরার ফেলে স্টম্যাকের দিকে ম্যানেজ করে দিও। মুখ বাঁকালে কেন?

তোমার মুখের ওই ছিরি দেখলে গা হিম হয়ে যায়। কি করবে বল। কটা দিন একটু কষ্ট কর। তারপর আবার গরগরে মাছের ঝাল, ঝরঝরে ভাত, ডাঁটা, কটাস-কটাস সুপুরি। আপাতত দাঁতের হলিডে।

বিকাশ বেরোতে গিয়ে ফিরে এল। সুজির পায়েস করতে জানো তো! তুমি তো এই চোদ্দ বছরে তিনটে জিনিসই বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করে গেলে, ভাত, চেয়ে থাকা ডাল আর মাছের তেল গড়ানো সরষে ঝাল। সেই এক কনসার্ট। শুকনো কড়ায় সুজিটাকে একটু নেড়ে লাল লাল করে দুধ ঢেলে ফোটাবে, পাতলা থাকতেই নামাবে, ঈষদুষ্ণ পেটে চালান করবে। ফিরে আসি তারপর যা ব্যবস্থা করব। একটু সেঁক দিয়ে দেখতে পারো। মুখে মাফলার জড়াও। ও হ্যাঁ। বিকাশ আবার ফিরে এল। একটা ছোটো এলাচ, গোটা দুই তেজপাতা দিও।

বিকাশ একটু বেলাবেলি ফিরে এল। হাতে কাগজে মোড়া ছোটো একটা কৌটো। দরজার সামনে এটা আবার কার চটি। গোড়ালিটা খয়ে খয়ে গেছে। স্ট্যাপে সোনালী রঙ লাগানো ছিল যৌবন বয়েসে, প্রৌঢ়ত্বে দাঁত বেরিয়ে গেছে। কোন্ মাল আবার এলেন! বিকাশ ভাবতে ভাবতে দরজা ঠেলল। ঠেলতেই খুলে গেল। ওরে বাবা! শোবার ঘরে খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন সেই জাঁদরেল মহিলা। ঘটিহাতা উলিকট ব্লাউজ। ধবধবে সাদা ফিতে পাড় শাড়ি। ঘিয়ে রঙের শাল স্থচের কাজ করা। শাশুড়ীর ভাই। খুব একটা দূরে থাকেন না। মাঝে মাঝেই মেয়ের খবরদারি করতে আসেন। জামাই কেমন রেখেছে মেয়েকে! দেখতে হবে না। প্রায়ই ভদ্রমহিলা বলেন, তুই যদি না পারিস বল, আমি বলছি জামাইকে। বিকাশের কেল্লা একা কুম্ভ নয়, কুম্ভ আর কুন্তি দুজনে রক্ষা করেছেন।

বিকাশকে দেখে, মহিলা মাথায় একটু ঘোমটা টেনে দিলেন। ঘাড়ের কাছে গোল খোঁপায় কাপড়টা আটকে রইল। একটু আগেই বোধহয় মুখে জর্দা পান ঠুসেছিলেন। রোমন্থন চলেছে। ইদানীং একটু মোটা হয়েছেন। বিকাশ লক্ষ্য করেছে, বিধবারা যেন একটু মোটাই হন। স্বামীদের খপপর থেকে বেরোতে পারলেই, মুক্তির আনন্দে স্বাস্থ্য ফিরে যায়।

কেমন আছেন? বিকাশ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

ওই এক রকম আছি, কে আর আমার খবর রাখছে বল! উত্তরে

বিকাশ হে-হে করে একটু হাসল। সব অভিযোগের উত্তর বিকাশ এই ভাবেই সহজ সরল করে নিয়েছে। খাটের বাজুতে পিঠ রেখে আরতি বসে আছে। নীল গরম চাদরের ঘোমটা। মুখটা রূপকথার ডাইনীর মত। ঘটের ওপর ওলটানো ডাব। তলার দিকটা ফুলো। মাথার দিকটা সরু। কেমন আছে? আছো না বলে বিকাশ আছে বলল। স্বাভাবিক আরতির হাজার ল্যাঠা। এখন একমাত্র খবর দাঁত। দাত কেমন আছেন?

মা যখন রয়েছেন, গর্ভধারিণী, তখন মেয়ে কেন জবাব দেবে। আরতির মা বললেন, তোমার বাবা দোষ আছে। সংসারের কোনো ব্যাপারে তোমার তেমন গা নেই। এসব কি ফেলে রাখার জিনিস! সেপটিক হয়ে গেছে। গত বছর নন্দা এভাবেই গেছে। ডাক্তার, বদ্যি কেউ কিছু করতে পারল না। মুখ ফুলচে, ক্রমশই ফুলচে, এই এতখানি, বাতাবি লেবু। ব্যাস্ সেই ফোলাই কাল-ফোলা।

কে নন্দা, কোথাকার নন্দা, গড নোজ। উনার স্টকে এইরকম বহু মাল আছে। এ বলে আমায় দেখ ও-বলে আমায় দেখ। বিকাশ কেবল অনুমান করার চেষ্টা করল নন্দার মুখটা ফুলে তার স্ত্রীর মার মত হয়েছিল, না আরো বেশি। বিকাশ বললে, চলো তাহলে ডাক্তার মিত্রের কাছে নাও, রেডি হয়ে নাও। আমি রেডি, জামা-কাপড় আর ছাড়বো না।

বিকাশ হাতের মোড়কটা আয়নার তলায় ছোটো ব্রাকেটে রাখতে রাখতে বললে, এনেছি মোক্ষম জিনিস। দাতের যম। দেহ যাবে তবু দাত যাবে না। শিকড় পর্যন্ত শক্ত করে বটের ঝুড়ি নামিয়ে দেবে।

কি জিনিস! আরতির মার কৌতূহল।

গুডাখু। অভ্যাস করতে পারলে এর চে ভাল মাজন আর কিছু নেই। আমাদের পঞ্চুর প্রেস্‌ক্রিপসান। আরতির মা নন্দাকে ছেড়েছিলেন, বিকাশ পঞ্চুকে ঝেড়ে কিস্তি মাত করে দিলে।

ওঃ বাবা সাংঘাতিক জিনিস। খবরদার তুই যেন ভুলেও ব্যবহার করিসনি! মাথা ঘুরে বাথরুমে পড়বি আর মরবি! তোর আবার লো-প্রেসার। মা মেয়েকে এমনভাবে শাসন করলেন, জামাই যেন মারবার প্ল্যান করেছে।

নিত্য বিষ খেয়ে লোক বেঁচে আছে, বংশ বৃদ্ধি করছে, কৌটো কৌটো জর্দা ফাঁক করে নিজে তোফা আছেন, সামান্য দোক্তার মাজনে ওনার মেয়ে

উল্টে পড়বেন। নিজের গর্ভ সম্পর্কে কি ধারণা। কথা না বাড়িয়ে বিকাশ আরতিকে তাড়া লাগাল।

খানকতক গাওয়া ঘিয়ে লুচি ভেজে দি, সুজির পায়েস দিয়ে খাও। এতটা রাস্তা যাবে আরতির মার তোয়াজের জন্যে খাট ভেঙে নেমে এল। তুমি বরং একটু ময়দা ঠেসে দাও। আমি ঠাসতে গেলে শিরে চাপ পড়ে দাঁতটা হু-হু করে উঠবে।

ওসব করতে গেলে ডাক্তারকে আর ধরতে পারবো না! বিকাশ লুচির হাত থেকে বাঁচতে চাইল। না না আগে ডাক্তার। আরতির মা খুঁত খুঁত করে বললেন।

তাহলে একটু সুজি আর চা খাও মা।

তাই দে। কিছু না খেলেও চলে। বেলায় খেয়েচি। শরীরটা টিস টিস করছে। মহিলা বিশাল একটা হাই তুললেন। বিকাশের বিশ্বরূপ দর্শন হল। গঙ্গালের মত সারি সারি দাত। পান দোক্তার রসে পাকা বাঁশের মত চেহারা।

আমি চা করি তুমি বরং মাকে সুজিটা দাও। তুমিও একটুও নাও। আজ রাতে অন্য কিছু নেই। সব সুজি। হোল ফ্যামিলি সুজি!

ভালই হয়েচে সুজি নাইট। সকলেরই দাতের গোঁড়া ফুলেচে বলে ধরে নেওয়া যাক।

বিশাল ডেকচিতে সুজির পায়েস। রতনের খাঁটি দুধ, ওপরে লোভনীয় সরের আঁচল বিছিয়ে রেখেছে। একটি তেজপাতা মুখ থুবড়ে পেছন উল্টে পড়ে আছে। 'আরকটিক' সাগরে পেঙ্গুইন যেন মাছ খুঁজতে গিয়ে যেই ডুব মারতে গেছে সঙ্গে সঙ্গে জল জমে বরফ। পাশ থেকে এক চামচ কেটে তুলে নিয়ে বিকাশ আলগোছে মুখে ফেলল। বাপ্‌স কি মিষ্টি! মহিলা গত জন্মে বোধহয় ডেওপিঁপড়ে ছিলেন, এ জন্মে কাঠপিঁপড়ে? আরতির মা চা খেতে খেতে মেয়েকে বললেন, আমিও যাবো নাকি তোর সঙ্গে।

জামাইকে যেন বিশ্বাস নেই! কোথায় কোন হাতুড়ে-টাতুড়ের কাছে নিয়ে যাবে। নিজের চোখে চেম্বার আর 'ফি'র অঙ্কটা দেখতে পেলে তবু একটু স্বস্তি। না, জামাইয়ের বেশ কিছু খসল! মেয়ে তাড়াতাড়ি বললে— নাআ তার দরকার নেই। এতটা রাস্তা তোমাকে আবার যেতে হবে।

সাধে তোমাকে বলি বিকাশ, চায়ে চুমুক দিয়ে ভদ্রমহিলা বিকাশকে

বললেন, সাধে তোমাকে বলি, মেয়ের আমার অনেক ফাঁড়া। সেই ছেলে-বেলায় কি করেছিল জানো! লুকোচুরি খেলেছে মেয়ে। ভীষণ আদুরে ছিল তো! ওই মেয়ে আসতেই তো কত্তার বরাত ফিরলো! বাড়িতেই খেলছে। অত বড় বাড়ি। কে আর খেয়াল রেখেচে। রাতে খেতে বসে কত্তার খেয়াল হয়েছে। মেয়ে কোথায়! মাছের ডিম খাবে। পার্শে মাছের এক জোড়া ডিম পাতের পাশে আলাদা করা আছে। খোঁজ খোঁজ। কোথায় মেয়ে, কোথায় মেয়ে কোথাও নেই। ওমা সে কি রে! কি সব্বনেশে ব্যাপার। দেখ কোথা গেল। কত্তার খাওয়া মাথায় উঠলো। তুই থামতো বাপু। আরতি বোধহয় মারদিকে বড় বড় চোখ করে তাকালো। মেয়েকে ধমকে দিয়ে ভদ্রমহিলা আবার শুরু করলেন।

বাড়ি তোলপাড়। কত্তা বললেন, পুলিস ডাক। জেলে এনে সবকটা পুকুরে জাল ফেল। এদিকে ন-গিন্নীর প্যানপ্যানে মেয়েটা সন্ধ্যে থেকে কচ্ছে কি, দেখে যাও মা এই সিন্দুকে কি আছে। তুই থামতো বাপু, খালি একটা কত কালের সিন্দুক তার মধ্যে আবার কি থাকবে! গুচ্ছের আরশোলা। কেবলই বলে, দেখোনা খুলে, দিদি আছে। শেষে কত্তা বিরক্ত হয়ে বললেন, খুলে একবার দেখিয়ে দেতো মেয়েটাকে। একটা অন্তত শান্তি হোক। ঠাকুরপো সিন্দুকটা খুলতে খুলতে বললে, ছাখ দেখে যা কি আছে! ডালাটা খুলেই চিৎকার। ওমা! এই তো মেয়ে। কত্তা সাবধান করছেন, হাত দিওনা, আর এগিও না। এ মার্ডার কেস। আঙুলের ছাপ পড়বে। জ্ঞাতি শত্রুর কাজ। আগে পুলিস আসুক। রাখো তোমার পুলিস। আমার কম সাহস! সোজা গিয়ে মেয়ের নাকের কাছে হাত। দিব্যি নিশ্বাস পড়ছে! আরতি, এই আরতি। মেয়ে ঘুমোচ্ছে। ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। শেষে কি ব্যাপার! না, মেয়ে লুকিয়েছে। এমন লুকোনো লুকিয়েছে, আমাদের পিলে চমকে যায়!

কত্তা বললেন, এ মুদিনীর ওপর যায়।

মুদিনীটা কে? বিকাশ প্রশ্ন না করে পারল না।

ওই যে, সেই সময় এক যাদুকর বেরিয়েছিল। সিন্দুকের খেলা দেখাতো।

ও হুডিনী!

ওই হোলো, হুডিনী না মুদিনী।

বিকাশ আড়চোখে বৌকে একবার দেখে নিল। এমন মূল্যবান বস্তু চিরকাল সিন্দুকে থাকলেই তো ভাল হোত। কি দরকার ছিল, ধুলার এ ধরণীতে, সংসারের পাদানীতে!

ডেন্টিস্ট বললেন, সাংঘাতিক করে এনেছেন। এতো শুধু দাঁত নয়, সেপটিক হয়ে গেছে। কি করেছিলেন! পিন, সেফটিপিন দিয়ে খোঁচাখুঁচি।

আরতি একটু ভেবে বললে, সেফটিপিন।

সর্বনাশ! সবার আগে টিটেনাস টক্সয়েড, তারপর চড়া ডোজে অ্যান্টিবায়োটিকস। ফুলো সাবসাইড করুক, তারপর একসট্র্যাকসানের কথা ভাবা যাবে। আপনি মশাই বাড়ি থেকে আলপিন, সেফটিপিন, মাথার কাঁটা সোয়েটারের কাঁটা সব বিদেয় করুন। মেয়েদের খোঁচা মারা রোগ জীবনে যাবে না।

বোলো টাকা ডাক্তারের হাতে ঝেড়ে দিয়ে আরো গোটা ষোল টাকা ওষুধে গচ্চা দিয়ে খোঁচামারা বৌ নিয়ে বিকাশ বাড়ি ফিরে এল। রাতে দুশ্চিন্তায় ভাল ঘুম হল না। এই বয়েসে স্ত্রী বিয়োগ হলে, দ্বিতীয়বার তো আর পিঁড়েতে বসতে পারবে না! তখন একটা ছেলে, একটা মেয়ে নিয়ে করবে কি! মাঝরাতে লেপ সরিয়ে আরতির মুখটা আবছা আলোয় একবার দেখল। ঘুমন্ত ভিসুভিয়াস! ফুলোটা একটু কমেছে কি? দুটো ট্যাবলেট তো পড়েছে। বিকাশ আবার শুয়ে পড়ল। যেমন করেই হোক, টাকার জোগাড় করে দাঁতগুলো ঠিক করে দিতে হবে। বাবা বু সকাল সন্ধে ব্রাশ করে, কার্বলিক দিয়ে, ছিয়াত্তর বছর পর্যন্ত চালিয়ে গেলেন। রক্তে হাই সুগার। সহজে ছানী সরানো কি দাঁত নড়ানো চলবে না? বৌয়েরটাই প্রায়রিটি। দাঁত তোলার আগে ব্লাড, ইউরিন, দাঁতের একসরে সবকিছু করাতে হবে। একগাদা খরচ, তা হোক! তারপর তোলালেই তো হবে না! ফোক্‌লা করে ফেলে রাখা যায় না। বাঁধাতে হবে। সেও এক ঝামেলা!

সকালে মনে হল, ফোলাটা একটু কমেছে। যাক বাবা! এ যাত্রা রক্ষে পেল। বিকাশ মনে মনে হিসেবটা খালিয়ে নিল—এক একটা দাঁতের পেছনে বত্রিশ টাকা করে, বত্রিশ ইনটু বত্রিশ। তারপর বাঁধানো, আরো হাজার! দু হাজার টাকার ধাক্কা! কে জানতো বৌয়ের দাঁত এত

মূল্যবান? সামনের বার বিয়ে করতে হলে টুথলেস মহিলা বিয়ে করব। কাবুলের সিডলেস খেজুর কি দক্ষিণের স্টোনলেস আঙুরের মত দন্তহীন স্ত্রী। একমাত্র দেঁতো হাতীর কথা চিন্তা করা যায়। শ্বশুর মহাশয়ের দেঁতো মেয়ে মহা জ্বালা! প্রথম জীবনে দাঁত খিঁচোয় শেষ জীবনে প্রভিডেণ্ট এ্যাণ্ড ধরে টানাটানি করে।

তিন মাসের মধ্যেই আরতির সব দাঁত একটা দুটো করে উৎপাটিত হযে গেল। ভাটপাড়ার ভাস্বতী বলেছিল, থার্টিটু অল আউট। দাঁত বের করে আর হাসতে হচ্ছে না! সব গেটআউট। মুখটা তুবড়ে গেল। বয়েস এক লাফে বেড়ে গেল কুড়ি। মাড়ির উপর পরম যত্নে ডেন্টিস্ট সাজিয়ে দিলেন নকল দাঁত। সবচেয়ে দামী দাঁত। আরতির মা আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন, দাঁত হল মুখের শোভা। কৃপণতা করো না বাবা! ঘুরবে ও ফিরবে, ফিক্ ফিক্ করে হাসবে। থির বিজুরি!

বিকাশ বললে, দেখি, মুখটা একবার তোলো?

ঘরে আর কেউ নেই, তাই সাহস করে বলতে পারল।

বহু সাধ্য সাধনায় আরতি লাজুক লাজুক মুখে এমন চোখে তাকাল, বিকাশের মনে হল নতুন করে শুভদৃষ্টি হচ্ছে! চোখে সেই রাতের ধারাল দৃষ্টি না থাকলেও একটা স্বচ্ছ গভীরতা আছে। দু সন্তানের জননীর চোখে সেই দুষ্টুমি নেই। বৌয়ের চোখে মার চোখ। শোবার আগে আরতি দাঁত দুপাটি খুলে জলের বাটিতে ডোবাতে যাচ্ছিল। বিকাশ বললে, রাতের এই তো সবে ভরা যৌবন, এরি মধ্যে ফোকলা হবে। তোমার মুখটা মাইরি একদম পালটে গেছে। আগের চে ভাল হয়ে গেছে। চল কাল একটা ছবি তুলে আসি। আবার ছবি। আরতি হাসতে গিয়ে সামলে নিল। নতুন দাঁত। এখনো অভ্যাস হয়নি। কেবলই মনে হচ্ছে, খুলে পড়ে যাবে। মনে নেই ওই ছবিটা তোলার সময় কি কাণ্ড হয়েছিল।

তা হয়েছিল। তখন প্রেমের ভাঁটা চলছিল। এখন দাঁতের ঝিলিকে আবার জোয়ার এসেছে। তোমাকে ভালবাসতে ভীষণ ইচ্ছে করছে মাইরি। তোমার হাসিতে আমার দু হাজার টাকার চেকনাই লেগেছে।

বিকাশ আরতির কোমরটা ধরে কাছে টেনে নিল। একমঠো কোমর আর নেই, একটু চর্বি জমেছে। তাহলেও চোদ্দ বছর পেছিয়ে যেতে খারাপ

লাগল না। কানের কাছটা তোমার হাজার টাকার দাত দিয়ে সেই, সেই প্রথম রাতের মত একটু কুটকুট ইঁদুর কামড় দাওনা।

আহা কি আব্দার! তারপর যাক আর কি ভেঙে। মনে নেই ডাক্তারবাবু কি বলেছেন! ডেলা ভেলিগুড, আমের আঁটি, ছোলা ভাজা, চকোলেটবার, শাঁকালু এসব নকল দাঁতে চলবে না।

আমার কানটা তোমার লিস্টে নেই। একটা রিকোয়েষ্ট রাখো না গো! তোমার জন্যে এত করলুম। দংশনে বিকাশ সে আনন্দ পেল না তেমন ধার নেই। ভসকা পেঁপের মত স্বাদ! নকল দাতে আর যাই হোক, লাভবাইট, তেমন জমে না। দাঁত ওষুধ মেশানো জলে গা ধুতে গেল। দাঁতহীন আরতি বিকাশের পাশে লেপের তলায় এসে ঢুকলো। বিকাশ হুঁ করে একটা শব্দ করল। হাই তুলে বলল, ঘুমিয়ে আছে এক দিদিমা সব যুবতীর যৌবনে। তাই না।

দিব্যেন্দু পালিত

কলকাতা



ট্রেন ছাড়বে সাতটা পঞ্চাশে। তার অগে না পৌছুলেই নয়।

আগে বলতে বেশ কিছুক্ষণ আগে। অন্তত আট দশ মিনিট আগে। তার কম হলে এক কাপড়ে, ত্বরিত পায়ে এই ছুটে আসার কোনো দরকার ছিলো না।

ট্যাক্সির উত্তেজিত গহ্বরে বসে থাকতে থাকতেই মনীষা ছুটে গেল চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে। দীর্ঘ সরলরেখায় বহুদূর পর্যন্ত স্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনটা; মাথার পর মাথার গিজগিজে ভিড় পেরিয়ে এঞ্জিন পর্যন্ত চোখ পৌছয় না। এর মধ্যে কোথায় খুঁজবে সে রমেনকে। ক'দিন আগে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হলে অন্তত দৌড়নো যেতো রিজার্ভড্ কম্পার্টমেণ্টের দিকে। তা হয়নি। কাল সূর্যাস্ত থেকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তারা ছিলো একসঙ্গে। রমেনকে করুণা করার মতো লোক তার পরেও আর রেল বিভাগে থাকতে পারে না।

মনীষা অধৈর্য হয়ে পড়লো। চোখের খুব কাছে কব্জি তুলে এনে সময় দেখলো সাতটা বত্রিশ। কদিন আগেই অয়েল করিয়েছে ঘড়িটা—নিশ্চয়ই স্লো নেই। তার মানে সময় যায় নি, ছুটে গেলে এখনো ধরা যেতে পারে রমেনকে। বাহান্ন-কিলোর শরীরটাকে পালকের মতো হালকা করে রমেনের কাছাকাছি ছুটে যেতে কী আর এমন অসুবিধে হবে তার! এই তো, দু'বছর আগেও সে টু-টোয়েন্টিতে ফার্স্ট হয়েছিলো কলেজে!

ভাবনা অবশ্য নিজেকে নিয়ে নয়। সঙ্গের চব্বিশ-ইঞ্চি স্যুটকেসটার জন্যেও নয়। তিন সেট শাড়ি ব্লাউজ আর টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া স্যুটকেসে এমন কিছু নেই যে সহজে বহনযোগ্য হবে না। এ-রকম

সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই আগেভাগে সে নিজেকে যতোটা সম্ভব হালকা করে নিয়েছিলো। ফল খুব ভালো হয়নি। আলমারী খুলে টাকাপত্তর বের করার সময় প্রিয় নেকলেসটা নিতে ভুলে গেছে। যখন মনে পড়লো তখন সে মাঝ রাস্তায়, ট্যাক্সিতে। মন-খারাপ ভাবটা কাটাবার জন্যেই পরে নিজের সঙ্গে ছোট্ট একটু রসিকতা করে নিলো—সুযোগ মতো রমেনকে বলবে মালা পরাবে বলে গলাটা খালি করে এসেছি।'

সমস্যা তার পরের ঘটনা নিয়ে।

অভাবিতকে মেনে নিতে হলে যে-রকম উত্তেজিত ও বিমর্ষ হয়ে পড়ে মানুষ, রমেন তার ব্যতিক্রম হবে না। গুণ বা দোষ বলতে তার একটিই—স্বাভাবিকতাকে কখনো সে অতিক্রম করতে পারে না। অ্যাভারেজ হয়ে থাকার মধ্যেই যেন চিরকাল নিরাপত্তা খুঁজছে রমেন। তাহলেও, এখন ট্রেন ছাড়ার সময় যতো এগিয়ে আসবে, মরিয়া হয়ে সে কী আর ঘন ঘন, সিগারেটে টান দেবে না! এটাই তো স্বাভাবিক। সবুজ আলো ঘন সবুজ হবার আগে পর্যন্ত গাড়ির ভিতর না ঢুকে রমেন নিশ্চিত প্ল্যাটফর্মেই থাকবে।

না হয় দৃশ্যটা মিলে গেল হুবহু। রমেনকে খুঁজে পেল মনীষা; হাতে চব্বিশ-ইঞ্চি স্যুটকেস আর বুকভর্তি ক্রমশ মন্থর-হয়ে-আসা বিসর্জনের বাজনা। রমেনও দেখতে পেয়েছে তাকে। গোড়ার বিস্ময় ও অস্বস্তি কাটিয়ে সে নিশ্চয় ছুটে আসবে দ্রুত, তারপর—

না, হাওড়া স্টেশনটা হিন্দী ফিল্মের রোমান্টিক দৃশ্য হবার পক্ষে অনুকূল নয়।

রমেন ইতিমধ্যে বৃত্তটা সম্পূর্ণ করার দিকে এগোবে। কথা হলো, সে কী বলবে রমেনকে। 'ভেবে দেখলাম তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না। তাই চলে এলাম—'

উঁহু এভাবে বলা যাবে না। নিজের কানেই বিসদৃশ্য শোনাচ্ছে কথাটা—'তোমাকে ভালোবাসি' বলার মতো; সে-পর্ব তারা তিন-বছর আগেই পেরিয়ে এসেছে। দুজন, কিংবা দু'জনের একজন ধরা যাক রমেনই মনীষাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না এটা জানাজানি হয়ে গেছে বহুদিন আগে। না হলে কালকের সন্ধ্যাটির দরকার হতো না। দরকার হতো না মনীষা যে-রকম ভাবছে সেই রকম করে উদ্‌ভ্রান্ত রমেনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ঘন

ঘন সিগারেট টানা বা তার নিজের কব্জিতে-বাঁধা ঘড়িটা স্লো যাচ্ছে না ভেবে নিশ্চিন্ত হওয়া! বরং বলতে পারে মনীষা, 'বুঝতে পারছি তোমাকে নিয়েই ছিলো আমার কলকাতা। তুমি থাকলে দু'শো মাইল দূরত্বেও আবার আমি কলকাতা গড়ে নিতে পারবো।'

রমেন ততক্ষণে তাকে কম্পার্টমেন্টে ঠেলে তুলেছে। যদি জায়গা পেয়ে থাকে, নিজের আসনটুকু মনীষাকে ছেড়ে দিয়ে চেষ্টা করবে সপ্রতিভ হতে। এখন থেকে সে পুরোপুরি দায়িত্ববান হয়ে গেল: বিয়ের মন্ত্র না আউড়েও মনীষার সিঁথিতে তুলে দিয়েছে সিঁদুর। আমার ওপর নির্ভর করে ঠকোনি— মুখে এই রকম হাসি ফুটিয়ে তাকাবে দূরত্ব থেকে। ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে এইটেই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

কিন্তু, সত্যি সত্যিই কী ওই অবস্থায় রমেনকে কিছু বলা দরকার? যে-কোনো কথাই তো মনে হবে পুরনো! অর্জুনের তীরের মতো এই ব্যস্ত ছুটে যাওয়ার মধ্যেই কী তার সমস্ত অনুভব, চিন্তা, উদ্বেগ পরিস্ফুট হচ্ছে না।

নিজেতে ফিরে এলো মনীষা। এখন তেমনি সময় যখন কোনো অনুভূতিই পরিষ্কারভাবে ধরে রাখা যায় না। এমন কি কানাকাড়িও মনে হচ্ছে উদ্বৃত্ত। মনে হচ্ছে নিঃশেষিত। মনে হচ্ছে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না।

গত কুড়ি মিনিটে ট্যাক্সিটা এক গজও এগোতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। তারও কিছুক্ষণ আগে থেকে চারপাশের দুর্ভেদ্য দেয়ালটা চোখে পড়ছে। পিছনে একটা টেম্পো ও লরির আধখানা, বাঁদিকে পর পর দুটো অ্যামবাসাডর, ডানে পুরো একটা ফীয়াট নিয়ে আগুপিছু ট্যাক্সি ও লরি, সামনে একটা ডবলডেকার। ডবলডেকারের পিছনে দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্যরক্ষায় কোনো একটা মাজন ব্যবহার করার সুপারিশ। মাজনের নামটা চোখে পড়ে না। ডানদিকে ষাট ডিগ্রী কোনাকুনি তাকালে বাসী পোসটারের ভিতর থেকে সালোয়ার-কামিজ পরা মেয়েটি বেরিয়ে আসে—'আও প্যার করে'। এত বিস্তৃতভাবে আর কখনো কলকাতাকে লক্ষ করেছে বলে মনে পড়ে না। চলে যাবার আগে কলকাতা যেন তাকে সবকিছু উজাড় করে দেখাতে চায়—দাঁত-মাড়ি-টাকরা সুদ্ধ সবকিছু! এই কলকাতাকেই সে ভালোবেসেছিলো!

শুকনো মুখের ভিতর মরা মাগুরের লেজের মতো লেপটে-থাকা জিভটাকে

ঢোঁক গিলে স্বাভাবিক করে নিলো মনীষা। ড্রাইভারের দিকে তাকালো। পাশ থেকে পিঠ ও মাথার পাগড়ী ও চাপা গালের অংশ বিশেষ চোখে পড়ে। ষ্টীয়ারিং থেকে হাত না সরিয়েও টান-টান হয়ে বসে আছে লোকটা—যেন ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবে মুখ থুবড়ে। ট্যাক্সিতে ওঠার পর থেকে একটিও কথা বলেনি। লোকটা জানে সাতটা পঞ্চাশের ট্রেন ধরার জন্তে ট্যাক্সিতে উঠেছে মনীষা, আর সময় নেই—যে-কোনো মুহূর্তে ট্রেন ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু সেজন্তে লোকটার কোনো ব্যস্ততা বা আগ্রহ আছে বলেও তো মনে হয় না।

ডানদিকের ফীয়াটের বাঁদিকে বসে থাকা লোকটি সিগারেট ধরানোর আগে মণীষাকে চোখ মারলো। ব্যাবুল হয়ে আবার কব্জিটা চোখের কাছে টেনে আনলো মনীষা।

সাতটা সাঁইত্রিশ। হে ভগবান, সাতটা সাঁইত্রিশ। আর মাত্র তেরো মিনিট, শিসেব মতো আর মাত্র পাঁচ মিনিট। হে ধর্মাত্মা, রমেনকে আমি ভালোবাসি। আমারই সামান্ত ভুলের জন্ত প্রগাঢ় অভিমান নিয়ে আজ সে চলে যাচ্ছে দূরে—বহু দূরে। তাকে চেনো। তার পকেটে আছে চাকরির অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার। দু' বছর বেকার থাকার পর এই মুহূর্তে চাকরি পাবার সমস্ত আনন্দ তার মন থেকে প্রতিমার গায়ের মাটির মতো খসে খসে পড়ছে। তাকে তুমি ধরে রাখো। বলো, মনীষা আসছে। ব্রীজ অ্যাপ্রোচের কাছে অসংখ্য অনড় ও নিরাকার গাড়ির অন্ধকারে বসে আকণ্ঠ অপেক্ষায় থরথর করে কাঁপছে সে—তার কানে ঢুকছে নিজের হৃৎপিণ্ড আর লরি, বাস, ট্যাক্সি, মোটর, টেম্পোর বিচিত্র বহমান শব্দ। তেরো মিনিট অনেকটা সময়; এর মধ্যে সে নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবে। সে ফিরে যেতে আসেনি।

গোটা কলকাতা তার যাবতীয় বিন্যাস ও বিশৃঙ্খলা নিয়ে অতর্কিতে ঢুকে পড়লো মনীষার বুকে।

কাল এই সময়ে সে আর রমেন হাঁটছিলো পাশাপাশি। যেমন হেঁটেছিলো তার আগের দিন বা তারও আগের দিন। সে ঠিকঠাক থাকলেও মনে হয় রমেনই গুছোতে পারেনি নিজেকে। পারলে তিনদিনের জায়গায় একটি দিনই ছিলো যথেষ্ট। বেচারা রমেন! গত তিনদিন ধরে ব্যাপারটা মনীষাকে

বোঝাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে সে—হোক বাইরে, দূর, তবু এই চাকরিটা তাদের পক্ষে কলকাতায় থাকার চেয়ে অনেক বেশী জরুরী। দু'বছরে তার শরীরের ওজন কমেছে সাত কিলো। চাকরি পাওয়া আর না পাওয়ার মধ্যে কাঁচের পার্টিশনের মতো ছিল মনীষার ভালোবাসা। স্বচ্ছ হলেও শক্ত কাঁচ, ভেঙে এগনো যায়নি। ভালোবাসা প্রেমিকের শরীরের ওজন বাড়াতে পারে না।

যেতে যেতেই আস্তে আস্তে সহজ হয়ে আসে হাওয়া আর নির্জনতা। দূরে গঙ্গার ওপা[illegible]র আকাশে জেগে ওঠে গভীর সূর্যাস্ত; লাল গম্ভীর হয়ে সন্ধ্যা নামে। হাওয়ায় উড়ে যাওয়া শাড়ির আঁচলটা কাঁধের ওপর গুছিয়ে নেয় মনীষা। রমেন এতোক্ষণ সিগারেট টানছিলো, এইমাত্র ফেলে দিলো। তার সন্তর্পণ হাত চলে যায় পকেটে—প্রায় হৃৎপিণ্ডের কাছে; অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটারটা সে বার বার ছুঁয়ে ছুয়ে দেখে। আজ উনত্রিশ তারিখ, কাল ত্রিশ, পরশু একত্রিশ। তারপর এক তারিখ। তার মানে কালকেই রওনা হতে হবে। কাল, সন্ধ্যে পেরিয়ে, প্রায় এই সময়।

'বলো, মনীষা, কলকাতায় থাকাটাই কী তোমার পক্ষে সব! চাকরিটা পেলাম, ভেবেছিলাম এরপর আস্তে আস্তে—'

মনীষা চেষ্টা করে। তবু নিজের বুকের শূন্যতা স্পর্শ করতে পারে না।

'দু'বছর বেকার বসেছিলে, আরো কিছুদিন থাকলে কী আর এমন দেরি হয়ে যেতো! তা ছাড়া—,' রমেনকে চুপচাপ দেখে মনীষা বললো, 'হাতে তো আরো চারটে ইণ্টারভিউয়ের রেজাল্ট বাকি আছে। সবগুলোই কলকাতায়। এর মধ্যে একটা না একটা হয়ে যাবেই।'

'যদি না হয়?'

'যদি না হয়!' মনীষা চোখ তুললো। অস্পষ্ট আলোয় ক্লোজআপের মতো এগিয়ে আসছে রমেনের ধূসর মুখ। বললো, 'এই চাকরিটাও কী হবে ভেবেছিলে! সময় কারুর এক রকম থাকে না!'

'তোমাকে বুঝতে পারি না—'

গলার দ্বিতীয় স্তর থেকে কথা বললো রমেন, মনীষার কানে তাই অন্য রকম লাগলো। রমেন জানে না, যে-হাওয়ায় সে এতোকাল ধরে নিঃশ্বাস নিয়েছে তা ফুরিয়ে গেলে সে নিজেও মিইয়ে যাবে। দু ঘরের একটা কোয়ার্টার্স আর সাড়ে তিনশো টাকার বিনিময়ে কলকাতাকে সে বিকিয়ে

দিতে প্রস্তুত—এই মনোভাব থেকে মনীষা নিজেকে বাঁচাতে চায়। রমেন কেন বোঝে না, মনীষাও বাঁচতে চায় নিজের মতো করে।

প্রখর আলো জেলে একটা ট্যাক্সি ছুটে আসছে দ্রুত। অন্যদিকে লরি-গুলো সারবন্দী দাঁড়িয়ে। নিজেকে নিয়ে সরে দাড়ালো রমেন। মনীষাকে বোধ হয় সে এরই মধ্যে ভুলতে শুরু করেছে।

'আমি ভেবে নিয়েছি, কালই যাবো। তুমি ভেবে দেখো। ইচ্ছে হলে জানিও। না হলে পড়ে থাকলো কলকাতা তোমার জন্যে। এমন কেউ কেউ নিশ্চয়ই আছে যারা কলিকাতায় থাকে, কলকাতায় বাঁচে, কলকাতায় মরে যায়—'

মনীষা কিছু বলবে। বললেও কী বলবে! তোষামোদে জন্তুর মতো তার সর্বাঙ্গে জিভ বুলোচ্ছে কলকাতা, তার মৃদু উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র চেতনায়। কেন, সে জানে না; কেন, সে বলতে পারে না! বিড়বিড় করে সে শুধু বললো. 'আমি জানি, তুমি যাবে না—'

'ছেলেমানুষ!' ব্যস্তভাবে চুলের ভিতর হাত চালালো রমেন, শব্দ করে হাসলো, 'বড়ো বেশি ছেলেমানুষ!'

এইসব ভেবে ভারী নিঃশ্বাস পড়লো মনীষার। আজ স্টেশনে পৌঁছে হয়তো এই কথাটিই বলা যেতো তাকে, 'ভাখো, কেমন বদলে এসেছি নিজেকে!' একটি কথার বীজে বুক অব্দি শিকড় নেমে যেতো রমেনের।

এতোক্ষণে শব্দকে আড়াল করে থাকার পর আবার সে ' কে যাচ্ছে শব্দের ভিতর। সাতটা বেয়াল্লিশ! আশ্চর্য, সে কি ঘুমিয়ে পড়েছিলো!

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে জ্যাম একটুও নড়েনি। বরং গাড়িগুলো যেন গায়ে গায়ে লেগে এসেছে আরো; বিভিন্ন ও বহুমুখী শব্দের চীৎকারে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে মাথা। মনে হচ্ছে পৃথিবী জুড়ে আকার নেই কোথাও, শুধু শব্দ—মনীষা পালিয়ে যাচ্ছে জেনে কলকাতা তার শব্দবাহিনী নিয়ে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরছে তাকে!

আর সময় নেই। পৌঁছতে হলে এখনই কিছু করতে হয়।

মনস্থির করা মাত্র স্যুটকেসের হ্যাণ্ডেলটা মু ়ে চেপে ধরলো মনীষা। 'সর্দারজী আমি নেমে যাচ্ছি—'

লোকটি ফিরে তাকালো ঘন ভুরুর নীচে জলজল করছে চোখ দুটো।

তারপর মীটারের আলো জাললো। সাত টাকার কিছু বেশীই হয়েছে; তবু, সময় বাঁচানোর জন্য মনীষা এখন পুরো দশটা টাকাই ছুঁড়ে দিতে পারে।

কিন্তু, এ কী! বাঁদিকের দরজাটা খুললেই আটকে যাচ্ছে পাশের অ্যামবাসাডারের গায়ে—মাত্র ইঞ্চি তিনেক ফাঁক দিয়ে সে বেরুবে কী করে।

চেষ্টাটা একটু জোরেই করেছিলো অ্যামবাসাডারের আরোহী হৈ-হৈ করতেই সে ফিরে এলো ডানদিকে। পাশে ফীয়াট, এখানে তবু ইঞ্চি সাতেক ব্যবধান পেলো। ওরই মধ্যে কোনোরকমে নিজেকে টেনে বের করতে চাইলো মনীষা—মাডগার্ডে খোঁচা লেগে শাড়িটা বোধহয় ছিঁড়েই গেল। কনুইয়ের ধাক্কা লাগতে ঝন্ঝন্ করে উঠলো সারা শরীর, তবু সে সুটকেস সমেত বেরিয়ে এলো। যে-লোকটি তাকে চোখ মেরেছিলো, হাসতে হাসতে বললো 'সাবাস!' শরীর টেনে টেনে ফীয়াটটাকে অতিক্রম 'করে গেল মনীষা, ডবল ডেকারটাকে পাশ কাটাতে গিয়ে দেখলো বেরুবার জায়গা নেই, তখন সে আবার বাঁ দিকে ঘুরলো। তারপর দু'তিন পা সোজা। সামনে আর জায়গা নেই—একটা সাদা হোল্ডেন নাক ঘষছে ট্যাক্সির গায়ে। হোল্ডেনের মহিলাটি তার পাশের পুরুষটিকে কনুই ঠেলে বললো, এই ছাখো ছাখো—!

সকলের দৃষ্টি এখন মনীষার দিকে। একটি মেয়ে তার প্রেমিকের কাছে পৌঁছতে চায়—সময় বড়ো অল্প, কেউ তা ভাবছে না। এই অসম্ভব জ্যাম থেকে অন্তত কিছুক্ষণ চোখ ফেরোনোর কৌতূহল সৃষ্টির জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সকলে তাকে ধন্যবাদ দিলো।

রমানাথ রায়



রত্না ও সাবান

রত্না মারা গেছে। কিভাবে মারা গেছে তা জানি না। যা জানি তা অনেকটাই এই রকম :

একদিন বিকেলবেলা বাড়ি ফেরার পথে রেস্তোরাঁয় ঢুকে কাটলেট খেতে খেতে হঠাৎ মনে হল, রত্নাকে আমি আর ভালবাসি না। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম। কাটলেট শেষ করে দাম মিটিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। রত্নার জন্যে ভীষণ দুঃখ হতে লাগল। রত্নাকে আমার ভালবাসা উচিত। রত্না আমার স্ত্রী। রত্নার প্রতি আমার দায়িত্ব আছে, যদিও সব দায়িত্ব আমি পালন করতে পারি না। যেমন, বাসন মাজতে ঝি না-এলে আমার কিছু করার নেই। বা, চাকর পালিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চাকর খুঁজে আনার ক্ষমতাও আমার নেই। তবে এসব কাজে আমার অক্ষমতা প্রকাশ পেলেও রত্নাকে সপ্তাহে একদিন করে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাই। মাঝে-মাঝে ট্যাক্সি করে বাপের বাড়িও পৌঁছে দিই। এছাড়া কখনো কখনো শাড়ি কিনে দিই, গয়না কিনে দিই, স্নো-পাউডার কিনে দিই। শুধু তাই নয়, কাজের সুবিধে হবে বলে গ্যাসের উনুনের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, ফ্রিজ কিনে দিয়েছি। আবার, অবসর বিনোদনের জন্যে রেকর্ড-প্লেয়ার কিনে দিয়েছি। একটা টি ভি সেটও আনিয়েছি। অবশ্য রত্নাও আমার জন্যে অনেক কিছু করে। যেমন, সময়মত প্রতিদিন ভাত রেঁধে দেয়, জল-খবার করে, গেঞ্জি কাচে, জাঙিয়া কাচে, ঘর গোছায়, পাকা চুল তুলে দেয়। আবার অসুখ হলে ডাক্তার ডেকেও আনে। অথচ এই রত্নাকে আমি আর ভালবাসি না। এর মানে এই নয় যে আমি অন্য কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছি। আমার পক্ষে প্রেমে পড়া আর সম্ভব নয়। এখন আমি মেয়েদের

জেনে গেছি। এখন আমি মেয়েদের বিরুদ্ধে। এখন আমার কাছে মেয়ে মাত্রই হিংসুটে নির্বোধ, স্বার্থপর, ঝগড়াটে, অবুঝ ও হৃদয়হীন। মেয়েদের সঙ্গে তাই প্রেম করা দূরে থাক, কথা বলারও ইচ্ছে হয় না। মেয়েদের আমি সযত্নে এড়িয়ে চলি। শুধু স্ত্রী বলেই রত্নাকে এড়িয়ে চলতে পারি না। তাই তার সঙ্গে কথা বলতে হয়। একখাটে শুতে হয়। চুমু খেতে হয়, গালে গাল ঘষতে হয় এবং আরো কত কি করতে হয়। কিন্তু এখন থেকে কি করব? আমি রত্নাকে আর ভালবাসি না। হয়ত অনেকদিন ধরেই বাসি না। তবে কথাটা কখনো মনে হয়নি। আজ মনে হল।

বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ইচ্ছে হল, রত্নাকে আবার ভালোবাসি আদর করি। কিন্তু কি করে করব? আমি আর রত্নাকে ভালবাসি না। রত্না অবশ্য একথা জানে না। জানানো ঠিকও নয়, জানালে রত্না খুব কষ্ট পাবে। কান্নাকাটি করবে। হয়ত খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেবে আমি তা সহ্য করতে পারব না। তার চেয়ে এ ত ভাল। আমি রত্নাকে কিছু বলব না। রত্নাও কিছু জানবে না। এইভাবে আমরা আস্তে আস্তে বুড়ো হব। তারপর একদিন আমি মরে যাব। রত্না তখন অনেকদিন ধরে কষ্ট পাবে। আমার কত মিথ্যে কথা সত্যি ভেবে চোখের জল ফেলবে। ভাববে, লোকটা আমায় কত ভালবাসত! তবে, যাকে আমি ভালবাসি না, সে কি কিছু কোনদিন বুঝতে পারবে না? কিছু আবিষ্কার করতে পারবে না? তার মনে কোনদিন সন্দেহ আসবে না? আমি ঠিক একদিন না একদিন ধরা পড়ে যাব। অতএব ধরা যাতে না পড়ি তার ব্যবস্থা এখন থেকে করতে হবে। অর্থাৎ দশ বছর আগে আমি যা করতাম এখন তাকেই নিখুঁতভাবে নকল করতে হবে। না, আমি তা পারব না। কিছুতেই না। তার চেয়ে জিনিস কিনে দিয়ে ভালোবাসা দেখানো অনেক সহজ। রত্না সাবান ভালবাসে। আমি তাকে প্রতিদিন একটা করে সাবান দিতে পারি। আমি তাই কিনে দেব।

বাড়ি ফেরার পথে একটা দোকান পড়ল। আমি সেখান থেকে একটা দামী সাবান কিনলাম। সাবানের মোড়কে গোলাপের ছবি। গোলাপের গন্ধ পাব বলে নাকের কাছে সাবানটা নিয়ে এলাম। না, কোন গোলাপের গন্ধ পেলাম না। সাবানেরই গন্ধ পেলাম। হয়ত মাখবার পরে গোলাপের গন্ধ বেরোবে। অর্থাৎ সাবান মেখে রত্না যখন ঘরে ঢুকবে আমি তখন

রত্নার গা থেকে গোলাপের গন্ধ পাব। মেয়েদের গা থেকে আমি কোনদিন কোন ফুলের গন্ধ বা চন্দনের গন্ধ পাইনি। তাদের গা থেকে সবসময় ঘামের বোটকা গন্ধ বেরোয়। মেয়েরা কি এই কারণে সাবান মাখে। দুবেলা সাবান মাখে?

বাড়িতে ঢুকে সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় উঠলাম। ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ ছিল। কলিং বেল টিপলাম। ভিতরে ডিং ডিং শব্দ হল। বাইরে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। এখন রত্না ছাড়া ঘরে কেউ নেই। দুদিন হল চাকরটা দেশে গেছে, দরজা রত্নাই খুলে দেবে। কিন্তু রত্না খুলল না। আবার কলিং বেল টিপলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম। আস্তে আস্তে বিরক্ত হতে লাগলাম। রত্না দরজা খুলল না। আবার কলিং বেল টিপে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখতে দেখতে প্রায় পনের মিনিট পার হয়ে গেল। তখন দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা মারতে লাগলাম। তাতেও কিছু হল না। শেষে লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেললাম। রাগে শরীর কাঁপছিল। রত্নাকে আমি আজ খুন করব। রত্না নিশ্চয় ঘুমিয়ে আছে। শোবার ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালাম। যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। রত্না খাটের ওপর শুয়ে আছে। তার মুখ হাঁ করা, চোখ খোলা। গায়ে হাত রেখে ধাক্কা দিতে গিয়ে চমকে উঠলাম। গা বরফের মত ঠাণ্ডা। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডেকে আনলাম। ডাক্তার বললেন, অনেকক্ষণ হল মারা গেছে।

আমি সাবানটা তারপর কি করেছি মনে নেই। সাবানটা আর খুঁজে পাচ্ছি না। তবে সাবানটা আমার চাই।

২

না, সাবানটা আমি আর পেলাম না। না পাওয়াতে সব গোলমাল হয়ে গেল। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। আমি কি সাবান কিনিনি? হয়ত কিনিনি। আমি তাহলে আবার গোড়া থেকে শুরু করছি:

একদিন বিকেলবেলা বাড়ি ফেরার পথে রেস্তোরাঁয় ঢুকে কাটলেট খেতে খেতে হঠাৎ মনে হল, রত্নাকে আমি আর ভালবাসি না। সঙ্গে সঙ্গে আমার চমকে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু আমি চমকাইনি। কাটলেট শেষ করে দাম মিটিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। রত্নার জন্যে নয়, নিজের জন্যে

ভীষণ দুঃখ হতে লাগল। আমি কি করব এখন? কোথায় যাব? কার কাছে যাব? আবার রত্নার কাছে ফিরে যাব? রত্নার কাছে প্রতিদিন ফিরে যাই। রত্না যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন রত্নার কাছেই ফিরে যেতে হবে। কারণ, রত্নাই আমার স্ত্রী। স্ত্রী বলেই তার সব আবদার মেনে নিতে হবে। যা বলবে তাই শুনতে হবে। এতকাল শুনে এসেছি। বলেছে ফ্ল্যাট কেনো। কিনে দিয়েছি। বলেছে, রেকর্ড-প্লেয়ার কেনো। কিনে দিয়েছি। বলেছে, টি ভি সেট কেনো। কিনে দিয়েছি। বলেছে, রান্নার জন্যে গ্যাসের ব্যবস্থা করো। করে দিয়েছি। বলেছে, চাকর রাখো। রেখেছি। আর কি করব? মাঝে মাঝে শাড়ি কিনে দিচ্ছি, গয়না কিনে দিচ্ছি, সিনেমা থিয়েটার দেখাচ্ছি, বাপের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। এছাড়া স্নো-পাউডার কিনে দিচ্ছি, সাবান কিনে দিচ্ছি। কিনতে কিনতে বিশেষ করে সাবান কিনতে কিনতে আমি এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। রত্নার দুদিন অন্তর সাবান চাই। এত সাবান কি করে? দুবেলা মাখে? নাকি জমিয়ে রাখে? যাই করুক, রত্নাকে আমি আর সাবান কিনে দেব না। আমি আর পারছি না। আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

মেয়েরা ভীষণ সাবান ভালোবাসে। কেন বাসে তা আমি জানি না। এই সাবানের জন্যে তারা সব কিছু করতে পারে। দরকার হলে ঝগড়া করতে পারে, চুরি করতে পারে, এমনকি খুনও করতে পারে। আমি মেয়েদের বিশ্বাস করি না। আমি আমার মাকে দেখেছি। মা সাবান নিয়ে দুবেলা বাবার সঙ্গে ঝগড়া করত। সাবান না পেলে রাগ করে মুখে কিছু দিত না। উপোস করে থাকত। আমার জ্যেঠিমা একবার এই সাবানের জন্যে দুদিন জ্যেঠামশাইকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। আমার দিদি একবার সাবান নিয়ে জামাইবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে বাপের বাড়ি চলে এসেছিল। তবু মেয়েদের কেন যে লেখকরা প্রশংসা করেন তা আজো বুঝতে পারিনি। বিয়ে করার আগে অবশ্য মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে, জড়িয়ে ধরতে ভাল লাগে, চুমু খেতে ভাল লাগে, গালে গাল ঘষতে ভাল লাগে। কিন্তু বিয়ে করার চার-পাঁচ বছর পরে এসব আর ভালো লাগে না। তখন গোটা ব্যাপারটাই কি হাস্যকর আর ছেলেমানুষী বলে মনে হয়। যার হয় না সে বিকারগ্রস্ত, অসুস্থ। আমাকে কেউ যদি এখন বিয়ে করতে চায় আমি রাজি হব না। প্রেম করতে এলে আমি পালিয়ে যাব। মেয়েদের এখন

আমি ভীষণ ভয় করি। তাদের সযত্নে এড়িয়ে চলি। শুধু স্ত্রী বলেই রত্নাকে এড়িয়ে চলতে পারি না। খুব বিরক্তি লাগলেও এক খাটে শুতে হয়, চুমু খেতে হয়, গালে গাল ঘষতে হয় এবং আরো কত কি করতে হয়।

বাড়ি ফেরার পথে অনেকগুলো দোকান পড়ল। আমি কোন দোকানে ঢুকলাম না। আজ সাবান কিনে বাড়ি ফেরার কথা। আমি সাবান কিনব না। আর কোনদিন কিনব না। জানি, রত্না খুব রেগে যাবে। চিৎকার করবে। বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠবে। কিন্তু সাবান নিয়ে মেয়েদের এত বাড়াবাড়ি আমি আর সহ্য করব না।

বাড়িতে ঢুকে সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় উঠলাম। ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ ছিল। কলিং বেল টিপলাম। ভিতরে ডিংডিং শব্দ হল। বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রত্না ছাড়া এখন ঘরে কেউ নেই। দুদিন হল চাকরটা দেশে গেছে। দরজা রত্নাই খুলে দেবে। কিন্তু দরজা খুলল না। আবার কলিং বেলটিপে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু এবারেও রত্না এসে দরজা খুলল না। আমি ভীষণ রেগে গেলাম। ইচ্ছে হল লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলি। তবে তা করতে হল না। রত্নাই এসে দরজা খুলে দিল। দিয়েই জিজ্ঞেস করল :

—সাবান এনেছ ?

সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় খুন চেপে গেল।

—কি বললে ?

—সাবান এনেছ ?

—আবার বল।

রত্না এবার ভয় পেয়ে গেল। পিছনে ফিরে দৌড়ে শোবার ঘরে ঢুকল। আমিও শোবার ঘরে ঢুকলাম। রত্না আলমারির পিছনে লুকোবার চেষ্টা করল। আমি রত্নার হাত ধরে টান দিলাম। রত্না আমার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমি জিজ্ঞেস করলাম :

—আবার বল।

রত্নার তখন সারা শরীর কাঁপছে।

—কি ?

—কি জিজ্ঞেস করছিলে ?

—কিছু না।

তারপর কি হয়ে গেল। রত্না মাটিতে কাত হয়ে পড়ল। আমি রত্নাকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। তখন রত্নার মুখ হাঁ করা. চোখ খোলা। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। দৌড়ে ডাক্তার ডেকে আনলাম। ডাক্তার বললেন, অনেকক্ষণ হল মারা গেছে।

৩

আমি আবার সাবান খুঁজে পেয়েছি। একখানা বা দুখানা নয়; অনেক, অনেক সাবান। এত সাবনে কোথেকে এল? কে নিয়ে এল? হয়ত আমিই এনেছি। যেদিন রত্না মারা যায় সেদিনই এনেছি। আস্তে আস্তে সব যেন মনে পড়ল। এটা অনেকটা এইরকম:

একদিন বিকেল বেলা বাড়ি ফেরার পথে রেস্তোরাঁয় ঢুকে কাটলেট খেতে-খেতে সাবানের কথা মনে পড়ল। রত্না সাবান আনতে বলেছিল। প্রতিদিনই বলে। কোনদিন মনে থাকে না। কেবলি ভুলে যাই। আজ মনে পড়েছে। আজ ঠিক সাবান নিয়ে যাব। তাড়াতাড়ি কাটলেট শেষ করে দাম মিটিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম।

রত্না সাবান ভালবাসে। ওর জন্য এখন সাবান কিনতে হবে। রত্না যা যা ভালবাসে সব কিনে দিয়েছি। রত্না ফ্ল্যাট ভালোবাসে। ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছি। গান ভালবাসে, রেকর্ড-প্লেয়ার কিনে দিয়েছি। টি ভি সেট ভালবাসে, টি ভি সেট কিনে দিয়েছি। ফ্রিজ ভালবাসে,ফ্রিজ কিনে দিয়েছি। গ্যাসের উনুন ভালবাসে, গ্যাসের উনুন কিনে দিয়েছি। চাকর ভালবাসে. চাকর এনে দিয়েছি। এছাড়া রত্না আরো অনেক কিছু ভালবাসে। শাড়ি ভালবাসে। শাড়ি কিনে দিই। গয়না ভালবাসে। গয়না কিনে দিই। সিনেমা ভালবাসে। সিনেমা দেখাই। বাপের বাড়ি যেতে ভালবাসে। বাপের বাড়ি নিয়ে যাই। স্নো-পাউডার ভালবাসে, স্নো-পাউডার কিনে দিই। তবে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে সাবান। আমি তাই দুদিন অন্তর সাবান কিনে দিই। কিনতে কিনতে আমি এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এত সাবান কি করে? কদিন হল সাবান আর আনি না। কেবলি ভুলে যাই। ফলে এখন সাবান নিয়ে দুবেলা ঝগড়া হয়, অশান্তি হয়। আমি অশান্তি পছন্দ

করি না। বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে। তাই রত্না এতকাল যা বলেছে, শুনেছি। কিন্তু আজকাল আমি নাকি কিছু মনে রাখতে পারি না। সব নাকি আমার ভুল হয়ে যায়। বাজার থেকে বিস্কুট আনতে বললে পাউরুটি নিয়ে আসি। গরমমসলা আনতে বললে জিরে নিয়ে আসি। এসব আমি বিশ্বাস করি না। এসব রত্নার বানানো। আসলে রত্নারই ভুল হয়। রত্না তা স্বীকার করে না। নিজের দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। আমি অশান্তি করি না। ফলে যা বলে মেনে নিই। কিন্তু কতকাল মানব? রত্নাকে আমি আর ভালবাসি না। ওকে দেখলেই আমার এখন ভীষণ ভয় হয়। মনে হয়, আমি হয়ত কোন ভুল করেছি, আমাকে বকবে। রত্ন'র কথা আমার আর সহ্য হয় না। শুধু রত্না নয়, কোন মেয়ের কথাই আমার আর সহ্য হয় না। মেয়েদের শরীর এত নরম, তাদের কথা নরম নয় কেন? তারা কেন এত চেঁচিয়ে কথা বলে? মা, জেঠিমা, দিদি রত্না সকলেই একরকম। মেয়েদের আমরা আর কতকাল সহ্য করব? শুধু তারা ভাত রাঁধতে পারে বলে, কাপড় কাচতে পারে বলে, ঘর-দোর পরিষ্কার রাখতে পারে বলে তাদের এত অহঙ্কার কেন? এসব কাজ একটা চাকরই করতে পারে। বিয়ে না করে প্রত্যেকের একটা চাকর রাখা উচিত। তাহলেই মেয়েরা ঠিক থাকবে। আমার কাছে রত্নার কোন দাম নেই। মা, জ্যেঠিমা, দিদি সবাই একে একে মরে গেছে। রত্না কবে মারা যাবে? রত্না মরে গেলে আমার কোন অসুবিধে হবে না। কারণ, আমার চাকর আছে। সে সব করে দেবে।

রত্ন এখনো বেঁচে আছে। অতএব রত্নার জন্যে সাবান আমাকে কিনতেই হবে। না কিনলে অশান্তি হবে। আমি অশান্তি ভালবাসি না। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির কাছেই একটা দোকান পড়ল। দোকানের মুখে দুদিকে দুটো শো-কেস। শো-কেসে থরে থরে সাবান সাজানো। আমি সেই দোকান কয়েকটা সাবান কিনলাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে আবার একটা দোকান পড়ল। সেখান থেকেও কয়েকটা সাবান কিনলাম। এইরকম আরো দোকান পড়ল। আমি আরো সাবান কিনলাম। কিনতে কিনতে সাবানের রঙিন মোড়ক, সাবানের গন্ধ আমার নেশার মত পেয়ে বসল। দুটো থলি কিনে সাবান বোঝাই করে বাড়ি ঢুকলাম। আমি এ সাবান কাউকে দেব না, রত্নাকেও না। এসব এখন আমার। রত্না যদি চাইতে আসে রত্নাকে

তাড়িয়ে দেব। আমি আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় উঠলাম। উঠে দেখি আমার ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। ভিতরে এক জায়গায় থলি দুটো লুকিয়ে রাখলাম। তারপর রত্নার নাম ধরে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু রত্নার গলা পেলাম না। শোবার ঘরে গিয়ে দেখি রত্না শুয়ে আছে। রত্নার মুখ হাঁ করা, চোখ খোলা। গায়ে হাত রেখে ডাকতে গিয়ে চমকে উঠলাম। আমার কেমন সন্দেহ হল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডেকে আনলাম। ডাক্তার দেখে বললেন, অনেকক্ষণ হল মারা গেছে।

৪

এখন রত্না নেই। এখন সব সাবান আমার। আমি সারাদিন সাবান নিয়ে খেলা করি। সাবান দিয়ে কখনো বাড়ি তৈরী করি। কখনো কুয়ো তৈরী করি, কখনো ট্রেনের লাইন তৈরী করি। মাঝে মাঝে সেই বাড়িতে থাকি, কুয়োয় স্নান করি, সেই লাইনের ওপর হুস হুস করে অনেকদূর চলে যাই। তারপর আবার ফিরে আসি। বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ি। সেখানে ঘুমোই। সেখানে রত্না নেই, কোন মেয়ে নেই। সেখানে আমি একা। আমার কোন চাকর নেই। আমি নিজে কুয়ো থেকে জল তুলি, নিজে রান্না করি, নিজে কাপড় কাচি। আমার এখন কাউকে দরকার হয় না।

একদিন দরজায় কে যেন ঠকঠক করে শব্দ করতে লাগল। আমি দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলাম। দরজা খুললাম না।

অবিকল রত্নার গলায় একজন বলল :

—দরজা খোল।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অবিকল রত্নার গলায় আবার একজন বলল :

—দরজা খোল।

আমার বুক কাঁপতে লাগল। আমি দরজা খুলে দিলাম। দেখি রত্নার মত আর এক রত্না দাঁড়িয়ে আছে। আমি টুক করে সাবানের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

রত্নার মত দেখিতে মেয়েটা এখন পাশের ঘরে থাকে। সে আমার একটা সাবানেও হাত দেয়নি। মাঝে মাঝে শুধু আমার ঘরে আসে। আমাকে স্নান করিয়ে দেয়, খেতে দেয়, কিন্তু আমার পাশে আর শোয় না। আর জড়িয়ে ধরে না, চুমু খায় না, গালে গাল ঘষে না। আমার কাছে কিছু চায় না। আমাকে খুব যত্ন করে। আমাকে খুব ভালবাসে। আমি এবার অন্য গল্প লিখব। এবার সব ঠিক ঠিক লিখতে পারব। আমার হয়ত আর ভুল হবে না। গল্পটা এইভাবে শুরু হবে :

রত্না মরেনি। না, রত্না মারা গেছে। কিভাবে মারা গেছে তা জানি না। যা জানি তা অনেকটা এইরকম :

একদিন বিকেলবেলা বাড়ি ফেরার পথে রেস্তোরাঁয় ঢুকে কাটলেট খেতে খেতে হঠাৎ মনে হল·

সমীর রক্ষিত

সাবধান, সব দরজা জানালা বন্ধ রাখো



মনের মধ্যে যখন আনন্দ বা উত্তেজনার টলোমলো হাওয়া বয় তখনই কী করে যে কুভাবনার একটা চোরা জানলাও খুলে যায় কে জানে? তপেনের মনের স্বরূপটা অনেকটা এরকমই। নয়তো সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে সে চমকাবে কেন?

ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। সন্ধ্যার পর আর আজকাল খোলা রাখা হয় না। আকছার রাহাজানি হচ্ছে। সেদিনই ঠিক তাদের মাথার ওপরে—চারতলার ফ্ল্যাটে ঢুকে সর্বস্ব নিয়ে গেছে; যারা এসেছিল তাদের বয়েস কম, হাতে ছোরাছুরি পিস্তল ছিল, আর মুখগুলো ছিল রুমালে বাঁধা। অর্থাৎ খুব অজানা অচেনা কেউ নয়, ধারে কাছেরই তারা। কারুকে আর বিশ্বাস করা যায় না আজকাল!

এর পরেই কালীর মার ওপরে হুকুম হয়েছে সর্বক্ষণ দরজা বন্ধ রাখার। পর্ণা আরো সাবধান। বেল বাজালেও দরজা খোলে না। কে? কে?—বলে চেঁচায় তারপর গলার আওয়াজ শুনে নিঃসন্দেহ হয়ে তবে দরজা খোলে।

কিন্তু আজ কী হল? পলকেই ভয়ঙ্কর কিছু ভেবে নেয় তপেন। দ্রুত শেষ কয়েকটা ধাপ টপকে ঘরে এসে ঢোকে। ঘরে ঢুকে আরো অবাক হয় তপেন। একজন যুবক ছেলে সোফায় পেছন-ফিরে বসে কাগজ দেখছে।

শব্দ করে দরজা বন্ধ করে সে।

'এই যে তপুদা এসে গেছ?'—ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়।

'ও বিভু তুই? আমি তো পেছন থেকে তোকে চিনতেই পারিনি। বোস বোস। কতক্ষণ?'

'অনেকক্ষণ। তোমার দেরী দেখে আমি কী করব ভাবছিলাম।'

'তবু তো আজ তাড়াতাড়িই এসেছি। আরো দেরী হয়।' আজ তপেন পর্ণাকে নিয়ে ফিল্ম শোয়ে একটা বিদেশী ছবি দেখতে যাবে, কথা আছে। ফিল্মটা নিয়ে খুব হৈচৈ হয়েছে দেশে বিদেশে। আনসেনসরড্ দেখানো হচ্ছে। 'আমার তো আসতে দু' ঘণ্টারও ওপর লাগল। কলেজ স্ট্রীট অবধি এসে বাসটা ব্রেক ডাউন হল, তারপর আর বাস পাই না—' বিভাস হাসে, তিক্ত হাসি।'

'ওহ্ রাস্তাঘাটের ট্রাম বাসের যা হাল হয়েছে আজকাল।' তপেন বিভুকে শুধুমাত্র সহানুভূতি জানাবার জন্য বলে না কথাগুলো। অনেকদিন বিভুদের বাড়ি যাওয়া হয়নি, তারই প্রচ্ছন্ন অজুহাত আছে এতে। তপেনের নিশ্চিত ধারণা মাসিমাই বিভুকে পাঠিয়েছে। বিভুর মা তপেনের মার ছোটবোন। দমদমের এই মাসির বাড়িতে পুরো পাঁচ বছর থেকেই যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং এর ডিগ্রী নিয়েছে তপেন।

'তুই বোস বিভু, আমি হাত মুখ ধুয়ে আসি।'—পর্ণাকে দু'চোখে খুঁজতে খুঁজতে তপেন বলে।

'বেশীক্ষণ বসতে পারব না কিন্তু'।—বিভু সেণ্টার টেবল থেকে একটা ইভল উইকলি তোলে।

আরে বোস না। কতদিন বাদে এসেছিস বলতো? অত তাড়া কিসের? —তপেনের মনটা আজ বিশাল হয়ে আছে—ভোরের সূর্য ওঠা নির্মেঘ আকাশের মত। আজ সারাটা দিন তার উত্তেজনায় কেটেছে অফিসে। তার ঠিক ওপরের পোস্টের এঞ্জিনীয়ার ব্রতীশ দত্তর সঙ্গে কোম্পানীর খিটিমিটি চলছিল অনেকদিন। তপেনকে চারটে ইনক্রিমেণ্ট দিয়ে কোম্পানী হঠাৎ আজ ব্রতীশ দত্তর কাজগুলো তার হাতে দিয়েছে। ব্রতীশ দত্তকে কোম্পানী কার্যত ইন-অ্যাকটিভ করে রাখতে চাইছে। এঞ্জিনীয়ারদের সবাই এর বিপক্ষে। কিন্তু তপেন কোম্পানীর অফার প্রত্যাখ্যান করেনি। পর্ণাকেও আজ একটা বড় সারপ্রাইজ দেবে তপেন।

শোবার ঘরে ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে পর্ণা সাজগোজ করছে। ঠিক এই মুহূর্তেই হয়তো 'একটা গুড নিউজ আছে পর্ণা।' এই কথাটা তপেন বলত কিন্তু হঠাৎ মনের মধ্যে ছোট্ট একটা হোঁচট খায় তপেন।

পর্ণা জমকালো সাজগোজ করছে বলে নয়, বাইরে বিভু একলা বসে

আছে, ঠিক যেন অচেনা অজানা অনাত্মীয়ের মত, আর পর্ণা ঘরের মধ্যে সাজে মগ্ন—কেমন যেন খাপছাড়া লাগে। ঠিক সহসা কুভাবনার চোরা জানালা খুলে যাবার মতই। তপেনের মনটাই এরকম। বিরক্তির একটা তপ্ত ধারা মাথার মধ্যে ফিনকি দিয়ে ওঠে অকস্মাৎ।

বিভুকে ছোট থেকে বড় হতে দেখেছে তপেন। তাছাড়া শ্রদ্ধা বা ভালবাসা বলতে যা বোঝায় তারও চেয়ে বেশীকিছু পেয়েছে সে ওদের বাড়িতে। লেখাপড়ায় সে যতটা ভাল ছিল তারও চেয়ে বেশী গৌরব ছিল মাসিমার; মাসি মেশো সবার স্নেহের সঙ্গে তার লেখাপড়ার কৃতিত্বের প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতি থাকত। সেটা তপেন কম উপভোগ করেনি মনে মনে। বিভুর কাছেও সে ছেলেবেলা থেকেই একটা কেউ-কেটা গোছের লোক। শ্রদ্ধের প্রতিভাবান ব্যক্তি। ছোট্ট করে তপেন বলে—'বিভু ও-ঘরে একলা বসে আছে?'

আড়চোখে পর্ণা আয়নায় তাকায়—'ও কতক্ষণ এসেছে জানো? এতক্ষণ ও-ঘরেই ছিলাম। ভদ্রতার কোন ত্রুটি হয়নি।'

'চা টা দিয়েছ তো?'

'না, তোমার অপেক্ষায় আছি।' ঠোঁট বাঁকিয়ে লিপস্টিক লাগায় পর্ণা। তার তেরছা কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ—তুমি আমাকে কী ভাবো বলতো?'

তপেন আর কথা বাড়ায় না। আজকের দিনে কারো সঙ্গে সে মনোমালিন্য করবে না।

টাই খুলতে খুলতে তরল হাসির শব্দে তপেন বলে—'জোর সেজেছ তো আজ।'

'তাই নাকি? চোখে পড়েছে?'—আয়নায় আবছা হাসি হাসে পর্ণা—আজকাল তো কিছুই চোখে পড়ে না তোমার।'

কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে তপেন বলে—'খুব কোল্ড হয়ে যাচ্ছি পর্ণা, বয়েস বাড়ছে।'

'তুমি কবে হট ছিলে?'

'ছিলাম না!' অবাক হয়ে তাকায় তপেন।

পর্ণা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্লাউজ পাল্টায় বুকের ওপরে ফেলে-রাখা হ্রস্ব আঁচলের আড়ালে। তার নগ্ন বাহুমূল ফ্লুরেসেন্ট আলোয় ঝলসে ওঠে—পর্ণা আপাত-উদাসীন ভঙ্গিতে বলে—'কী জানি, ভেবে বলতে হবে।'

তপেন মুগ্ধ চোখে তাকায়। পায়ে পায়ে এগোয় পর্ণার দিকে। তার চোখ মুখ পাল্টে যায়। ঘোর ঘোর স্বপ্নালুকণ্ঠে বলে—'কেন, ভেবে বলতে হবে কেন পর্ণা, সব কি ভুলে গেছ? কিছুই কি মনে পড়ে না? পর্ণার খোলা কাঁধে হাত রাখে তপেন। যেন সেখানে সব পুরনো কথা প্রাচীন-লিপির মত উৎকীর্ণ হয়ে আছে। বহু আগে, গোড়ার দিকে পর্ণার যত্নের সাজসজ্জা কতদিন—মুহূর্তে নয়ছয় করে দিয়েছে সে। খোঁপা গিয়েছে খসে, বেশবাস শিথিল হয়েছে, ঠোঁটের লিপস্টিক হয়েছে এবড়ো-খেবড়ো। ফিরে ফিরতি পর্ণাকে নতুন করে সাজতে হয়েছে।

দুহাত ছড়িয়ে কৃত্রিম ক্রোধে ফুঁসেছে পর্ণা, বলেছে—'দেখ তো এক মিনিটে কী করে দিলে? তুমি যা গুণ্ডা না? এখন পর্ণা কিছু বলে না। কিন্তু প্রশ্রয়ের ইঙ্গিতে অপাঙ্গে তাকায়। উন্মুখ শরীরে দাঁড়িয়ে থাকে। তার উন্নত বুকের ওপর দিয়ে পরস্পর বিপরীতগামী দুহাতের নিবিড় বন্ধনে তপেন তাকে ঘনিষ্ঠ করে টানে। তার দীঘল শুভ্র গ্রীবায় ছোট্ট করে একটা চুমু খায় নেশাগ্রস্তের মত। তার বলতে ইচ্ছা করে—'পর্ণা একটা গুড নিউজ আছে। অফিসের সব চেয়ে উঁচু চেয়ারটায় বসব আমি আগামীকাল থেকে।

একথা ভাবতেই হঠাৎ খুচ করে মাথার মধ্যে একটা পিন-ফোটা টের পায় তপেন। বিভু কি আজ আবার তার চাকরির জোগাড় করে দেবার তাগিদ দিতে আসেনি? এক্ষুণি হয় তো—

ঠিক এসময়ে কালীর মা ঘরে ঢোকে এবং তদ্দণ্ডেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফের কিচেনের দিকে ছিটকে যায়। আরেকদিন পর্ণাকে ঠিক এখানে দাঁড়িয়ে আদর করবার সময় একটা ছিচকে টিকটিকি ঝপাৎ করে পড়েছিল তপেনের ঘাড়ে।

পর্ণা পিছলে যায় ত্রস্ত তাপেনের বুক থেকে।

দু'হাতে শাড়ি গুছিয়ে বলে—'কী হল, তুমি ওরকম হা করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? হাতমুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নাও।'—গলা উঁচু করে পর্ণা বলে—'কালীর মা, দাদাবাবুর খাবারটা দাও।'

কিছুটা হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল তপেন। নাড়া খেয়ে যেন জেগে ওঠে সে: বলে—'বিভুটা এসেছে—এতদিন বাদে, আমাদের যাওয়া কী উচিত হবে পর্ণা? আজকে বাদ দিলে হয় না?'

সহসা ঘরের আলো নিবে গেলেও বোধ হয় এত অন্ধকার দেখাত না পর্ণার মুখ, থমথমানো গলায় সে বলে—সে কী! তুমি যাবে নাকি?'

'শুধু আমি কেন? আমরা কেউই যাব না, ক্যানসেল করে দাও। ছেলেটা বসে আছে আমার সঙ্গে কথা বলবে বলে—আর।'

'তা কথা বল না তুমি। ক'মিনিট লাগবে?'

'ক'মিনিটের কথা না পর্ণা। ডিসেন্সি, একটা ভদ্রতা বলে কথা আছে।'

'ইস তোমার কথা শুনলে না?'—যেন কপালে আগুনের ফুলকি এসে পড়েছে পর্ণার চোখমুখ এমন বিকৃত হয়ে যায়—'তাহলে তুমি থাক, যত খুশী ভদ্রতা কর। দোতালায় মিসেস শ্রীবাস্তব ঝুলোঝুলি করছিল আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'আস্তে পর্ণা আস্তে। কখন কীভাবে কথা বলতে হয়, রেগে গেলে তোমার সত্তাও খেয়াল থাকে না।'—চাপা ফ্যাসফ্যাসে গলা তপেনের।

ভয়ঙ্কর কিছু একটা বলবে বলেই হয়তো সবেগে মুখ ঘোরায় পর্ণা কিন্তু কিছু বলে না। দু'মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তপেনের চোখাচোখি তাকিয়ে থাকে; তারপর ব্যাগ হাতে তুলে বলে—আমি যাচ্ছি।'

'যাও'—আদেশও না অনুরোধও না—তপেনের গলার স্বর কিম্ভূত শোনায়।

পর্ণা ভেতরের ঘর থেকে বাইরের ঘরে চলে যায়—তপেন বাথরুমে গিয়ে শাওয়ার খোলে। সারা গায়ে যখন জল ঝরে পড়ে তখন তপেনের মনে পড়ে আজকে এসেই পর্ণাকে একটা সুসংবাদ দেবার ছিল।

গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি গলাতে গলাতে দু' ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় তপেন বলে—'কালীর মা, আমাদের দু'জনকেই খাবার দাও।

বিভু প্রতিবাদ করে—'আমি এসেই চা মিষ্টি খেয়েছি তপুদা, আর খাব না।'

বিভুর কণ্ঠস্বর কি আগেও এমন রুক্ষ রসকষহীন ছিল, তপেন মনে আনতে পারে না। প্রায় ছ'মাস বাদে ওর গলা শুনছে তপেন। একটু চমকায়।

'আরে বাবা, খেয়েছিস তো কী হয়েছে। যেতেও তো তোর ঘণ্টা দেড়েক লাগবে, সব হজম হয়ে যাবে।'

তপেন বিভুর মুখের দিকে না তাকিয়েই বলে কথাগুলো।

লজ্জাও না ভয়ও না, কিন্তু এসব মিলেমিশে গেলে মনটা যেমন হয় তপেনের

সেরকম লাগছে। মাসিমার দুটো তিনটে চিঠি এসেছে এর মধ্যে, শরীর খারাপ অন্তত একবার দেখতে এসো, যাওয়া হয়নি।

একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ফিলটার উইলসের প্যাকেটটা তপেন সেণ্টার টেবলে ফেলে রাখে, নীল রঙের একটা জাপানী গ্যাস লাইটার জ্বালে। এবং আড়চোখে বিভুকে লক্ষ্য করে তার মনে পড়ে যায় কিছুদিন আগে বিভু বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে গিয়েছিল। এতক্ষণে যেন একটা বলার মত যুতসই প্রসঙ্গ খুঁজে পায় তপেন। গম্ভীর মুখে ধোঁয়া ছেড়ে বলে—'তুই নাকি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলি বিভু?'

বিভু একটুও অপ্রতিভ হয় না। বরং মৃদু হাসে, বলে—'হাঁ। জানো না, প্রায় মাসখানেক উধাও হয়ে গেছলাম?'

তপেন হাসে না—মুখে আরো বেশী অভিভাবকত্ব আরোপ করে বলে—'ভাল করিসনি। মাসি মেশোর বয়স হয়েছে। কীরকম চিন্তাভাবনা করে ওরা বলত? মেশো একদিন ভোরবেলায় এসে হাজির, চোখমুখ পাগলের মত, দেখেই বোঝা যায়, রাতে ঘুময়নি। দরজা খুলেছিলাম আমিই—প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, বিভু কী এসেছে তোমাদের এখানে?'

'ওসব স্রেফ শো তপুদা, আমি মরে গেলেও বাবার কিছু এসে যায় না।' কীরকম সহজ ভঙ্গিতে বলল বিভু। তপেন একটু থ হয়ে থাকে।

তবু এবারে তপেনকে হাসতেই হয়—'কী বলছিস বিভু, যা তা। মেশোমশাইকে যদি তুই দেখতিস সেদিন। আমি অনেক বোঝালাম, কোথায় আর যাবে? হয়তো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কোথাও গিয়ে আটকে পড়েছে—'

বিভু প্রতিবাদ করে—'বন্ধুবান্ধব না। একলাই চলে গেছলাম। বেনারস টেনারস খুব ঘুরলাম—'

'টাকা পেলি কোথায় এত?'—কুটিল ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছাড়ে তপেন।

'টাকা কিসের।'—ঠোঁট মুচড়ে হাসে বিভু—'স্রেফ উইদাউট টিকিটে চালিয়ে দিলাম। গোড়াতে টিউশনির কয়েকটা টাকা ছিল হাতে—পরে ম্যানেজ করে নিয়েছি।'

কিছুতেই বিভুকে লজ্জিত করা যাচ্ছে না; তপেন ছাই ঝেড়ে বলে—'যাবে ভাল কথা, বলে গেলেই পারতিস।'

'বলব? কাকে?'

কালীর মা এসময় দু'প্লেট চিড়ের পোলাও আর পটে চা নিয়ে আসে।

তপেন একটা প্লেট এগিয়ে দিয়ে বলে—নে খা।

প্লেট হাতে নিয়ে বিভু বলে—হঠাৎ মাথায় এল চলে যাব, কোথায় যাব, কীভাবে যাব কিছু ভাবিনি। দুম করে হাওড়া স্টেশনে চলে গেলাম। কাউকে বলার কথা মনে হয়নি। হাসছ কেন তপুদা? বাবা মা বল, ভাইবোন বল, আমার জন্ম কারো কিছু এসে যায় না। ধরতে গেলে বাড়িতে তো আমি জোর করে আছি। বলে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

ছোট অবুঝ ছেলের কথায় যেমন হাসতে হয় তেমনি করে তপেন হাসে নিঃশব্দে। চিড়ের পোলাও চিবুতে চিবুতে অর্থপূর্ণ চোখে শুধু তাকিয়ে থাকে বিভুর কঠিন মুখের দিকে। কোন কথা বলে না।

বিভু বলে—'সত্যি কথা বলো তপুদা? আমি যে কদিন ছিলাম না তাতে মা বাবা খুশীই হয়েছে। কেন জানো? আমি দুবেলা যা খাই—ও কদিন তো তা বেঁচে গেছে।'

শব্দ করে হাসতে গিয়ে তপেনের শ্বাসনালীতে আচমকা চিড়ে আটকে যায়। বিষম খেয়ে তার চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। দু'কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে।

বিভু নির্বিকার পোলাও খেয়ে যায়। একটুও উদ্বেগ বা সহানুভূতি প্রকাশ করে না। বলে.না—কী হল তপুদা, একটু জল খেয়ে নাও।

তপেন জল খায়, গলা ঝেড়ে বলে—'বিভু, আজকাল তুই খুব কড়া কড়া কথা বলিস, তাই না?'

'তপেনের মতই শব্দ করে হাসে বিভু, বিষম খায় না। বলে—আমার চব্বিশ বছর চলছে তপুদা একেবারে তো ছোট্ট খোকাটি নেই এখন। আমি একটা কথা খুব ভালভাবে বুঝে গেছি—আমরা কেউ সত্যি কথা সহ্য করতে পারি না। মিথ্যে হলেও মিষ্টি কথা ভালবাসি।'

বিভুর মুখ দেখে মনে হয় ও যেন আরো অনেক সত্যি কথা জানে। এবং বলবে। ওর মুখের হাতের হাড়গুলো যেন চামড়া ফুঁড়ে উঠে ওর ভেতরের সত্য কাঠামোটা দেখাচ্ছে। হালকা একটা বুশ সার্টের আবরণ যেন ছলনামাত্র। তাতে ওর কোটরাগত চোখ—তার নীচে গাঢ় কালি আকামনো খোঁচা খোঁচা দাড়ি আতেলা চুলের রুক্ষতা একটুও কমছে না। এখন ওর মুখ দেখে—কিছুতেই ওর ছেলেবেলাকার শান্ত সুকুমার মুখশ্রী

মনে আনা যায় না। কোথাও ছিটেফোঁটা লাবণ্য নেই। তবুও তপেন একটু চেষ্টা করে, বালি খুঁড়েও তো অনেক সময় কোন কোন শুকনো নদীতে জল পাওয়া যায় ; তপেন বলে—'আর সবার কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু মাসিমা তোকে কতটা ভালবাসে সেটা আমি জানি বিভু।

পাতাঝরা মরা গাছের ওপরে হাওয়া ঝাপিয়ে পড়লে যেমন শব্দ হয় তেমনি শব্দে বিভু হাসে। তপেন সোজা হয়ে বসে বলে—তুই সত্যি করে বলতো বিভু, তুই তোর মাকে ভালবাসিস না ? লুকোবি না ?'

বিভু নিস্তরঙ্গ রুক্ষ মুখে বলে—'না।'

'তোর মনে আছে বিভু আমার যখন ফিফথ ইয়ার, একদিন রাতে ভীষণ ব্যথায় মাসিমার কেমন দম আটকে আসছিল, তুই কান্নাকাটি করেছিলি ? আরো বলবো ?'

মরা গাছে কুড়োলের কোপ পড়লে শুকনো ডালপালা যেমন করে কেঁপে ওঠে তার চেয়েও জোরে শরীর মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করে বিভু—'ওসব স্রেফ ছেলেমানুষি। ছেলেবেলাকার কথা ছেড়ে দাও তপুদা। তখনো আমি বুঝতে শিখিনি, কাউকে ঠিকমত চিনিনি। এখন সব শালাকে চিনে গেছি।'

শালা কথাটা এতটুকু বেমানান লাগে না ওর মুখে। কিন্তু বিভু তাকেও চিনেছে বলেও কী ইঙ্গিত করছে ? শুধু রাস্তাঘাটের ঝামেলা বলে নয়, গেলেই মাসিমা যে টাকা চাইবে এই ভয়ে যে তপেন ওদের বাড়ি যাওয়া কমিয়ে দিয়েছে, তাই বলতে চাইছে বিভু ? ঢেরা পিটিয়ে কোণঠাসা-করে-আনা-শিকারের মত নিজেকে মনে হয় তপেনের। রাইফেল হাতে নিষ্ঠুর শিকারীর মত চোখে তাকিয়ে আছে বিভু।

তপেন চায়ে চুমুক দিয়ে ফের একটা সিগারেট ধরায়। হাল্কা ধোঁয়ার আড়ালে নিজেকে অদৃশ্য করতে চায়।

সহসা বিভুর সেণ্টার টেবলের ওপর ঝুঁকে পড়ে, চকচকে চোখে তাকিয়ে বলে—'তপুদা, তোমার পারমিশান নিয়ে যদি একটা সিগারেট খাই তবে কি তুমি খুব মাইণ্ড করবে ?'—বলেই প্যাকেটের দিকে হাত বাড়ায় বিভু।

মাথার ভেতরে রক্ত ঝিনঝিনিয়ে ওঠে, তপেন দুহাত তুলে প্রবল সায় দিয়ে বলে—'না না। নে না। মাইণ্ড করব কেন ?' বিভু যখন লাইটার জ্বালে তপেনের বুকের মধ্যিখানটায় খচ করে একটা ছ্যাকা লাগে।

আয়েসে ধোঁয়া ছেড়ে বিভু বলে—'আমি আর কতটা কড়া কথা বললাম তপুদা, মা বাবাতে আজকাল যা ঝগড়াঝাঁটি হয়, তুমি যদি শোনো তো হার্টফেল করবে।'

প্রতিটি কথা নিঃশব্দ বুলেটের মত বিদ্ধ করে তপেনকে। দুঃসহ বোধহয়। পর্ণার সঙ্গে সিনেমা চলে যাওয়াই ভাল ছিল মনে হয়। বিভুর সঙ্গে ছ'মাস আগেও যখন দেখা হয়েছিল রাস্তায় তাকে দেখে সিগারেট লুকিয়েছিল। বলেছিল—'বাড়ির বড়ছেলে, ত্যাখ তপুদা বাবা খেটে খেটে মরছে আর আমি কিছুই করতে পারছি না। কীরকম লাগে বলতো?'

তপেন আত্মসচেতন গম্ভীর মুখে বলে—'বিভু, তুই একটা চাকরি-বাকরি পেলেই দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। মেশোরও তো বয়েস হয়েছে। একা একা কী পারে?'

'চাকরি একটা পেতে পারি এই আশা করে বলেই তো এখনো আমাকে সহ্য করে বাড়িতে। পালিয়ে গেলে বাবা আসে সাতসকালে তোমার বাড়িতে খুঁজতে। কিন্তু তপুদা আর আশাটাশা করেও যে কোন লাভ নেই একথাটা ওরা বুঝতে পারছে না।'

তপেন ধমকের মত করে বলে—'কেন তুই কি আশা ছেড়ে দিয়েছিস নাকি?'

'দিইনি!' খুব অবাক মুখে তাকায় বিভু—'বি-এর ডিগ্রির কাগজটা মার ঠাকুরের আসনে রেখে মাকে রোজ পুজো করতে বলেছি।'

তপেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—'তোর যে পি৩র আর্টস, সায়েন্স বা কর্মাসও যদি হত।'

'আমার অনেক বন্ধু আছে' তপুদা, সায়েন্স, কমার্সে খুব ভাল রেজাল্ট, তুমি দেবে? তাদের একজনকে ও একটা চাকরি করে দেবে, সত্যি বলতো তপুদা?—বিভু এমন করে হাসে যেন আগুন হল্কা ছোটে। সব মুখোস-টুখোস পুড়ে-টুড়ে ছাই হয়ে সব কেমন বে-আব্রু হয়ে যায়। আর সারা মুখ জ্বলে যায়। চাপা উত্তেজনায় ভেতরে কেঁপে ওঠে তপেন। তবু শান্ত গলায় তপেন বলে—তুই কবিতা লিখতিস না বিভু। 'কাগজে-টাগজে কিছুদিন যেন দেখেছি—'

'না লিখে উপায় কী বলো? বেকাররা তো ঐ একটা কাজই পারে। বলতে বলতে বিভু বাঁহাতে ডানলোপিলোর কুশন চটকায় আর নিবিড় চোখে

ঘরের প্রতিটি আসবাব লক্ষ্য করে। তার প্রখর দৃষ্টি কার্পেট চাইনিজ ভাসের ওপরে মানিপ্ল্যান্ট, টকউডের ক্যাবিনেটের ওপরে রেকর্ড প্লেয়ার আর পেল-সেটের তলায় ব্রোকেডের পর্দার ওপর দিয়ে পিছলে পিছলে যায়, ফ্লুরেসেন্ট ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোয় হাল্কা লাইলাক রঙের ডিসটেম্পারড দেয়ালের সিলিং-এর সৌন্দর্য যেন শুষে নেয় বিভু, তারপর আস্তে করে বলে—'তোমার এই ঘরে বসে কবিতা লেখা যায় মনে হচ্ছে তপুদা।'

তপেন এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল। বিভুর চোখ যখন তার ঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরছিল তখনই তপেনের চোখে ভাসছিল কয়েকটা নোনাধরা দেয়াল—বৃষ্টির জলে ড্যাম্পধরা পলেস্তরায় আকীর্ণ ঘর, চাপা অন্ধকারে ভ্যাপসা—সে ঘরে বসে সে পাঁচ বছর পড়াশোনা করেছে, পেয়ারা বাগানের সেই ঘরে এখন একরাত কাটালে বোধ হয় ঘুমও হবে না তার।

ফ্যান চলছে তবু গুমোট লাগে, তপেন গিয়ে জানলার পর্দা সরিয়ে দেয়। দূর থেকেই বলে—'বিভু আজকাল শুনতে পাই ব্যাঙ্ক সব বেকার ছেলেদের লোন দিচ্ছে বিজনেসের জন্য, সে সবের জন্যে চেষ্টা করা কি কবিতা লেখার থেকে বেশী কষ্টকর?

তপুদা, তুমি বোধহয় খুব খবরের কাগজ পড় আর রেডিও শোনো, তাই না? ও দুটো কাজ করলে খুব নিশ্চিন্তে থাকা যায়।'

'আসলে আমরা বাঙালীরা জানিস বিভু, শুধু কথা বলতে ভালবাসি। নিজের পায়ে দাঁড়াবার বা কাজ করবার কষ্ট করতে—'

বিভু হাত তোলে ঠিক গাড়ি থামানোর ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে বলে—'তুমি জীবনে খুব সাকসেসফুল তপুদা, এসটাব্লিশড, এসব কথা তোমার মুখে মানায়। আমি গত দু'-তিন বছরে যত লোকের কাছে গেছি, ঠিক এই কথাগুলো শুনেছি। ভাষাটা পর্যন্ত হুবহু এক। আমি খবরের কাগজের হকারী থেকে ফুটপাতে খেলনা বিক্রি সব করেছি—তুমি জানো বোধহয়?'

তপেন ভাবে কাউকে 'গেট আউট' বা 'বেরিয়ে যাও' বলা কত কঠিন। কিন্তু বিভুকে আর এক মুহূর্তও সহ্য হচ্ছে না। অথচ নিজে থেকে যাবার নাম নেই। শুধু শুধু কতকগুলো কথা বলবার জন্যই কি বিভু আজ এসেছে? অথচ আজকের সন্ধ্যাটা তার সম্পূর্ণ অন্যরকমভাবে কাটবার কথা ছিল। এতক্ষণ অন্ধকার হলে পর্ণার পাশে বসে বসে আনসেনসরড ফ্লিম দেখত এবং কোন এক উত্তেজিত আনন্দের মুহূর্তেই পর্ণাকে ফিস্ ফিস্ করে বলত—

'জানো পর্ণা, কাল থেকে অফিসের সবচেয়ে উঁচু চেয়ারটায় আমি বসব।' তখন হয়তো পর্ণা বরাবরের মত বলত—এবার তাহলে স্কুটারটা কিনে ফেল।'

রুষ্ট রেখা কণ্টকিত মুখে তপেন বলে—থাকগে, মাসিমা কেমন আছে বলতো? খোঁজটোজ কিছু রাখিস? লো প্রেসারটা কি এখনো ট্রাবল দিচ্ছে?

অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে বিভু তাকিয়ে তপেনকে দেখে তারপর হেসে বলে—'বাইরে থেকে দেখলে তো খারাপই বলতে হয়, শুকনো প্যাকাটি চেহারা। সব সময় শুয়েই থাকে আজকাল। মাথা ঘোরে নাকি। অবশ্য ঝগড়ার সময় কিন্তু তা মনে হয় না।'—বিভু দমকাহাসি হাসে। ক্ষয়ে-আসা জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনে আরেকটা সিগারেট ধরায় বিভু, তারপর ধোঁয়ার ঝাঁজে চোখ ছোট করে বলে—'আমার কিন্তু মনে হয় তপুদা, মা যতটা ভাণ করে আসলে ততটা অসুস্থ না।'

'স্কাউণ্ড্রেল'—বলে চীৎকার করতে ইচ্ছে হয় তপেনের, কিন্তু তেমন জোর পায় না গলায়। মনে হয় তার সামনে যে বসে আছে সে বিভু নয়, যেন সে নিজেই। কারণ মাসিকে তপেন দেখেছে তখন যখন তারও মনটা ছিল আবেগ-প্রবণ আশা আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত, স্পর্শকাতর। কাকভোর থেকে রাত অবধি সংসার রান্নাঘর নিয়ে কাটত মাসির। ছেলেমেয়েদের নাওয়াখাওয়ার কোন ত্রুটি ঘটত না, তারপর পড়ে থাকা ছিটেফোঁটায় ক্ষুন্নিবৃত্তি হত মাসিক নিজের।

তপেন বলত—'এত কষ্ট কর কেন বলতো তুমি? ঠিক ঠিক মত খাও-ও না। কেন? খুব অন্যায়।'

আমাদেব কোন অন্যায় নেই। এই ছেলেমেয়েগুলো মানুষ হবে, ওরা পায়ে দাঁড়াবে তোরা সব দাঁড়াবি এক এক করে, তখন জানিস তপু, আমার সুখের দিন, বিশ্রাম করব, আরাম করব তখন পায়ের ওপর পা ফেলে।' অনেক কিছুই ভুলে যায় মানুষ, তপেনও ভোলে; সময় সব ভুলিয়ে দিয়েছে যেন কেমন করে ধীরে ধীরে অজান্তে। তবু মনের তলে কোথাও কুভাবনার মত আলগোছে পড়ে থাকে দু একটা কথা। চোরা-জানলা খোলার মতই হঠাৎ খুলে যায় দু একটা জানলা। তখন দমকা হাওয়ার মতই ঝাপটা লাগে মুহূর্তের ফের সব যেমনকে তেমন নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ।

ওষুধ টষুধ খায় তো ঠিক মত?'—তপেনের কণ্ঠস্বরে বে যেন তার ভেতর থেকে কথা বলে ওঠে অন্যমনস্কতায়।

ওষুধের মধ্যে তো ভিটামিন আর ক্যালসিয়াম; তাছাড়া দুধ মাছ ডিম মাংস সব বড়লোকী খাবারের লিষ্টি দিয়েছে ডাক্তার। ঝগড়ার সময় এসব কথা জানতে পারি আমি।'—বিভু কার্পেটে পা ঘষে। তপেন এসে ফের সোফায় হেলান দিয়ে বসে, চোখ বুঁজে আত্মগত কণ্ঠে বলে—'কতদিন যাব যাব ভাবি। কিন্তু বাস্ এসে অফিসের প্রেসার, তারপর যা রাস্তা-ঘাটের অবস্থা'—

বিভু সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলে—খবরদার তুমি যেও টেও না তপুদা।'

অবাক মুখে তপেন বলে—'কেন!'

বিভু হাসে, বলে—'গেলেই, নির্ঘাৎ তোমার কাছে টাকা চাইবে মা।'

নিরেট কালো একটা ভাল্লুকের মুখের মত দেখায় বিভুর মুখ, সাদা দাঁত চকচক করছে। যেন থু থু ছিটিয়ে দিয়েছে বিভু মুখের ওপর, হাতের তালুতে এমন করে মুখ মোছে তপেন হাতের কম্পন টের পায়।

বিভু মুখটাকে আরেকটু এগিয়ে এনে বলে—'আর আমার চাকরী করে দেবার জন্যও ঘ্যানর, ঘ্যানর করবে। তাই না?'

ঝিঁ ঝিঁ পোকার নিরবচ্ছিন্ন শব্দ মাথার ভেতরে, তপেন যেন আর কিছু শুনতে পায় না। শুধু মাসিমার হাড় সর্বস্ব প্যাকাটি শরীরটা, তার চোখের ঘনীভূত আতঙ্কময় বিপদ, আর ছেলের একটা চাকরির জন্য তার কাছে কৃপাপ্রার্থীর ব্যাকুল মিনতি এসব ঘনকুয়াসার ভেতরে আবছায়ার মত কেঁপে ওঠে চোখের সামনে। মিন মিন করে তপেন বলে—'মাসিমা যদি আমার কাছে টাকা চায়ই তাতে অন্যায়টা কী? মাসিমার ত হক আছে। তোদের বাড়িতে থেকে যদি আমি পড়াশুনা করতে না পেতাম—'

'সেসব কথা মনে রেখ না তপুদা, ওসব মনে রাখতে নেই। তুমি এখন হ্যাপিম্যান, এস্টাব্লিশড্ পারসন এবং সুখের সংসার তোমার।' বিভু যেন গভীর সমবেদনা আর আন্তরিকতার সঙ্গে বলে কথাগুলো।

তপেনের মনে হয় হিংস্র থাবার আঘাত পড়ল তার গালে, শাণিত নখে একতাল মাংস উঠে গেল। প্রচণ্ড একটা আসুরিক ঘুষি মারতে ইচ্ছা হয় বিভুর নাকের ডগায়। কিন্তু সে এত দুর্বল করে কেন? সে ত অসুস্থ নয়।

গোড়াতে সে নিয়মিতই সাহায্য করত, মাসে একবার না হলে কিছুদিন

অন্তর সে মাসি বা মেশোর হাতে কিছু গুঁজে দিয়েছে। কিন্তু যেপাত্র ছিদ্রময় তাতে জল ঢেলে পূর্ণ করা যায় না, শুধুই অপচয় মনে হয়। তাছাড়া ছেলে দীপকে হাজারিবাগ কনভেণ্টে দিয়েছে তপেন গতবছরে। আর জলপাইগুড়িতে মা রয়েছে ছোট ভাইয়ের সংসারে। মাসির বাড়ি আর কী নিয়মিত যওয়া চলে? বিক্ষতগাল থেকে যেন টুপটুপ করে রক্ত ঝরছে, বুকের ভেতরে।

আং' করে তপেন বলে—'বিভু, তুই মানুষকে অপমান করে আজকাল খুব মজা পা'স তাই না?'

বিভু বলে—'মানুষ আর আজকাল কিছুতেই অপমান বোধ করে না তপুদা।' বলতে বলতে আড়মোড়া ভাঙে বিভু, ক্লান্তি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাই তোলে। 'আজ তাহলে উঠি তপুদা।'—বলেই উঠে পড়ে বিভু।

আর তখনই সব আলো ঝপ করে নিভে যায়। লোড শেডিং। কালো ভাল্লুকের মত বিভুর শরীরটা অন্ধকারে নড়ে ওঠে, যেন একটু বড় হয়। কেমন গা ছম ছম করে তপেনের। ছেলেবেলায় বিভুকে পড়াত তপেন, মাসিমা বলতে—'ওর ভার রইল তোর ওপর, মানুষ করে দিবি।' লেখাপড়ায় খুব খারাপ ছিল না বিভু। শাসনটাসন মানত, মাণ্যিগণ্যি করত।

'যা বাব্বা, লোড শেডিং।' বলে বিভু দরজার দিকে এগিয়ে যায়—'চলি তপুদা।'

তপেন মুখে কিছু বলে না, কিন্তু মনে মনে বলে—'যা, এক্ষুনি চলে যা, কোনদিন আর যেন তোর মুখ না দেখি।'

কিন্তু যায় না বিভু, অন্ধকারেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তপেনের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, কেমন গা শিউরোয়।

বিভু নিঃশব্দ ভেঙে দিয়ে বলে—"একটা কথা বলব তপুদা? কুড়িটা টাকা দেবে? অবশ্য যদি তোমার অসুবিধা না হয়।" দু'পা বুঝি এগিয়ে আসে বিভু।

তপেন নিশ্চল বসে থাকে। তার বুক, বুকের ভেতরে ঝুলে পড়ে, তবু শক্ত হয়ে বলে—'কী করবি টাকা দিয়ে? আবার পালাবি?'

'পালানোর জন্ত আমার টাকা লাগে না তপুদা। পালাবই বা কেন? আর পালাব না ঠিক করছি।'

'তবে কী মাসিমা চেয়ে পাঠিয়েছে ?' সন্দেহাকুল চোখ অন্ধকারে তীব্র করে তপেন।

'মা জানতে পারলে নির্ঘাৎ ছিনিয়ে নেবে এ টাকা। কিন্তু না তপুদা, মা ক্যা না, আমি নিজের জন্যেই চাইছি'—গলা খাকারি দিয়ে পরিষ্কার গলায় তপেন বলে— 'কী করবি টাকা দিয়ে ?'

'তাও বলতে হবে ? কিছু বাজে অভ্যাস হয়ে গেছে, তপুদা, নেশাও বলতে পার। ডিটেল্‌স শুনে লাভ নেই।'

বিভু আরেকটু কাছে যেন এগিয়ে আসছে। নিথর হয়ে বসে থাকে তপেন। পর্ণা এখন অন্ধকারে আনসেনসরড্ ফিল্ম দেখছে।

দু'পা ফাঁক করে লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে বিভু বলে—'অবশ্য আমার পকেটে বোমা পিস্তল বা ছুরি নেই, তুমি ইচ্ছা করলে টাকাটা নাও দিতে পার তপুদা।'

পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কেঁপে উঠে তপেনের। সন্দেহে চোখ ছোট হয়ে আসে, বিভু কি সত্যি কথা বলছে নাকি ওর পকেটে পিস্তল কিংবা ছুরিতে ও এখন হাত রেখেছে ?

উঠে দাঁড়ায় তপেন, বলে—'তোকে কুড়িটা টাকা দেব তার জন্যে ছুরি পিস্তলের দরকার আছে বিভু ?'

বিভু বোধ হয় অন্ধকারে হাসে কিংবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তেমনি কোন আওয়াজ ওঠে।

অন্ধকারের ভেতরের ঘরে ঢুকে যায় তপেন। সামনে পছনে ডাইনে বাঁয়ে অন্ধকার প্রহরীর মতো খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে। স্টিলের আলমারীতে অন্তত কিছু গয়না তো আছেই পর্ণার, তাছাড়া রেকর্ড প্লেয়ার, রেডিও, ফ্রিজ—ফ্রিজের মোটরটা সব কিছু কেমন মহা মূল্যবান মনে হয়। আর বুক ঢিপ ঢিপ করে। বিভু ঠিক ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে তো ?

ঘুরে এসে অন্ধকারে তপেন বিভুর অন্ধকার হাতে দু'টো অন্ধকার দশ টাকার নোট দেয়।

'থ্যাঙ্কস্'—বিভুরই কৃতজ্ঞ কণ্ঠস্বর। সে আরো বলে—'আমার নিজের জন্যেই নিলাম তপুদা, কিন্তু তোমা ক কথা দিাচ্ছ, এর থেকে দু' একটা টাকা বাঁচিয়ে মার জন্যে ডিম আর কলা নিয়ে যাব। প্রমিস। চলি।'

সাবধানে দাঁড়িয়ে থাকে তপেন, তবু অসাবধানে তার গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে—'এরকম করে কতদিন চলবে ?'

বিতুর অন্ধকার শরীর ঘুরে দাঁড়ায়, হাসির শব্দের সঙ্গে বলে—'এরকম চলাটাও খুব খারাপ না তপুদা। শুনতে পাই হাজার হাজার কোটি টাকা নাকি ছড়িয়ে আছে, হাতে বোমা পিস্তল থাকলে তার কিছু আসে। অবশ্য নিরস্ত্র হাতেও আসে, এই যেমন তুমি দিলে। আচ্ছা চলি, মাকে গিয়ে বলব তোমরা ভালই আছ। চীৎকার করে তপেনের বলতে ইচ্ছা হয়—'মাসিমাকে আর তোর কিছু বলতে হবে না, অত উপকারে আর কাজ নেই।' কিন্তু শুকনো গলায় কোন কথা ফোটে না, শুধু চোখে পড়ে গাঢ়তর অন্ধকার গায়ে মেখে ঘন অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে বিতু ক্রমাগত নীচে নেমে যাচ্ছে।

আর সহসা দমকা হাওয়ায় এ সময় কুভাবনার চোরা একটা জানলা খুলে যায়—মাসিমার কথাটা মনে পড়ে—'ছেলেমেয়েগুলো মানুষ হবে, তোরা একে একে নিজের পায়ে দাঁড়াবি তপু তখন আমার সুখের দিন, আমি পায়ে পা তুলে আরাম করব তখন।'

ঠিক এই ভাবনার মুখের ওপরে সবলে সন্ত্রাসে প্রবল দুহাতে দুম্ করে দরজা বন্ধ করে তপেন। তার সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে উত্তেজনায়। কোন দরজা জানালা আর খোলা রাখা চলবে না। পর্দা এলে খুব সাবধান করে দিতে হবে। দিনকাল খুব খারাপ।

শেখর বসু



ছবি থেকে সুন্দরী

সাপ্তাহিক পুরু মলাটটা ওলটাতেই ভেতরের পাতাগুলো পাখার জোর হাওয়ায় ছটফট করে উঠল। আমি দু'হাত দিয়ে চেপে পত্রিকার ঠিক মাঝের অংশটা মেলে ধরলাম, আর তক্ষুনি মেয়েটা আমার চোখে চোখ রেখে হেসে ফেলল। আমি চমকে উঠলাম, বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। তারপর, বারবার, বারবার ওর চোখের দিকে তাকিয়েও আমার অবাক ভাব একটুও কাটল না। ছবির মেয়ে এত জ্যান্ত হয় কী করে!

খোলা জানলা দিয়ে ভোর ঢুকে গেছে ঘরের মধ্যে, জানলার বাইরে ভোরের পেয়ারা গাছের ভেজা-ভেজা ডাল-পাতা। পাশের বাড়িতে ভোরের চাপা শব্দ। এই সময়টা আমি তন্দ্রার ভেতর দিয়ে দেখি, ধরতে গেলে চোখ বুজেই চা শেষ করি, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ি। বিছানা ছেড়ে উঠি যখন তখন চারিদিকে খটখটে সকাল। আজ চা শেষ করে পাশের টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে পত্রিকাটা টেনে নিলাম, তারপরেই ছবির জ্যান্ত মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হল।

আমার চোখে আর একটুও ঘুম নেই। চোখ টানটান করে রঙিন ছবির মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছি। কালো গভীর চোখ রহস্যে ভরা। কাউকে বোকা বানাতে পারলে সুন্দরীদের চোখের কোণে যেমন হাসি ফুটে ওঠে ঠিক তেমন হাসি মাঝেমধ্যে ফুটে উঠছিল মেয়েটির চোখে। কিন্তু কী করে এটা সম্ভব! আমার সারা শরীরে অদ্ভুত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। পত্রিকাটি হাতে নিয়েই উঠে বসলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির জোড়া ঠোঁট একটুখানি খুলেই বন্ধ হয়ে গেল। মেয়েটি হাসল। ভোরের এই চমৎকার হাওয়ার মধ্যেও আমার হাতের তালু ঘেমে উঠল অল্প অল্প।

বিছানা থেকে নেমে পড়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করলাম কয়েকবার।

জানলার দু'টো শিক শক্ত করে চেপে ধরে বাইরের সব পরিচিত দৃশ্য দেখলাম। আমি জেগে আছি, পুরোপুরি জেগে আছি, আমার সারা শরীরের কোথাও ঘুমের চিহ্ন নেই, আমি ভুল দেখছি এমন ভাববার কোনো কারণ নেই। কিন্তু, ছবির মেয়েটা তার জোড়া ঠোঁট খুলল কী ভাবে? ওর টুকটুকে লাল ঠোঁটের নীচে থেকে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে এল কী করে?

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছবির মেয়েটিকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। চোখে সেই রহস্য, চোখের কোণে সেই হাসি, কিন্তু মেয়েটি আর ঠোঁঠ খুলে হাসল না। পাতলা টসটসে লাল ঠোট, এই ঠোটের দিকে তাকিয়ে থাকলে জিভে জ্বালা ধরে যায়। নিজের নিঃশ্বাস নিজের কাছেই গরম ঠেকে।

মেয়েটির গায়ের রঙ গোলাপী। দেখলেই বোঝা যায় ওর গায়ে তাপ বেশি, আর সারা গা অসম্ভব মসৃণ। লম্বা গলা, সামান্য নোযানো সুডৌল বুক। হঠাৎ মেয়েটির বুক কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখের দিকে তাকালাম, অবাক হয়ে দেখি ওর চোখে সকৌতুক চাপা ধমক। আমি দ্বিতীয়বার ওর বুকের দিকে চোখ রাখতে গিয়েও পারলাম না। বুক না, চোখ না, আমার দৃষ্টি এখন ওর কালো, কোঁকড়ানো ঠাসা চুলের দিকে। কয়েক টুকরো চুল উড়ে এসে স্থির হয়ে আছে ছোট কপালের ওপর। ঠিক এমন সময় পেয়ারা গাছের ডাল কাঁপিয়ে দমকা হাওয়া ছুটে এল ঘরের ভেতর, সঙ্গে সঙ্গে ওর কপালের টুকরো টুকরো চুলগুলো উড়ে গেল মাথার দিকে, মাথার চুলও ফুলে উঠল অনেকখানি।

ক্রমাগত অবাক হতে হতে এমন হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমার নতুন করে অবাক হওয়ার ক্ষমতা ধরতে গেলে ফুরিয়ে গিয়েছিল। কেমন যেন মনে হচ্ছিল এটাই তো স্বাভাবিক, জোর হাওয়া দিলে লম্বা চুল উড়বে না। আমি পায়ে পায়ে ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে চিরুনিটা তুলে নিলাম, কিন্তু তাকিয়ে দেখি মেয়েটির চুল যেমন ছিল ঠিক তেমন হয়ে গেছে আবার, টুকরো চুলগুলো ঠিক আগের মতো কপালের এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে।

মেয়েটির শরীরের আর কোথাও কোনোরকম পরিবর্তন চোখে পড়ল না, শুধু দু'চোখে আগের চেয়েও বেশি হাসি জড়ো হয়ে আছে। ওই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠলাম, সঙ্গে

সঙ্গে মেয়েটির দু'চোখের তারা আর পল্লব নেচে উঠে জমানো হাসি ঠিকরে পড়ল।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুমি কিসের বিজ্ঞাপন দিচ্ছ ?"

শুনে মেয়েটি যেন চোখ নামাল।

নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, সেন্টের বিজ্ঞাপন। এই সেন্ট গায়ে মাখলে অবসাদ, ক্লান্তি কাছে ঘেঁষতে পারবে না, আর প্রেমিকরা আঠার মতো গায়ে সেঁটে থাকবে।

আর একবার হেসে উঠে বললাম, "ঠিক একশবার ঠিক।" এই জন্যেই তোমাকে এরকম তাজা ফুলের মত দেখাচ্ছে। আর আমাকেই দেখো না, ভোরবেলায় সেই চোখ খোলার পর থেকে তোমার দিকে ঠায় তাকিয়ে আছি, অন্যদিকে চোখ ফেরাতে পারছি না। একেই বলে আঠার মতো সেঁটে থা[illegible]। কিন্তু, আমি কী তোমার প্রেমিক ?

প্রেমিক ছিলাম কিনা জানি না, কিন্তু এখন তো আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি, যাকে বলে রীতিমত প্রেম, বিশ্বাস করো,—বলতে বলতে আমি ওর হাতে হাত রাখলাম, আর তক্ষুনি ওর হাত থেকে আমার সারা শরীরে বিদ্যুৎ দৌড়ে গেল। জ্যান্ত সুন্দরী প্রেমিকাকে প্রথমবার স্পর্শ করার রোমাঞ্চ আমি অনুভব করলাম প্রবল ভাবে।

পেয়ারা গাছের পাতার ওপর পড়ে থাকা শিশির দেখতে দেখতে শুকিয়ে গেল, কিন্তু বহুক্ষণ পরেও আমার রোমাঞ্চ ঝিমিয়ে গেল না একটুও, সবকিছু অসম্ভব ভাল লাগতে লাগল।

মেয়েটি আমার হাতের কাছেই, অথচ সংযমী প্রেমিকের মতো দ্বিতীয়বার আমি ওর গায়ে হাত দিলাম না। আমাকে গভীর সুখের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে চারদিক থেকে খটখটে সকাল ভেসে উঠল একসময়।

এবার অফিস যাবার তোড়জোড় করতে হবে, কিন্তু কিছু করতে ইচ্ছে করছিল না। অথচ অভ্যাস এমনই যে লক্ষ্য করলাম, অন্যান্য দিনের মতো টুথব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে বাথরুমে ঢুকছি। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দাড়ি কামাবার ব্রাশ টেনে নিলাম, তারপর চান, তারপর জামাকাপড় পরে খাবার টেবিলে গিয়ে বসা। আর কোনো সন্দেহ নেই যে অফিস যাচ্ছি, অথচ আজ তো আমার অফিসে যেতে একেবারেই ইচ্ছে করছিল না।

অফিসে বেরুবার মুখে ঘরে ঢুকে ওই পত্রিকাটা আবার টেনে নিলাম।

ঠিক মাঝ বরাবর পত্রিকাটি খুলে ধরতে প্রথমেই চোখে পড়ল কুৎসিত একটা আধবুড়ো লোকের ছবি। লোকটার চুলগুলো শজারুর কাঁটার মতো উঠে আছে। চোখদুটো দেখলেই বোঝা যায় ঘোর বদমাইশ আর লম্পট ধরনের। পোকায় খাওয়া কালো-কালো দাঁত বার করে রেখেছে একগাদা। কী একটা দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপন ওই মাজন ব্যবহার না করলে নাকি সবার দাঁতের চেহারাই এইরকম হয়ে যেতে পারে। রাবিশ। বাঁ দিকের পাতায় এই লোকটার ছবি, সকালে চোখে পড়েনি, ডানদিকে রঙীন ওই সুন্দরী।

বইটা মুড়ে আমি সুন্দরীর চোখে চোখ রাখলাম। সুন্দরীর চোখের কোণে সকলের সেই কৌতুক নেই, তার বদলে কেমন যেন অনুযোগ।

"কেন, আমি কী করেছি? আমার ওপর রাগ করেছ?" প্রশ্ন শুনে ওর চোখে অভিমানের চিহ্ন ফুটে উঠল।

কারণটা ধরে ফেলে হেসে উঠে বললাম, "অফিস যাচ্ছি, সেইজন্যে? কী করব বলো, পরের চাকরি। ঠিক আছে, যত তাড়াতাড়ি পারি বাড়ি ফিরে আসব।" আমি ছবির দিকে হাত নেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

পথে পা দিয়েই মনে হল, সবাই সবকিছু কি ভাল। রোদ্দুর ভাল, ছায়া ভাল, প্রাইভেট বাস, পাবলিক বাস, মিনি বাস সব ভাল। একটু সকাল সকাল অফিসে বেরোই, সব বাসেই এখন আমি জায়গা পাব, কিন্তু কেন জানি না দুম করে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। ফাঁকা রাস্তায় ট্যাক্সি ছুটছিল ট্যাক্সির মতো, অথচ আমি চাইছিলাম ট্যাক্সিটা উড়ে যাক, আসলে আমারই উড়তে ইচ্ছে করছিল। ছবির ওই সুন্দরীকে ছোঁবার আনন্দ এখনও আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে।

অফিসে কিছুক্ষণ কাজ করার পরে আমার যুক্তি, বুদ্ধি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। ছবি ছবিই, না হয় মেয়েটি দারুণ সুন্দরী, না হয় ফোটোগ্রাফি অসাধারণ, কিন্তু তাই বলে একটা ছবিকে তখন থেকে জ্যান্ত ভাবার কোনো মানে হয় না। আসলে এটা হল পরমাসুন্দরী একটি মেয়েকে হাত করার গোপন আকাঙ্ক্ষা। নির্ঘাত ভোর রাতের দিকে ওই ধরণের একটা স্বপ্ন দেখছিলাম, সেই স্বপ্নের রেশের সঙ্গে ছবিটা তালগোল পাকিয়ে গিয়ে এই অবস্থা।

নিজের ব্যাখ্যাটা নিজেরই বেশ মনে ধরে গেল। হ্যাঁ, তাই হবে। কিন্তু কিছু কিছু দুর্লভ স্বপ্ন থাকে যেগুলো স্বপ্ন জেনেও উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে

না। আমার এখন সেই অবস্থা। আমি স্বপ্নটাকে স্বাদ-গন্ধ সমেত ধরে রাখার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলাম।

অফিস ছুটির পরেও স্বপ্ন ঝাপসা হল না। স্বপ্নটা সঙ্গে নিয়েই ঊর্মির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

কিছুক্ষণ হাঁটার পরে চৌরঙ্গী এসে গেল। সন্ধ্যের চৌরঙ্গীতে পথের দুদিক দিয়ে সুন্দরীদের স্রোত বয়ে যায়। স্রোত বলেই বোধ হয় কোনো একজন সুন্দরী মনের ওপর ঠিক দাগ ফেলতে পারে না। ভাল করে কাউকে দেখতে না দেখতেই তার পেছনে দেখার মতো আর একজন এসে যায়, তার একটু দূরেই আবার আর একজন। এই স্রোতে আমার চোখ ভাসছিল, হঠাৎ মনে হল, আরে, ছবির ওই মেয়েটিকে যদি এদের মধ্যে দেখা যায়! দেখতে পাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব?

না, অসম্ভব হবে কেন। মেয়েটি হয়ত মডেলের কাজ করে, হয়ত এখনই এই পথ দিয়ে কোনো বিজ্ঞাপন কোমপানির অফিসে যাচ্ছে, কিংবা সেখান থেকে ফিরছে। আমি ব্যগ্র হয়ে আমার দুপাশের ভিড়ে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে হাঁটতে লাগলাম।

কিন্তু, কই, নেই তো!

যত সময় যাচ্ছিল ততই আমি কীরকম যেন জেদী আর আশাবাদী হয়ে উঠেছিলাম। এক্ষুনি তাকে দেখতে পাব, ঠিক ওই ছবির পোশাকে! না না ছবির পোশাক হবে কেন, ওই পোশাক ও হয়ত সেই বিজ্ঞাপনের জন্যে পরেছিল। ও আজকে আর স্কার্ট পরবে না, তার বদলে শাড়ি পরে আসবে আর শাড়ি রং হবে আকাশ-নীল। শাড়ির রং মেলে কি না জানবার জন্য আমি অধীর হয়ে উঠলাম, ও যে আসবেই—এ নিয়ে আমার এখন আর কোনো সংশয় নেই।

কিন্তু ও যদি শাড়ি পরে আসে, আর চুল বাঁধে অন্য ধাঁচে, আমি এক পলক দেখেই ওকে চিনতে পারব কি! কেন পারব না, একশবার পারব, ওর শরীরের সব কিছু আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। না দেখেও চিনতে পারব, যদি ওর হাতে আমার হাত ঠেকে যায়! এ-কথা ভাবতেই সকালের সেই শিরশিরানি আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত, এমনভাবে, যেন এই মাত্র ওকে আমি স্পর্শ করেছি, অনুভব করলাম আমার নিঃশ্বাস গরম হয়ে উঠেছে।

ঠিক এমন সময় নরম, উষ্ণ একটা হাত আমার হাত চেপে ধরল। ভীষণ

চমকে তাকাবার পরেও আমি যেন কিছুই বুঝতে পারলাম না, সব কিছু কেমন গুলিয়ে গেছে। নিজেকে ঠিকঠাক করতে কয়েক মুহূর্ত লেগে গেল।

ঊর্মি হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, "কী লোকরে বাবা, কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি, এখন আবার না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছে।"

আমি বলার মতো কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে হাসলাম, এমন হাসি যার কোনো মানে হয় না। ঊর্মি মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। ওর রাগ হয়েছে, রাগ হলে ও আমার চোখে চোখ রাখে না। এখন আমাকে র রাগ ভাঙাতে হবে, কীভাবে রাগ ভাঙাতে হবে জানি। তাই করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ মনে হল, ছবির মেয়েটা যদি এইভাবে মুখ ঘুরিয়ে রাখত তা হলে নির্ঘাত তার গ্রীবাভঙ্গি দেখে দেখে আমার আশ মিটত না। শুধু গ্রীবাই নয়, ছবির ওই সুন্দরীর সব কিছুর সঙ্গে আমি ঊর্মির সব কিছুর তুলনা করতে লাগলাম। সব কিছুতেই ছবির সুন্দরী জিতে যাচ্ছিল দারুণভাবে।

ঊর্মি এখনও মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে, ওর এ-ভাবে দাঁড়াবার মধ্যে কোথায় যেন একটু অহংকার আছে, কিন্তু ও একটুও টের পায়নি যে, ছবির ওই সুন্দরীর কাছে ও কী ভয়ংকরভাবে হেরে গেছে। ওকে এ-ভাবে হারতে দেখে ওর ওপর আমার কেমন যেন মায়া হল, আর মায়া হতেই একগাদা মন-রাখা কথা বলে আমি ওর রাগ ভাঙিয়ে দিলাম।

গঙ্গার ধারে গিয়ে হাওয়া খেলাম আমরা, রেস্টুরেন্টে খাবার খেলাম, তারপর অন্ধকার মাঠের এক কোণে গিয়ে বসলাম। প্রেমের কথায় প্রেম বেড়ে উঠতেই আমি ওর হাত ধরলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম ওর হাতের মধ্যে বিদ্যুৎবাহী খোলা তার নেই। এর নেই, অথচ ওর আছে। ও মানে ছবির সুন্দরী, সকালে ওর হাতে হাত রাখতেই সারা শরীরে কী প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছিল, শরীরের সমস্ত রক্ত তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল মুহূর্তে।

ঊর্মির হাত আমার হাতের মধ্যে, অথচ কল্পনায় আমি আর একজনের শরীরের স্পর্শ কী গভীরভাবে অনুভব করছি। রহস্যে, রোমাঞ্চে কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেলাম। মনে হল, এর চাইতে গোপন ব্যভিচার আর হয় না, হতে পারে না। কারও কিছু বোঝার উপায় নেই, অথচ আমি কী নিখুঁতভাবে একজনের দেহের আড়াল থেকে আর একজনের দেহের তাপ টেনে নিচ্ছি।

কিন্তু, এ রকম গোপনতা আর ভাল লাগছিল না, ছবির ওই সুন্দরীর জন্য আমার মন অস্থির হয়ে উঠছিল ক্রমশ। শেষে অস্থিরতা এতই বেড়ে গেল যে, আমি উর্মির হাত ছেড়ে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম,—"চলো এবার ওঠা যাক, রাত্তির হয়ে গেছে।"

উর্মি অবাক হয়ে ওর হাতঘড়ির দিকে তাকাল, আমিও ঘড়ি দেখলাম, এমন কিছু রাত্তির হয়নি, এখনও ঘণ্টাখানেক অনায়াসে বসা যেতে পারে। পাছে উর্মি সেই ধরণের কোনো আবদার করে বসে সেই আশাঙ্কায় আমি একটু উঁচু গলায় এবার বললাম,—"চলো চলো, একটু তাড়া আছে, কতগুলো দরকারী কাজ সারতে হবে আমাকে।"

উর্মি কী বুঝল জানি না, কিন্তু কোনো কথা না বলে গম্ভীর মুখে উঠে পড়ল। বুঝতে পারছিলাম এভাবে দুম করে উঠে পড়াটা ঠিক হয়নি, কিন্তু বোঝার পরেও এ-কথা সে-কথা বলে ওকে সহজ, স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলাম না একটুও। ভীষণ অস্থির লাগছিল নিজেকে, মনে হচ্ছিল কে যেন আড়াল থেকে প্রচণ্ডভাবে টানছে আমাকে।

উর্মি এমনিতেই খুব একটা জোরে হাঁটতে পারে না, এখন বোধ হয় রাগ হওয়ার জন্যে আরও আস্তে হাঁটছিল। অত আস্তে হাঁটতে দেখে আমি মনে মনে খুব বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম ওর ওপর। কিন্তু কোনো রকমে সহ্য করছিলাম, কেন না এখন ওকে যদি জোরে হাঁটতে বলি, ও হয়ত দাঁড়িয়ে পড়বে। বলবে, তুমি যাও তোমার তাড়া আছে যখন, আমি একটু পরে যাচ্ছি। বললেই মুশকিল, রাত্তিরবেলা গঙ্গার ধারে অনেক আজে-বাজে লোক ঘোরাফেরা করে, ওকে এখন একা রেখে চলে যাওয়া অসম্ভব। আর রাগ ভাঙিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া মানে পাকা দুঘণ্টার ব্যাপার। এই সব ভেবে আমি আর ওকে ঘাঁটাতে সাহস করছিলাম না। দাঁতে দাঁত চেপে রাগ বিরক্তগুলো গিলে ফেললাম।

মিনি বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না। উর্মিকে বললাম, "ওই তোমার বাস। আমি চলি তাহলে, কাল ফোন করব।" ওর উত্তরের অপেক্ষা না করে লম্বা লম্বা পা ফেলে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেলাম, তারপর ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে উঠে পড়লাম। ট্যাক্সি ছুটতে লাগল।

ট্যাক্সি যত বাড়ির কাছাকাছি হচ্ছিল আমার উত্তেজনা বেড়ে যাচ্ছিল

তত। কিন্তু কেন? একই প্রশ্ন বার বার করলাম নিজেকে, অথচ একবারও আমায় প্রশ্নটার উত্তর দিতে ইচ্ছে করল না।

বাড়িতে পৌঁছে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে পত্রিকাটা টেনে নিলাম। আন্দাজ মতো পাতা ওলটাতেই ছবিটা বেরিয়ে পড়ল। সেই ছবি, সেই সুন্দরী, ওর গায়ের সুগন্ধ আমার নাকে এসে লাগল। কিন্তু, কিন্তু ওকে এত শুকনো লাগছে কেন। সকালের তাজা মেয়েটা এক বেলায় এত শুকিয়ে গেল কী করে?

ওর চোখের দিকে তাকাতেই আমার বুকটা ধক্ করে উঠল। চোখে সেই রহস্য নেই, কৌতুক নেই, খুব কষ্ট পেলে চোখ যেমন হয়, ওর চোখ এখন সেই রকম। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলাম, তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "কী, কী হয়েছে তোমার।"

উত্তরে ওর চোখের মণি দুটো আরও ম্লান হয়ে উঠল।

নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল আমার, কেন জানি না বার বার মনে হচ্ছিল, এর জন্যে আমি দায়ী, আমি দায়ী। কিন্তু, কী দোষ আমার, বলবে তো, অদ্ভুত! অনুতপ্ত হতে হতে আমি চটেও যাচ্ছিলাম মেয়েটির ওপর।

"বাড়ি ফিরতে দেরি করেছি সেই জন্যে রেগে গেছ?" প্রশ্নটা করেই আমি ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম, কিন্তু কোনো রকম প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন ওর চোখমুখের কোথাও ফুটে উঠল না।

"ওহ বুঝেছি, উর্মির সঙ্গে আমার ব্যাপারটা তুমি জেনে গেছ, না?" বলতেই মেয়েটির চোখের তারা নেচে উঠল একবার। আমি প্রায় দম বন্ধ করে ওর দিকে চেয়ে রইলাম, এবার নিশ্চয় ওর চোখে রহস্য কৌতুক কিংবা চাপা ধমক ফুটে উঠবে। কিন্তু: কই, তাকিয়ে থাকতে আমার চোখ টনটন করে উঠল, অথচ ওর কোনো ভাবান্তর হল না। না কি হয়েছে, না হলে ওর চোখের কালো কুচকুচে মণি দুটো এ রকম ঝাপসা হয়ে গেল কী করে।

পরিষ্কার বুঝতে পারছি ও খুব কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু কী সেই কষ্ট? বলো, আমাকে বলো, তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি। ও কোনো উত্তর দিল না, অথচ রাত বাড়তে বাড়তে বেশ গভীর হয়ে গেল এক সময়।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই মনে হল, কাল সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফেরার পরে যা-যা ঘটেছে সব স্বপ্ন, এমনকি কাল সকালের সব ঘটনাও। এসব ভাবতেই ঘুম-ঘুম ভাব কেটে গেল একেবারে। কোনটা স্বপ্ন, কোনটা সত্যি প্রমাণ করার জন্যে আমি হাত বাড়িয়ে পত্রিকাটা টেনে নিলাম।

ছবির মেয়েটির দিকে তাকাতেই আঁতকে উঠলাম ভীষণভাবে। এ কী! কী চেহারা হয়েছে এর! সারা রাত্তির এক ফোঁটাও না ঘুমোলে, সারা রাত্তির ধরে অসহ্য যন্ত্রণা পেলেও বোধ হয় শরীর এত খারাপ হয় না। মেয়েটির গায়ের অত সুন্দর গোলাপী রং কেমন যেন কালচে হয়ে গেছে, চোখের কোণ বসা, লাল টুকটুকে ঠোঁট কেমন যেন ফ্যাকাশে। মেয়েটা আমার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিল।

এমনভাবে চোখ ঘুরিয়ে রেখেছে যে, আমি হাজার চেষ্টা করেও ওর চোখে আর চোখ রাখতে পারলাম না। দ্বিতীয়বার আর জানার সুযোগও পেলাম না ও ঠিক কী বলতে চেয়েছিল। জানার জন্যে খুব অস্থির হয়ে উঠলাম, কেননা ওই চাউনিটা অসম্ভব তীক্ষ্ণ ছিল, ঠিক এভাবে ও আগে কখনো আমার দিকে চায়নি।

কিন্তু আমি কী করেছি, কিংবা কী করতে চাইনি, যার জন্য তুমি আমার দিকে এমনভাবে চাইছ? আকাশ-পাতাল ভেবেও কোনো কূল-কিনারা পেলাম না, অথচ এটা বুঝতে পারছিলাম যে, ওর কষ্ট পাওয়ার কারণগুলোর সঙ্গে আমি কেমনভাবে যেন জড়িয়ে গিয়েছি।

অফিস বেরুবার মুখে সেণ্ট কোম্পানির নাম, ঠিকানা, ফোন-নম্বর লিখে নিলাম। দেখি, এর থেকে যদি কারণগুলোর কোনো হদিশ পাওয়া যায়। কোম্পানিটা আমাদের অফিস থেকে খুব একটা দূরে নয়, অফিসের শেষে সোজা ওখানে গিয়ে হাজির হব।

কিন্তু বলব-টা কী? অফিসে এসে কিছুক্ষণ কাজ করার পরে আমার যুক্তি-বুদ্ধিগুলো গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। আমি এক অসম্ভব কল্পনার মধ্যে ঘুরে মরছি! ছবি তো ছবিই, না হয় দারুণ ছবি, ছবির মেয়েটাকে আমার ভীষণ ভাল লেগেছে, কিন্তু আমি এসব কী করতে যাচ্ছি!

নিজের যুক্তির কাছে হেরে গিয়ে কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে কাজ করলাম, কিন্তু একটু পরে টের পেলাম কী এক অস্থিরতা আস্তে আস্তে আমার সারা

শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। চেয়ারে বসে মাথা গুঁজে কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল।

এমন সময় টেলিফোন এল। উর্মি। আমার গলা পেয়েই ও টেলিফোনের মধ্যে অভিমানের ঝড় তুলল। অভিমান করলে উর্মি চুপ থাকে, কিন্তু টেলিফোনে চুপ করে থেকে কিছুই বোঝানো যায় না বলে ও অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল।

ঝড়ের মধ্যে উত্তর দেওয়া অসম্ভব। আমি অপেক্ষা করছিলাম কখন ও শান্ত হবে। একটু শান্ত হলে বললাম, "খুব ঝামেলার মধ্যে আছি উর্মি।"

"কী ঝামেলা?"

"টেলিফোনে সব বলা মুশকিল। একজন আমার ওপর খুব চটে আছে, অথচ কী কারণ···।"

"কে সে?"

"একটি মেয়ে।"

"কে?"

"একটি মেয়ে।"

"ঝুনু?"

"উহুঁ।"

"শুক্লা?"

"উহুঁ।"

"পার্বতী?"

"না।"

"কে তাহলে?"

"নাম জানি না, আসলে পুরো ব্যাপারটা এমনই অদ্ভুত যে···।"

"নাম জানো না, অথচ রাগারাগি, বাহ্ ভালই জমেছে তাহলে।"

"না না ওসব না। ঘটনাটা এমনই যে কাউকে বললেও বিশ্বাস করবে না।"

"দরকার কী? নিজের বিশ্বাস হলেই যথেষ্ট।"

"আরে! তুমি আবার উলটো বুঝছ।"

"আমার বোঝাবুঝির কিছু নেই। ছাড়ছি।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও, আজ বিকেলে বাড়ি থাকছ তো?"

"না।"

"কাল?"

"না।"

"তাহলে কবে?"

"জানি না।"

কট্ করে লাইন কেটে দিল ঊর্মি। কী আশ্চর্য। খ'মোকা রেগে গেছে আমার ওপর। ওর বাড়িতে ফোন নেই, থাকলে, এক্ষুনি ফোন করতাম। থাকগে, অফিসের পরে ওর বাড়ি যাব। ও আজ বিকেলে নির্ঘাত বাড়িতে থাকবে। আগেও দু-চারবার রাগারাগির মিটমাট এইভাবেই হয়েছে।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলাম। প্যাকেটের সঙ্গে সঙ্গে এক টুকরো কাগজও উঠে এসেছে, কাগজে সেন্ট কোম্পানির নাম-ঠিকানা, ফোন নাম্বার লেখা। হঠাৎ আমি ওই নাম্বার ডায়াল করলাম। ওপাশে ভারি, কর্কশ গলা। নাম্বারটা ঠিক কি-না জেনে নিয়ে বললাম, "আচ্ছা, আপনাদের বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে আমাকে একটা খবর দিতে পারেন?"

"আপনি হেড্ অফিসের সঙ্গে কথা বলুন, বিজ্ঞাপনের সব কাজ ওখান থেকে হয়।"

"হেড অফিস কোথায়?"

"বম্বে।"

"ও আচ্ছা, ঠিক আছে।"

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে আমি কেমন হতাশ হয়ে পড়লাম। ওদের বিজ্ঞাপন দফতর যখন বম্বেতে, মেয়েটিও নির্ঘাত ওখানকার। বিজ্ঞাপনে চৌরঙ্গীর ঠিকানা দেখে আমি ধরেই নিয়েছিলাম, মেয়েটি কলকাতারই, হয়ত আশে-পাশেই কোথাও থাকে। বম্বে শুনে বেশ মন খারাপ হয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে টের পেলাম, মেয়েটিকে সশরীরে দেখার আকাঙ্ক্ষা কী তীব্র হয়ে উঠেছে আমার। ছবির মেয়েটি যখন এই রকম, তখন সত্যিকারের মেয়েটি না জানি কী!

কিন্তু, ছবির মেয়েটিই বা জ্যান্ত মেয়ের মতো ব্যবহার করছে কীভাবে। ওর রহস্য, কৌতুক, এমন কি শরীরের উষ্ণতার সঙ্গে জ্যান্ত মেয়ের তাকাতটাই বা কোথায়? ছবির মেয়েটি জ্যান্ত মেয়ের মতো অভিমানী হতে পারে,

কেন জানি না আমার মনে হল, উর্মির চাইতে ওর অভিমানের তীব্রতা অনেক বেশি। শুধু অভিমানই নয়, ওর দুঃখ পাওয়া, কষ্ট পাওয়া—সব কিছুই কী ভয়ংকর সত্যি। ওর দুঃখ পাওয়ার কথা ভাবতেই চোখের সামনে ওর চেহারাটা ভেসে উঠল। অমন সুন্দরী মেয়েটি একদিনের মধ্যে কী যাচ্ছেতাই ভাবে শুকিয়ে গেছে। অথচ, কী কারণ এখনও আমি জানতে পারিনি। মনে হয়, ওর কষ্ট পাওয়ার মূলে আমি, কিংবা কষ্ট দূর করার ব্যাপারে আমি ওকে সাহায্য করতে পারি। এই দু'টোর একটা নিশ্চয় হবে, তা না হলে মেয়েটি আজ সকালে অত কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাত না।

নিজের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে ইচ্ছে করছিল না একটুও, আসলে অমন সুন্দরীর শুকিয়ে যাওয়া চেহারাটার কথা ভেবে আমার কেমন মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল, আমি চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো ব্যবহার করছি। আজ যদি উর্মি ছবির ওই মেয়েটির মতো অসুস্থ হয়ে বাড়িতে একা একা পড়ে থাকত, আমি কি অফিসে আসতে পারতাম! না, কক্ষনো না। তাহলে এই অসুস্থ ছবির মেয়েটিকে একা একা বাড়িতে ফেলে এলাম কীভাবে!

দুশ্চিন্তা আর অপরাধবোধ এতই বেড়ে উঠল যে, আমি শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম অফিস থেকে। বারবার মনে হচ্ছিল, বাড়ি ফিরে না জানি কী দেখব! বরাবরই দেখেছি, যখনই খুব তাড়াতাড়ি থাকি, রাস্তায় গাড়িঘোড়া কিছু থাকে না। হাঁ করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছি তো আছিই, অথচ না বাস, না ট্যাক্সি। অধৈর্য হয়ে পায়চারি শুরু করে দিলাম, দু'টো হাতই মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছিল বারবার। মনে হচ্ছিল, সারা পৃথিবী আড়ালে দাঁড়িয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, অথচ আমার কিছু করার নেই।

হঠাৎ ফুটপাথের লাগোয়া বড় স্টেশনারি দোকানের কাচের দিকে তাকাতেই চোখ আটকে গেল, নীল কাজের সাদা ফুল, মধ্যিখানে বড় বড় হরফে ওই সেন্টের নাম লেখা। আমি প্রায় ছুটে দোকানটায় ঢুকে কাউন্টারের মেয়েটাকে বললাম, "আমাকে ওই সেন্টটা দিন তো।"

মেয়েটা কেমন যেন অবাক চোখে আমাকে দেখে নিয়ে শো-কেসের দিকে এগিয়ে গেল। ওকে অবাক হতে দেখে বুঝলাম, এরকম উদ্বিগ্ন

গলায় সেন্ট কেনা একেবারেই মানায় না। অথচ এই গলায় প্রাণ বাঁচবার ওষুধ চাইলে দিব্যি মানিয়ে যেত। গলায় যখন এতখানি উৎকণ্ঠা, আমার চোখ-মুখের চেহারাও নিশ্চয়ই পালটে গেছে। যাক্ পালটে, কে কী ভাবল তা নিয়ে…আমার সমস্যা আর কারও সমস্যার চেয়ে ছোট নয়। আমার হাতে এই সেন্টটা দেখলে ছবির ওই মেয়েটির মুখে হাসি ফুটতে পারে, ও ভাববে ওর কথা আমি ভাবি, ও যার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে সেই জিনিস আমি কিনি, দরকার না হলেও কিনি।

সেন্টটা নিয়ে দোকান থেকে বেরোতেই সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল, আমি প্রায় দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়লাম। কোথায় যাব বলার পরে প্রায় ভিক্ষে চাওয়ার গলায় বললাম, "একটু জোরে চলুন ভাই।"

ট্যাক্সি বিপজ্জনকভাবে কয়েকটা গাড়িকে ওভারটেক করে টেনে ছুটতে লাগল।

হাতে সেন্ট। মনে হচ্ছিল এই সেন্ট দেখে ছবির মেয়েটি দারুণ চমকে যাবে, দারুণ খুশি হবে। আমি কিন্তু প্রথমেই ওকে সেন্ট দেখাব না। ওর প্রতিক্রিয়া কল্পনা করে আমিও খুশি হয়ে উঠছিলাম।

সেন্টটাকে দেখতে অনেকটা মুখ আটকানো ছোট টর্চের মতো। গায়ে এক টুকরো রঙিন ছবি, নীল আকাশে এক জোড়া পাখি ভেসে বেড়াচ্ছে। ঢাকনি খুলে দেখলাম, ভেতরে একটা বড় রূপোলি বোতাম, বোতামে ছোট্ট একটা ফুটো। বোতামটা টিপলেই নিশ্চয়ই ওই ফুটো দিয়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে যাবে। সেন্টটা আমি যত্ন করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরে এসে ঢুকলাম। সেন্টার টেবিলের নীচের তাকে পত্রিকাটা। পত্রিকাটা হাতে নেবার আগে আমি পকেটের উপর দিয়ে সেন্টের শিশিতে চাপ দিলাম আলতোভাবে। এখন নয়, এখন নয়, একটু পরেই নাটকীয়ভাবে শিশিটা ওর চোখের সামনে আমি তুলে ধরব। মেয়েটির চমকে যাওয়া খুশি খুশি মুখের কথা ভাবতে আমার খুব ভাল লাগল।

পত্রিকাটা হাতে নিয়ে ছবিটা বার করতেই চমকে উঠলাম ভীষণভাবে, গা-হাত-পা প্রায় কেঁপে উঠল। এ কী! কী করে সম্ভব! ছবির মেয়েটি শুকিয়ে ঠিক আধখানা হয়ে গেছে, আর ওর ডান গালে কালশিটে, কেউ যেন

কামড়ে রক্ত জমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কে সে? আমি ছাড়া এ ঘরে তো আর কেউ ঢোকে না!

আমি বহুবার বহুক্ষণ ধরে কাতর গলায়, অভিমানের গলায় ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে আমাকে বলো? বলবে তো। বলবে না? ঠিক আছে।"

আস্তে আস্তে রাত বাড়তে লাগল, কিন্তু মেয়েটি একবারও আমার চোখের দিকে তাকাল না। মাঝে মধ্যে ওর চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে উঠছিল, হয়ত আমার উদ্বেগ আর প্রশ্নে ও বিরক্ত বোধ করছে, কিংবা বোধ হয় ভাবছে, আমি সব জেনে-শুনেও ন্যাকামো করছি। কিন্তু বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো, আমি ওর হাতে হাত রাখতে গিয়েও পারলাম না, কেন জানি না মনে হল, ওর অবস্থার জন্যে হয়ত সত্যিই আমি দায়ী। হয়ত আমি না জেনে এমন কিছু করে ফেলেছি যার জন্যে ও এত কষ্ট পাচ্ছে।

কিন্তু ওর গালে কালশিটে এল কোত্থেকে। মনের কষ্টে কারও গালে তো রক্ত জমে ওঠে না। তাহলে নির্ঘাত এমন কেউ আছে, যে নিঃশব্দে, গোপনে ওর সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওর গায়ে হাত দিচ্ছে, গালে দাঁত বসাচ্ছে। কে সে?

আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরের চারদিক দেখে নিলাম, না কেউ কোথাও নেই। তাছাড়া, বাড়ি থেকে বেরুবার সময় তো আমি এ ঘরে তালা দিয়ে যাই, আজও দিয়ে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে খুলেছি। জানালার শিকগুলো চাপা আর মজবুত, এর ভেতর দিয়ে কারো পক্ষে ঘরে ঢোকা অসম্ভব। তবে কে যে এসেছিল তার কাছে এ-ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি আছে! পুরো ব্যাপারটা এতই রহস্যময় যে, অসম্ভব কল্পনা করেও আমি কোনো সমাধানের চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

পকেটে সেন্টের শিশি, কিন্তু এখন এটা বার করবার কোনো মানে হয় না। বরং আমার ভয় করছিল, যদি ভুল করে বার করে ফেলি। মেয়েটির এত কষ্ট আর অপমানের মধ্যে সেন্টের শিশি বার করার মতো কুৎসিৎ ঠাট্টা আর হতে পারে না।

কিন্তু, এখন আমি কী করব? কী-ই বা আমার করার আছে? বারবার আমি ছবির মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইছিলাম। মেয়েটি আর আমার চোখের দিকে তাকায় নি, ও বোধ হয় আমার দৌড় কদ্দুর ভালভাবেই বুঝে গেছে।

আমার দুঃখ আর ব্যর্থতাবোধ এতই বেড়ে উঠেছিল যে, আমি ওর শুকিয়ে যাওয়া চেহারার দিকে আর চোখ রাখতে পারছিলাম না। পত্রিকাটা বন্ধ করে অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করে দিলাম ঘরের মধ্যে। রাত্রে আর কিছু খেতে ইচ্ছে করল না, জামা-কাপড় পালটে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল'ম। ঘুম তো দূরের কথা, একভাবে বেশিক্ষণ শুয়েও থাকতে পারছিলাম না। ছটফট করতে করতে মাঝরাত্তির হয়ে গেল।

আজ বোধ হয় পূর্ণিমা, কিংবা পূর্ণিমার আগের রাত। আকাশে বিশাল চাঁদ, এক টুকরোও মেঘ নেই কোথাও। পরিষ্কার হলুদ আলো জানালা দিয়ে এসে সারা বিছানায় ছড়িয়ে পড়েছে। হলুদ আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমি হাত বাড়িয়ে পাশের টেবিল থেকে পত্রিকাটা টেনে নিলাম। এই আলোয় সামান্য ঝাপসা হলেও সব কিছু দেখা যায় দিব্যি। পত্রিকাটা ওলটাতেই মেয়েটির ছবি বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু, এ কী! কে যেন ওর [illegible] ওপর থেকে ছিটকে সরে গেল না! কে? কে?

পত্রিকার ঠিক মাঝখানে ডানদিকের পাতায় মেয়েটি, বাঁ দিকে সেই লোকটা। পোকায়-খাওয়া-দাঁত লম্পট, বদমাইশ লোকটার নাক-মুখ দিয়ে ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছিল। শজারুর কাঁটার মতো চুলগুলো দুলছিল আস্তে আস্তে। ওর চোখের দিকে তাকাতেই লোকটা কেমন যেন ভয় পেয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিল। আর কোনো সন্দেহ নেই, হাতেনাতে ধরে ফেলেছি, শুয়োরের বাচ্চা।

এক-লাফে উঠে বসলাম। ছবির অসহায় মেয়েটি যন্ত্রণায় অপমানে সিঁটিয়ে গেছে। ওর গালের কালশিটে বেড়ে গেছে আরও। এর মূলে ওই লোকটা, লোকটার কালো, উঁচু দাঁতগুলোর দিকে তাকাতেই আমার গা ঘিনঘিন করে উঠল।

লোকটাকে আমি খুন করে ফেলব, কিন্তু কী ভাবে? কী ভাবে মারলে লোকটা বেশি কষ্ট পেয়ে মরবে? হাতের কাছে বেয়নেট লাগানো বন্দুক কিংবা ধারালো ছুরি নেই বলে ভয়ংকর আফসোস হতে লাগল আমার।

একবার ভাবলাম, একটানে ছিঁড়ে ফেলি লোকটাকে, কিন্তু এভাবে মারলে লোকটা বেশি কষ্ট পাবে না, তার চাইতে বরং.........।

উঠে গিয়ে দাড়ি কামাবার বাক্স থেকে একটা নতুন ব্লেড নিয়ে এলাম। বুঝতে পারছিলাম আমার শরীরের সমস্ত পেশী অসম্ভব শক্ত হয়ে উঠেছে,

দু' আঙুলের ফাঁকে ব্লেডটা। ঝাপসা হলুদ চাঁদের আলোকেও স্টিলের ব্লেডের ধার ঠিকরে উঠছিল।

ব্লেডটা সামনে আনতেই ছবির লোকটা আঁতকে উঠল, ওর গোল-গোল চোখের মণিদুটো ক্ষমা চাইছিল বারবার। কিন্তু এর কোনো ক্ষমা নেই, এর কোনো ক্ষমা হতে পারে না। এক মুহূর্তে চুপ করে থেকে প্রচণ্ড জোরে এলোমেলো টানে টুকরো টুকরো করে ফেললাম লোকটাকে। তারপর সমস্ত টুকরোগুলো দলা করে ছুঁড়ে ফেলে জানলার বাইরে।

বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল, কিন্তু ঘামে সারা শরীর ভিজে গিয়েছিল আমার। গা-হাত-পা অসম্ভব গরম। বুক ঠেলে নিশ্বাস বেরুচ্ছিল হু-হু করে। সুস্থির হতে সময় গেল কিছুক্ষণ। এক গ্লাস জল খেলাম ঢক-ঢক করে।

চাঁদের আলোয় দিব্যি চোখ সয়ে গেছে এখন, সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। বিরাট চাঁদটা জানলার আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটির দিকে তাকাতেই আমর সারা শরীর কেঁপে উঠল খুশিতে। মেয়েটির চোখ-মুখ, সারা শরীর আগের মতো ঝলমল করছে। ও দু'চোখ দিয়ে গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জানাল। ওকে কষ্ট থেকে, অপমানের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আমার পরিতৃপ্তির কোনো সীমা ছিল না, কিন্তু এভাবে চোখে চোখ রেখে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যে কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল, লজ্জা পাচ্ছিলাম।

আমি খুব নীচু গলায় বললাম, "তুমি কিন্তু আমাকে কিছু বলো নি, আগে বললে·····আসলে তুমি আমাকে পর ভাবো।" নিস্তব্ধ রাত্তিরে টের পেলাম, আমার গলায় শেষের দিকে কেমন যেন অভিমানের সুর ফুটে উঠেছে।

মেয়েটি এবার আমার দিকে এমনভাবে চাইল যে, আমি পারিষ্কার বুঝতে পারলাম ও খুব বিব্রত হয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাইছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলাম ওর ক্ষমা চাইবার মধ্যে কোনো ভান আছে কি-না। না, নেই তো। অকৃত্রিম ভঙ্গিতে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ের ক্ষমা চাইবার মতো সুন্দর দৃশ্য আর বোধ হয় কিছু হতে পারে না। তাছাড়া শুধুই ক্ষমা চাওয়া নয়, মেয়েটি আরও কী যেন বলতে চাইছে, অথচ বলতে পারছে না, ওর টসটসে ঠোঁট দুটো কাঁপছে তিরতির করে। এমন ঠোঁটের কাছে, এমন

চোখের সামনে লোহা গলে যায়, পাথর ফেটে যায়, আমি কোন ছার! আমার একটু আগের মান-অভিমান যেন দু'যুগ আগের ব্যাপার হয়ে গেছে।

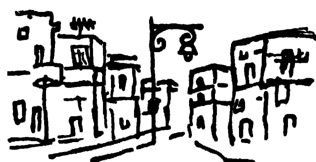
লাফিয়ে উঠে বললাম, "আসল জিনিসটাই তোমাকে দেখানো হয়নি, দাঁড়াও এক মিনিট।" উঠে গিয়ে নিয়ে এলাম। আমার হাত পেছন দিকে। ছবির সুন্দরী প্রচণ্ড কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে। আমি সামনে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ওর কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিলাম, তারপর লুকানো সেণ্টের শিশিটা বার করে এনে বোতাম টিপে ধরলাম। অমনি হিস হিস শব্দ তুলে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। ছবির মেয়েটির চোখের মণিতে বিন্দু বিন্দু অসংখ্য তারা জ্বলে উঠল, ও অবাক হয়ে গেল ভীষণভাবে, তারপরেই ওর চোখ, মুখ, বুক উপচে পড়ল খুশিতে।

এ সেই সেণ্ট যে সেণ্ট গায়ে দিলে অবসাদ ক্লান্তি কাছে ঘেঁষতে পারে না, এই সেণ্টের জন্যেই প্রেমিকরা আঠার মতো গায়ে সেঁটে থাকে।

তোমার গায়ে সেণ্ট এবং আমি যে তোমার প্রেমিক এ বিষয়ে আর কোনো সংশয় নেই। এখন তাহলে আমার কী করা উচিত? আঠা হয়ে পরমাসুন্দরী মেয়েটির গায়ে সেঁটে থাকার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম।

বিরাট হলুদ চাঁদটা আরও বিরাট হয়ে জানলার আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। ঘরে পরিষ্কার হলুদ আলো। অল্প-ঠাণ্ডা বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে সুগন্ধে। গন্ধে আমার সারা শরীর ঝিম ঝিম করছে, এভাবে বেশিক্ষণ বসে থাকা অসম্ভব। আমি শুয়ে পড়লাম, আর তক্ষুনি ছবির সুন্দরী বইয়ের পাতা থেকে বেরিয়ে এল। অবাক হতে গিয়েও হতে পারলাম না, মনে হল এটাই তো স্বাভাবিক। আমি আঠার মতো সুন্দরীর গায়ের সঙ্গে জুড়ে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা শরীরে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

বলরাম বসাক



ঈর্ষা ঈর্ষা খেলা

সুমালাকে একটু ঈর্ষান্বিত করে দিলে কেমন হয়। তাড়াতাড়ি ওকে ডেকে এনে দেখিয়ে দিলাম, ঐ যে দেখ, কালো মতন মেয়েটা, নাম দীপা। ওকে এক সময় আমার খুব ভাল লাগত। সামনে হলুদ-নীল প্রজাপতি ভরতি কামিনী ফুলের গাছটা। আমাদের নীচ তলার অর্ধেকটা ছাড়িয়ে আরো একটু ওপরে উঠে গেছে। তাতেই উল্টোদিকের বাড়ির বারান্দাটা অল্প স্বল্প ঢাকা ছিল। আর সুমালাও একটু বেঁটে মতন, তাই গোড়ালি তুলে, কখনো ডালের ফাঁক দিয়ে কখনো এদিক ওদিক উঁকিঝুঁকি মেরে—দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'কই কোথায়?'

বাড়িটার দোতলায় বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিল দীপা। একটু যখন সরে দাঁড়াল, তখন কামিনী-গাছের ডালপালার ঝ'পসা-গ্রাস থেকে দীপা বে'রিয়ে এল ঠিক যেন অ্যালুমিনিয়াম রঙের বিষাদ-পূর্ণিমা। দেখে একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম।

এতক্ষণে সুমালা দীপাকে আস্ত দেখতে পেল। অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। ঠোঁট ফুলিয়ে কী একটা ভাব করল। কীরকম ভাব করলে মেয়েরা ঈর্ষান্বিত মালুম হবে আমি জানি না। মেয়েদের ভাবসাব বুঝতে আমার এখনো অনেক সময় নেবে। পূর্ব-অভিজ্ঞতা কিছু নেই, শুধু বুঝতে পারলাম কোন সুন্দরী মহিলার কপালে য'দি অল্প অল্প ভাঁজ পড়ে, ভুরু যদি অল্প অল্প ভাঙে, তাহলে সকাল ন'টার নতুন রোদের আভা হালকা ভাবে মন্থর ভেসে আসতে আসতে উপচে ওঠে। বেশ লাগে দেখতে। মুখের এই ভাব কি ঈর্ষার জন্য, নাকি ঈর্ষা গোপন রাখার জন্যে। ওদের মুখ-ভঙ্গির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবগুলো এই তো সবে বুঝবার চেষ্টা করছি। সভ্যবিয়ে হয়েছে।

ওই তো সবে মেল-মেশা করছি। দেখা যাক কী হয়! মুখ ফিরিয়ে সুমালা বলল, ভালই তো। তাকিয়ে দেখি সারা মুখের লাবণ্য চুয়ে ঝলমল করছে ফরসা রঙের হাসি। লাল টুকটুকে রঙ তার মধ্যে ঝলক দিয়ে উঠল। চোখ দুটো কৌতুক করতে চায় বলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। আবার পরক্ষণেই লজ্জা-লজ্জ -মতন হয়ে গেল, ভালই তো দেখতে ওকে বিয়ে করলে না কেন? কই, এতটুকু সেরকম লাগছে না। একটুও তো রাগ-রাগ ভাব ফুটল না। একটুও তো মন কেমন করল না। বোধহয় খুব সাবধানী মেয়ে। আর নয়ত খুবই সাদা মন ওর। কিংবা ভাবছে দীপাকে নিয়ে হিংসে করার মত কিছু নেই। হয়ত ভাবছে দীপার চেয়ে আমি আরো ভাল দেখতে মেয়ে পেয়ে গেছি। সে জন্যেই দীপাকে বিয়ে করিনি। না ঠিক তা নয়। আসলে দীপা আমাদের উল্টোদিকের বাড়িতে থাকে। এ ধরণের প্রেমকে বলে ছি-ছি। এক পাড়ায় থেকে প্রেম? পাড়ায় তাহলে টিকতেই পারতাম না। পাড়ার মেয়েদের সম্পর্কে সাবধান থাকতে হয়। খুব সাবধান। সাবধানে তাকাতে হয়, না তাকালেই ভাল। সাবধানে কথা বলতে হয়। না বললেই ভাল। বললে খুবই সৌজন্যমূলক কথা, তার বেশি একদম নয়। এই যেমন, মা কেমন আছে? বাবা কেমন আছে? পরীক্ষা কেমন হল? পরীক্ষার হলে মেয়েরা কেমন টোকাটুকি করল। এই সব। তাছাড়া পাড়ার মেয়েদের খুব বেশি পাত্তা দিতে নেই।

তবে মনে হয় দীপা একটু অন্যরকম। একটু চুপচাপ ধরণের। এক ফালি আবছা ছায়ায় শ্যামলা মুখখানা আলতো রেখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু বেশ সোজা সহজ দৃষ্টি ফেলে তাকায় আর কী যেন ভাবে। আড চোখে তাকাতে তাকাতে আচমকা আমিও এক সময় সোজাসুজি দৃষ্টি ছুঁড়ে দিতাম। সারা গায়ে মনে হত যেন আকুপাংচার হচ্ছে। কতদিন ঘাবড়ে গিয়ে বারান্দায় ছটফট করছি। কোনদিন ভেবেছি আলাপ করি। কোনদিন ভেবেছি ডেকে কথা বলি। একবার ভাবলাম উড়ো চিঠি পাঠিয়ে দিই ওর ঠিকানায়। কখনো রাস্তা দিয়ে যখন যাবে ফলো করব। পরে ভাবলাম থাক, কী দরকার। ওকে তো আর বিয়ে করব না। ঘাটাঘাটি করে কী লাভ? প্রথম প্রেম মনে মনেই থাক। এ ধরণের প্রেম মানে দু'দিনের জন্যে একটু মজা লোটা। চিরকালের জন্যে বিয়ে করার মত নয়। বিয়ে একটা সাংঘাতিক সিরিয়স ব্যাপার। এর সঙ্গে অনেক কিছু জড়িয়ে

আছে। যেমন উচ্চাশা, আত্মবিশ্বাস, অভিমান, সাংসারিকতা, সামাজিকতা, উপার্জন ও সংঘর্ষ।

কিন্তু আরেকবার যখন দীপার প্রসঙ্গ উঠল, সুমালা সেই একই প্রশ্ন করল, ওকে যখন পছন্দ বিয়ে করলে না কেন? আমি তখন দাঁতে ঠোঁট কামড়ে অল্প হাসলাম। তাহলে দেখছি ঈর্ষা ওকে মৃদু মৃদু অ্যাটাক করেছে। আকাশ থেকে পড়ার ভাণ করে বললাম, অ্যাঁ বিয়ে করব ওকে। মাথা খারাপ?

উহু মাথা খারাপ কি? সুমালা দেখছি অনেকখানি ভুরু কুচকে ফেলল, নিজেই তো বললে ভাল লাগে···। কথাটা বলল বটে কিন্তু পাতলা কচি ঠোঁটে বেশ একটু মিষ্টি মৃদু ঝগড়া বাধাবার মজা লাগিয়ে রাখল। চোখেও সেই মজা চক চক করছে। ঈর্ষার কোন লক্ষণ দেখাতে চাইছে না। অথচ ভাল লাগে কথাটার ওপর অহেতুক জোর দিচ্ছে।

ভাল লাগে বলেছি? বলেছি ভাল লাগত?

হ্যাঁ হ্যাঁ পাস্টটেনসে বলেছো। তাতে কী। তারপর একটু খিল খিল করে হেসে উঠল। শরীরটাকে বিদ্যুতের চাবুকের মত দোলাতে লাগল। তারপর চোখ দুটো স্বপ্নবিভোর করে বলতে লাগল, মুখখানা খাশা মিষ্টি আর ফিগারটাও কী চমৎকার। দীর্ঘাঙ্গী যুবতী, আমার চাইতে কত লম্বা, কী চুল, বাবারে বাবা, দারুণ পছন্দ তোমার—।

আমি যতটা উচ্চস্বরে পারলাম হো-হো করে হাসতে লাগলাম। আর পারলো না সুমালা। এবারে হেরে গেছ। এবারে ঈর্ষায় কাতর হয়ে পড়েছ। দীপার সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা করে ফেলেছ। যার এমন রূপের ম্যাজিক তার সঙ্গে দীপার তুলনা হয়? এখন কেমন লাগছে এই হিংসে—কেমন জ্বলছে বুকের ভেতরটা—এইভাবে বলতে বলতে ওকে দু'হাতে টেনে নিতে গেলাম। চুমু খেয়ে মুখ অনেকক্ষণ বন্ধ করে দিতে চাইলাম। ওর বুকের ভেতর ঈর্ষা জ্বালিয়েছি, এখন সেটা চুম্বনে চুম্বনে নিবিয়ে দেওয়া দরকার। এ যে খেলা। এর নাম ঈর্ষা ঈর্ষা খেলা। কিন্তু আচমকা আমার থেকে বেশ কয়েক পা সরে গেল। ধরা দিল না। খলখলিয়ে হেসে ফেলল, মোটেই না। আমার দীপাকে দেখে মোটেই হিংসে হয়নি। এক্ষুনি প্রমাণ করে দিচ্ছি। বলতে বলতে এদিক ওদিক ছুটে পালিয়ে গেল। কখনো ছুটে পালানোর ভান করল। মানে খেলল। নতুন নতুন বিয়ে করলে এরকমই খেলতে হয় নিয়ম।

কিন্তু এক সময় দেখলাম ধীরে ধীরে পা ফেলে দীপা ঘরের ভিতর ঢুকল। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। কী ব্যাপার বুঝতেই পারছি না। ভাল করে চোখ মেলে মাথা ঝাঁকিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ দীপাই তো। ও এখানে কেন? কী চায়? কোনদিন তো এখানে আসে নি। আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায় না কি? থতমত খেয়ে যাচ্ছি মনে হচ্ছে—এক সময় না হয় আড় চোখে তাকিয়ে প্রশ্রয় দিতাম কারণ দীপাও তেমনি প্রশ্রয় দিত—বিয়ের পর তো আর কোনদিনই সেরকম করিনি···।

বসুন।

কিন্তু বসল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি পাশের ঘর থেকে সুমালাকে ডাকলাম। দীপা এসেছে শুনে সুমালা ভুরু নাচল। ভুরু নাচিয়ে কী বোঝাতে চাইল। এক লাফে ঘরের ভেতর ঢুকল। দীপাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল। কী আশ্চর্য চিবুকে একটা চুমুও খেল দেখছি। তোমাকে ওর ভীষণ ভাল লাগে।—এ কথাও বলল দীপাকে। ছি ছি। আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে সিগারেট কিনতে বাইরে চলে গেলাম। সত্যি লজ্জা লাগছিল। সুমালা যে কী করে ফস করে কী বলে দেয়—। মনে হচ্ছে খুব খেপে গেছে। একদম ঈর্ষা হয়নি প্রমাণ করার জন্য এত কাণ্ড করে বসল। আমাকে লজ্জায় ফেলে দিল। এই খেলা এখন বন্ধ করা দরকার। ছি ছি দীপার সামনাসামনি পড়ে গেলে আমি কোনদিন মাথা তুলতে পারব না।

সিগারেট কিনে একটু দেরি করেই বাড়ি ফিরলাম। দীপা একটু আগেই চলে গেছে। বিছানার ওপর শাড়ি পড়ে আছে। তার পাশে গয়নার বাক্স। একটা অ্যালবাম। এগুলো সুমালা দীপাকে দেখানোর জন্যে বের করেছিল। এখন গুছিয়ে রাখছে। অ্যালবামটা আমার দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সুমালা দেখতে দেয় না। স্টিলের আলমারিতে তুলে রাখে। জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে আমার সামনে বসল, খুব ভুল করেছ। এত ভাল মেয়ে।

ওকে ডাকলে কেন? ছি।

তোমার যাকে ভাল লাগে, নিশ্চয়ই আমারও তাকে ভাল লাগবে।

কথাটার মধ্যে কোন গুঢ় অর্থ আছে? একটু শ্লেষ আছে? যদি থাকে তো নিশ্চয়ই একটু চাপা রাগও আছে। কেন এই রাগ? ঈর্ষাজনিত।

যাক্ গে, এখন ঈর্ষাফির্ষা নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে ভাল লাগছে না। সেই স্বাভাবিক সুরটা কেটে গেছে। এখন আর সে মেজাজও নেই। অবশ্য সুমালা আমার ভাবভঙ্গির তোয়াক্কা করছে না। গড় গড় করে পাঁচশ ছাব্বিশটা বাক্য ইতিমধ্যে বলে ফেলেছে। যার সারার্থ মেয়েটার মা নেই। বাবা এখনো চাকরি করছেন। দাদা চাকরি খুঁজছেন। বোঝা যাচ্ছে অভাবের সংসার। এ পর্যন্ত আমার সবই জানা। এর পরের অংশগুলো আমার অজানা। যথা দীপা বি-এ বি-এড পাশ করেছে। এম-এ পড়তে ইচ্ছুক। স্কুলে চাকরি করবে।

এর পর আমার চমকাবার পালা যখন শুনলাম দীপা একজন সাহিত্যিকা। কবিতা লেখে। কবি।

কবি? ঐ মেয়েটা। আমি অনেকক্ষণ কথাই বলতে পারলাম না। কোনদিনই টের পাইনি। এক পাড়ায় আছি, একেবারে মুখোমুখি বাড়িতে, একদিনও কেউ বলেনি অবশ্য পাড়ায় খুব কম মিশি। একমাত্র আমাদেরই বাড়ি গাড়ি আছে বলে পাড়ার লোক আমাদের খাতির করে—কিন্তু মেশে না। দীপা কবি? অবশ্য আমার অনেক আগে থেকেই মনে হয়েছিল মেয়েটি কেমন যেন একটু অন্য ধরনের। বারান্দায় আবছা ছায়া মুখে নিয়ে দাঁড়ায়। কামিনী গাছটার ফুল প্রজাপতি আর সবুজ পাতার মধ্যে দৃষ্টি ডুবিয়ে রাখে। মাঝে মাঝে আমার দিকেও সহজ সরল দৃষ্টি ফেলে রাখে। তক্ষুনি অজিতকে মনে পড়ে গেল। আমার কলেজের ক্লাসমেট ঠিক ঐরকম ভাবুক ভাবুক ছিল। পরে জানতে পারলাম ও কবি। দারুণ দেখতে একটা মেয়েকে নিয়ে কবিতা লিখত। তারপর তার প্রেমে পড়ে গেল। শেষে বিয়ে করল!

আমি চুপ করে কী ভাবছি দেখে সুমালা অনেকক্ষণ চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, একটা ছেলেকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছে। কিন্তু ছেলেটা যে কে তা কিছুতেই ভাঙল না।

আমার আঙুল থেকে সিগারেট পড়ে গেছে।

সুমালা লক্ষ্য করল কিন্তু কিছু বলল না।

কে ছেলেটা?

তুমি নও।

সে তো নিশ্চয়ই। আমি কেন হব? আমাকে নিয়ে উনি লিখতে

যাবেন কেন? কিন্তু সুমালার গলায় আওয়াজ ভারি হয়ে গেছে। বার বার বলল তুমি নও। এ অন্য ছেলে। ওর মুখে এতক্ষণ পরে একটা গম্ভীর-গম্ভীর আদল এসেছে।

চুপ করে সুমালাকে দেখতে লাগলাম। মুখের ঝলমলে ভাবটা অনেকটা স্তিমিত হয়ে গেছে। গালের ফরসা মাখন মাখন রঙটা এখন হাসছে না। চোখের তারায় জানলার বাইরের ছবিটা স্থির হয়ে রয়েছে। এতক্ষণ পরে আমার মনে হল কী সন্দেহ এসে মুখের সৌন্দর্যের হানি ঘটাচ্ছে। এক্ষুণি মুখখানাকে খাবলে ধরে সন্দেহ-নষ্ট আদলটাকে ভেঙেচুরে আগেকার মিষ্টি রূপটাকে ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছে করছে।

কী হল তোমার? বলতে ইচ্ছে করছে। কিসের সন্দেহ? মিছিমিছি ভেবে মরছ। সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠছ নাকি। তা তুমিই তো ঘাটাঘাটি করলে। কে বলেছিল দীপাকে আমাদের বাড়ি ডাকতে। তুমিই তো দু হাতে জড়িয়ে ইস আদরের কী ঘটা।

বার বার বলছ এ অন্য ছেলে। বার বার বলার দরকার কি? একবার বললেই তো ফুরিয়ে যায়। তাহলে তুমিও ব্যাপারটা ভাবছ। তোমার মনেও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ভেতরে ভেতরে ঈর্ষা হচ্ছে নাকি? এতক্ষণে ঐ একটি গুণে দীপা তোমাকে টেক্কা দিয়েছে। ওকে এখন নিশ্চয়ই সইতে পারছ না। এসব কথাও বললাম না। শুধু তাড়াতাড়ি সুমালাকে বুকে টেনে নিতে বাধ্য হলাম। কারণ সুমালা হাসছে ঠিকই কিন্তু এক ফোঁটা জল ওর চোখ থেকে বেরিয়ে টুপ করে গালের ওপর গড়িয়ে পড়ল। দেখে আমার দারুণ ভাল লাগল। আমার ওপর একটা টান এসেছে তাহলে। ভেতরে ভেতরে খুব কষ্ট পাচ্ছে। ওপরে তা বুঝতে দিতে চাইছে না। দীপা সংক্রান্ত আর কোন কথা না হওয়াই ভাল। ভীষণ ভয় করতে লাগল আমার।

তাই সুমালাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলাম কয়েক দিন। সিনেমা-থিয়েটার-যাত্রা। ম্যাজিক সারকাস সংস্কৃতি মেলা। ক্রিকেট খেলা চিড়িয়াখানা-পিকনিক। আবার সুমালা রঙিন ডালিয়ার মত দুলতে লাগল, হাসতে লাগল আমার চোখের সামনে। কিন্তু চোখের আড়ালে ঘরের কোণে গম্ভীর মুখ করে বসে থাকে। সেই অ্যালবামটা হাতে নিয়ে নিজের ছবিগুলো নেড়ে চেড়ে দেখে। আমি এলে অ্যালবামটা ষ্টিলের আলমারিতে তুলে রাখে। অ্যালবামের ছবিগুলো আমি দেখিনি। তাই একদিন সেটা

নিতে গিয়ে দেখি জিনিসটার সঙ্গে অনেকগুলো পত্রপত্রিকা। এগুলো এত যত্ন করে আলমারিতে রেখেছে কেন?

সুমালা কখন যেন এসে লক্ষ্য করল, আমি অ্যালবামটা না নিয়ে পত্রিকাগুলো তুলে নিয়েছি। পাতা উল্টেপাল্টে প্রচণ্ড লোভীর মত দীপার কবিতা বের করে পড়ছি। ওর কবিতা আগে কখনো পড়িনি। কয়েকটা কবিতা বার বার পড়তে বাধ্য হলাম। কীরকম যেন লাগছে। বুক ধড়ফড় করছে। কবিতাগুলোতে আমাদের কামিনী গাছটার কথা আছে। আমি যে নীল জামাটা পরি তার কথা আছে। আমাদের বাড়ির বারান্দার বর্ণনাও রয়েছে। আর যে যুবকের বর্ণনায় আবদ্ধ হয়ে দীপা নৈরাশ্যে ভেঙে পড়েছে, তাকে সে শ্রুতি মধুর শব্দে সাজিয়ে মহীয়ান করে রেখেছে। ইস দীপা আমার এত কাছাকাছি। অথচ আমারই তেমন কোন ফিলিং নেই। আমি নিশ্বাস না ফেলে কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি সুমালা মাথা নীচু করে বসে আছে। জ্বলছে বোধহয় প্রচণ্ড রাগে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না বলে ঠিক বুঝতে পারছি না। হয়ত বিরক্ত হচ্ছে। বিরক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। এ যে ভেতরের ঈর্ষা। এক ধরনের বিচ্ছিরি রোগ। এ রোগের চিকিৎসা হয় না। শুধু কিছু নিবারণমূলক ব্যবস্থা আছে।

বাড়িতে যেন এ সব পত্রিকা আর না রাখা হয়, ঘোষণা করতেই সুমালা খিলখিল করে হেসে উঠল বাব্বা দীপার ওপর এত রাগ? এত টান? মানে?

ঘরের একদিকের একটা জানালা খুলে দিল। এই জানালা থেকে দীপাদের বাড়িটা দেখা যায়। ওর ঘরটাও দেখা যায়। ঘরটা সব সময় অন্ধকার থাকে। মাঝে মাঝে শুধু আলো জ্বলে। সুমালা কেন দীপাদের বাড়ির দিকের জানালা খুলে দিল।

তারপর ঝলমলে হাসি দিয়ে মুখ ভাসিয়ে দিয়ে বলল, কবিতাগুলো পড়লে?

—তুমি পড়েছ? কেমন লেগেছে?

তক্ষুণি হাসি নিবে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ দুটো কোথায় হারিয়ে গেল। অস্ফুট করে বলল, ঐ ছবিগুলোর মতই—একটু বিষাদ-বিষাদ ধরন রয়েছে, বলতে বলতে অ্যালবামটা বার করল। আমার হাতে তুলে দিল। ছবিগুলো হাতে নিলাম। একটা একটা করে দেখতে লাগলাম।

সুমালা, তোমার মুখখানা এমন করুণ আলোয়—এরকম ফটো তুলছে কেন? কোন দোকান থেকে তুলেছ?

দোকান নয় একজন তুলেছে।

কে তুলেছে?

কেমন তুলেছে সেটা বল। ক্যামেরাম্যানকেও কবি বলা যায় তাই না। এক একটা ছবি এমন কায়দায় তোলা ঠিক কবিতার মত বিষণ্ণ লাগে। ফোটোগুলো কে তুলেছে?

আমার কথার জবাব দিল না সুমালা। পত্রিকাগুলো উলটে পালটে দীপার কবিতা বার করল। পড়তে লাগল। একবার শুধু বলল, সব কবি শিল্পী একই টেমপারা মনটের তাই না?

ফটোগুলো কে তুলেছে? আমার গলা ভেঙে পড়ল।

ছিল একজন। চুপি চুপি আমার বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নিত। বলেই সুমালা জানালার দিকে তাকাল। জানালা থেকে দীপার বাড়িটা দেখা যায়। দীপার ঘর অন্ধকার। অন্ধকার ঘরে চুপ করে দীপ বসে আছে হয়ত। সুমালা সেদিকেই তাকিয়ে থাকল। আমার কথার আর জবাব দিল না। ফোটোর সেই করুণ আলোর বিষাদ-বিষাদ হাসি এখন সুমালার ঠোঁটে ফিরে এসেছে। ফটো যে তুলেছে তার কথা ও আর একদম বলছে না। যেই তুলুক সে বোধহয় দীপার চেয়ে আরো অনেক বেশি অন্ধকার ঘরে বসে আছে চুপচাপ, হয়ত নেগেটিভ করার কাজেও মন লাগছে না।

ঘর থেকে এক সময় বেরিয়ে এলাম। বুকের মধ্যে কীরকম একটা ঈর্ষা জ্বলতে লাগল।

সুব্রত সেনগুপ্ত



রাক্ষসী প্রেয়সী

১

সভার কাজ শেষ হলে রাজা নর্তকী রমলার ঘরে ঢুকলেন। সুগঠিত স্তন আর নিতম্বের জন্যে এই নর্তকীকে রাজা সব চাইতে পছন্দ করেন। রাজা ঘরে ঢুকে আসন গ্রহণ করলেন তারপর তাঁর উরুর ওপর বসার জন্য রমলাকে কাছে ডাকলেন। কিন্তু রমলা রাজার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে অল্পদূরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর প্রিয় নর্তকীর কিছু বলার আছে বুঝতে পেরে রাজা উঠে গিয়ে রমলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রথম কাঁধে তারপর তাঁর নরম স্তনে অল্প চাপ দিয়ে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, বল, কি তোমার বলার আছে?

রমলা বলতে লাগলেন, তিনি শুনেছেন, রাজদরবারে বিচারে যারা দোষী সাব্যস্ত হয়, তাদের অধিকাংশের পিঠে চাবুক মেরে শাস্তি দেওয়া হয়। তাঁর খুব জানতে ইচ্ছে করে, চাবুক মারার সময় অপরাধীদের কতোটা কষ্ট হয়। চামড়া মাংস কেটে কেটে চাবুক পড়ার সময় তাদের মনের অবস্থা কি রকম হয়?

রাজা বললেন, তা কি করে সম্ভব!

কেন সম্ভব নয়?

কে তোমাকে সে অবস্থার বর্ণনা দেবে? তাছাড়া অপরাধীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারেও অসুবিধা আছে।

রমলা বললেন, তাদের কথা তো আমি বলিনি।

তবে?

মহারাজ নিশ্চয় একথা মানেন, অনেকেই কষ্ট পান কিন্তু সবাই তা সঠিক প্রকাশ করতে পারবেন না।

রাজা বললেন, তুমি কি বলতে চাইছ, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

রমলা বললেন, আমি চাই এমন একজন স্বেচ্ছায় এই কষ্টভোগ করুন, যিনি তাঁর যন্ত্রণাভোগের কথা এমনভাবে প্রকাশ করতে পারবেন যাতে সেই যন্ত্রণার কিছুটা আমরাও অনুভব করবো।

রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, সে রকম লোক কোথাও পাওয়া যাবেনা, তাছাড়া স্বেচ্ছায় এই কাজে অগ্রসর হবে এরকম কে আছে?

রমলা হেসে বললেন, আছে।

আছে!

হ্যাঁ, আছে।

কে?

তিনি আপনার সভাকবি।

রাজা চমকে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, সে যে রাজি হবে তুমি কি করে জানলে?

রমলা উত্তর দিলেন, মহারাজ, রাগ করবেন না, আপনার সভাকবি অধীনার একজন প্রণয় প্রার্থী। আপনার প্রশ্রয়েই তিনি অগ্রসর হয়েছেন। তিনি বহুবার বলেছেন, তিনি আমার জন্য প্রাণ দিতে পারেন আর এই কাজটা পারবেন না?

রাজা ভাবলেন, কবি তাঁর যতই প্রিয়পাত্র হোক, রমলাকে গোপনে প্রেম নিবেদন করার জন্য তার শাস্তি পাওয়া উচিত। সে শাস্তি এভাবে দিতে পারলে ক্ষতি কি? মুখে বললেন, আমি রাজি আছি। কিন্তু রমলা, একটা সত্যি কথা বলবে?

কি?

তুমি কবিকে ভালোবাসো?

রমলা উত্তর দিলেন, না।

কবি সন্ধ্যাবেলায় নিজের ঘরে শুয়ে কল্পনায় রমলার ঠোঁটে চুমু খাচ্ছিলেন, সেই সময় তাঁকে রাজার আদেশ শোনানো হলো। আদেশ অনুসারে পরপর তিনদিন কবিকে চাবুক মারা হবে। প্রতিদিন চাবুক মারার পর তাঁকে রমলার ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে কবি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলবেন। কবি ভাবতে লাগলেন, হায় রমলা, সংসারে কতো লোকই

তো ভালবাসে, শুধু আমাকে এ নির্যাতন সহ্য করতে হবে কেন? শুধু অপরাধীরাই রাজদরবারে এরকম শাস্তিভোগ করে। আমার অপরাধ কি? কেন আমি শাস্তি পেতে বাধ্য? সে কি রাজার নর্তকীর সঙ্গে প্রেম করার অপরাধে, না কবিতা রচনা করার অপরাধে? আর সব চাইতে আশ্চর্য এ সমস্ত কিছুর পেছনে রমলার হাত আছে! যে রমলা আমার কবিতার বিশেষ অনুরাগিনী। আমার কবিতার অনুরাগিনী কিন্তু আমার অনুরাগিনী নয়।

কবি তাঁর ঘরের বিরাট আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। শরীরের ওপরের অংশ অনাবৃত করে নিজের মোলায়েম চামড়ার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর শরীরের দিকে তিনি যেন এই প্রথম তাকাচ্ছেন। কবি নিজের বুকে কাঁধে হাত বোলাতে লাগলেন। এই শরীরের ওপর চাবুক কেটে কেটে বসবে ভাবতে তাঁর শরীর কয়েকবার কেঁপে উঠলো। পিঠ যেন জ্বালা করতে লাগলো।

প্রথম দিন কবিকে যখন চাবুক মারার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো, কবি বুঝতে পারলেন যন্ত্রণায় চিৎকার করা চলবে না। সমস্ত নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করতে হবে।

যথাসময়ে কবির জামা খুলে উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হলো। এখন শুধু প্রহারের অপেক্ষা।

এখন তাঁর গলাটা কেটে ফেললেও তিনি যেন কিছুই টের পাবেন না কারণ তার সমস্ত অনুভব করার শক্তি পিঠে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। কবির মনে হতে লাগলো, চাবুক পিঠে পড়ার আগেই তাঁর শরীর এবং মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠছে।

হঠাৎ কবির সমস্ত শরীর চমকে উঠলো। কাঁধের কাছে জ্বলে যেতে লাগলো। প্রথম চাবুক পড়লো। তারপর অবিশ্রান্ত চাবুক পড়তে লাগলো।

সন্ধ্যার পর কবিকে যখন রমলার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো রমলা একে একে অন্য সবাইকে বিদায় দিয়ে দিলেন। নিজহাতে কবির শুশ্রূষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর কবি ক্লিষ্ট চোখ খুলে রমলার দিকে তাকালেন।

এখন আমার ভালবাসার ওপর তোমার বিশ্বাস হয়েছে?

রমলা কোনো উত্তর না দিয়ে কবির মাথাটা তুলে তাঁর বুকে চেপে ধরলেন। কবি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে আমি এত ভালবাসি কেন?

রমলা হাসলেন। কবির মাথা কোলের ওপর রেখে নিজের অপূর্ব স্তন দুটো কাঁচুলির বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলেন। রমলার বুকের গন্ধে কবির নেশা ধরে গেলো।

রমলা তখন কবিকে একে একে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, রাজার আদেশ পাওয়ার পর কবির কি মনে হয়েছিলো, তারপর সব ঘটনা একে একে কিভাবে ঘটেছিলো। কবি বলতে লাগলেন, খবর পাওয়ার পর তাঁর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো। চাবুক পড়ার আশঙ্কায় কিভাবে তাঁর গায়ের চামড়া টান টান হয়ে যাচ্ছিলো।

কবির কপালে চুম্বন করে রমলা বললেন, আজ এই পর্যন্ত থাক। কাল আবার শুনবো।

কবি বলতে লাগলেন, আজতো তুমি সবই শুনেছো। আমাকে কাল আবার যেতে হবে কেন? না, কাল আর যাবো না।

কিন্তু রাজার আদেশ যে তাই।

কি আদেশ? রাজার কি আদেশ? তোমার ইচ্ছেই রাজার ইচ্ছে। তুমি চাইলে রাজার অদেশ পাল্টাতে কতোক্ষণ লাগবে?

রমলা উত্তর দিলেন না। কবি বলতে লাগলেন, তুমি কি করে বুঝবে, সে কি রকম যন্ত্রণা। আর আমাকেই বা এই কষ্ট সহ্য করতে হবে কেন? আমার অপরাধ কি?

রমলা বললেন, অপরাধ নয় কবি, তোমার যোগ্যতা। তোমার মতো আর কেউ যন্ত্রণার কথা এভাবে বলতে পারবে না। দুঃখে বা আনন্দে আমাদের হৃদয় এভাবে জাগিয়ে দিতে আর কে পারবে? তুমি জানো আমি তোমার কবিতার কতো অনুরাগিনী।

আমার কবিতার অনুরাগিনী! হায় আমার কবিতা। তুমি আমার কবিতার রাক্ষসী প্রেয়সী। কবিতা আমার রাক্ষসী প্রেয়সী। আমাকে নিয়ে তোমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমার যন্ত্রণা বরণে তোমার কিছু এসে যায় না। বরং আমার যন্ত্রণা তোমার আনন্দের উৎস। ঠিক আছে, চাইনা আমার যশ। আমি আর কবিতা লিখতে চাইনা। আমি ফিরে যাবো।

এখন তুমি আর ফিরতে পারো না।

কেন ফিরতে পারি না? আমার কিসের আকর্ষণ এখানে?

কবিকে জড়িয়ে ধরে রমলা বললেন, এভাবে না এলে তুমি আমার এতো কাছে আর আমি তোমার এতো কাছে আসতে পারতাম কবি?

পরের দিন কবিকে যখন রমলার ঘরে নিয়ে আসা হলো কবি তখন প্রায় অচৈতন্য। রমলা কবিকে সুস্থ করার জন্য নানারকম যত্ন করতে লাগলেন। অগুরু চন্দন আর ধূপের গন্ধে ঘর ভরে গেছে। নূপুরের শব্দে ঘর মুখর হয়ে উঠলো। কবির ঘোলাটে দৃষ্টির সামনে রমলা তাঁর সুন্দর শরীর নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলেন। একে একে খসে পড়তে লাগলো গাত্র আবরণ।

তৃতীয় দিন আবার কবির দেহ রমলার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। আজ শেষ দিন। সেজন্য অন্যান্য অনেক নারী পুরুষ কবির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সবাই কৌতূহলী এবং আগ্রহী। রমলার পরনে আজ আর নর্তকীর পোশাক নয়। নতুন সজ্জায় তাঁর মুখখানা ভারি কোমল দেখাচ্ছে।

এদিকে কবিকে আনার পর দলে দলে কবিতা-প্রেমিক রমলার ঘরে ঢুকতে লাগলো। কবি রমলার বিছানার ওপর শুয়ে আছেন। নানারকম কাপড়ে মুখ বাদে তাঁর ক্ষত বিক্ষত শরীর ঢাকা। চোখ দু'টো বোজা। চোখের কোণে জল শুকিয়ে উঠেছে।

সবাই উৎসুক হলো কবির যন্ত্রণা ক্লিষ্ট মুখ দেখতে। হঠাৎ একজন চিৎকার করে উঠলো, কবি নেই।

শৈবাল মিত্র



পোকা

শেষ বিকেলের আলোয় লাল মাটির তৈরী এই ছোট প্ল্যাটফর্ম, দু'পাশের ফসল ভর্তি মাঠ আর ঘর মুখো একদল হরিয়ালকে দেখে বিজয়ার মুখ আমার মনে আসে। সুন্দর কিছুকে একা ভোগ করতে কষ্ট হয়।

ট্রেনটার অবশ্য এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানোর কথা নয়। হয়তো সিগন্যাল পায় নি। হয়তো ইঞ্জিনে কোনো গণ্ডগোল।

প্ল্যাটফর্মটা ফাঁকা! ফেরিওলা নেই, মানুষজন নেই। একটা শাল-পাতার ঠোঙা হাওয়ায় উড়ে গেল। মাটি, গাছপালার রঙ দেখে বোঝা যায় ট্রেণ আর কিছুক্ষণের মধ্যে বাংলা ছেড়ে উড়িষ্যায় ঢুকবে।

শেষ শরত। হাওয়ায় সিরসির ভাব। আকাশের রঙে ভেজাল নেই। ধানের গোছাগুলো মুটিয়েছে। খড়ে সোনালী আভা। আদিগন্ত মাঠে মাতৃত্বের লক্ষণ!

অথচ উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশের ফসলে পোকা ধরেছে। হাজার হাজার একর চাষ বিপন্ন। এখনি ওষুধ দরকার। তা না হলে তুষ হয়ে যাবে দুধভর্তি দানাগুলো। খড়ের ঝাড় ফ্যারফেরে উলুখাগড়ার চেহারা নেবে। আরো বিপদ আছে। মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যার পোকা দিনরাত হাওয়ার স্রোতে ভেসে আসবে! সীমানা পেরোবে। এই চত্বরের ফসলও বরবাদ করবে। কেউ আটকাতে পারে না। ওদের ট্রেণ, টিকিট, কিছুই লাগে না। গার্ড, চেকারের কাঁধ চেপেও আসতে পারে। লাল আলোয় এখন ঝলমল করছে মাঠ, ধানের শীষ। এদের বাঁচাতে হবে।

কাল বিকেলে জরুরী টেলিগ্রাম এসেছে অফিসে। রৌরকেল্লা, রায়পুর, বিলাসপুরের ডিলাররা একযোগে সেটা পাঠিয়েছে। ফসল বিপন্ন ওষুধ

পাঠান। সেলস্ এর ডেপুটি ম্যানেজার মিঃ দস্তর চিঠিটা মুখের সামনে ধরে বসেছিলো। চোখে মোটা কাঁচের চশমা। চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়েছে।

'কালই ষ্টার্ট করো—দস্তর বললো।'

আমি জানতুম এটা হবে। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ আমার ভাগে পড়েছে। বছরে দু'তিনটে ট্যুর করতেই হয়। জরুরী ডাক এলে দু'একটা বাড়ে। দস্তর সাহেবের কপালের রেখাগুলো জেগে থাকে।

টেলিগ্রামটা এগিয়ে দেয় আমাকে। 'কিছু সন্দেহ হয়—জিজ্ঞেস করে।'

'হ্যাঁ স্যার।'

'অমানুষ পশু—দস্তর বিড়বিড় করে—দেশটাকে শুষে খাচ্ছে।'

আমি চুপচাপ বসে থাকি। ঠাণ্ডা ঘর। যন্ত্রের রিনরিন একটানা শব্দ! জানলার বন্ধ কাঁচের ওপাশে নীল আকাশ। নীচে সবুজ মাঠ। একপাল ভেড়া। হলুদ আইসক্রীমের বাক্স নিয়ে কখনো মাঝ মাঠে দাঁড়িয়ে থাকে এক আইসক্রীমওয়ালা। গায়ে লাল কুর্তা। ওই ডিলারগুলোকে তাড়ানো দরকার—দস্তর গুমরোয়।

আমার কিছু বলার নেই। ডিলারদের বিরুদ্ধে প্রথম রিপোর্ট আমি করেছিলুম। তারপর আরো বারচারেক কথাটা তুলেছি কোম্পানীর উঁচু-তলায়। কাজ হয়নি! তাপারিয়া, গোয়েঙ্কা, পানিগ্রাহীরা আমার থেকে অনেক ক্ষমতাওয়ালা, প্রভাবশালী। পোকা মারার ওষুধের ওরা একচেটিয়া কারবারী। বছরে বহু লাখ টাকা কোম্পানীকে দেয়। গুদোমে মাল ফেলে রাখে। বেচে না। জলা ক্ষেত, নষ্ট ফসল আর আকালে ওদের লাভ বেশী। ওষুধের ব্যবসার চেয়ে মহাজনী ঢের রসালো। অনেক সময় পোকায় সব ছারখার করার পর ওরা ওষুধ চেয়ে পাঠায়। কোম্পানীর নানা ঢিমে তালের ব্যাপার আছে। দু'পাঁচদিন দেরি হয়। ওষুধ পৌছোয়। তখন মাঠের পর মাঠ সাবাড় হয়ে গেছে। ওরা তড়পায়। গরীব মানুষের হয়ে সাফাই গায়। কিন্তু ওদের চোখ দেখে বুঝি, আনন্দে ফেটে পড়ছে। সামান্য অভিযোগের পর ওরা আমাকে খুব খাতির করে। ভালোমন্দ খাওয়ায়। বেড়াতে গাড়ি দেয়। নানারকম ইসারা ইঙ্গিত করে।

ট্রেণটার নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ নেই। চায়ের নেশা চাপে। কিন্তু একটা চাওয়ালা চোখে পড়ে না। মাথার ওপর বাঙ্কে আমার সুটকেশ।

তার মধ্যে আমার জামাকাপড়। বিষের নমুনা প্যাকেট। ওষুধের দু'টো পেটি কাল ট্রেনে পাঠানো হয়েছে। আগামী কাল বা পরশু একটা রৌরকেল্লা পৌঁছোবে। আর একটা যাবে রায়পুর। খুব নিয়ম মাফিক কাজ সারি আজকাল। অফিস আর ডিলারদের কাউকেই বুঝতে পারি না। তাপা-রিয়াদের বিরুদ্ধে রাগটা ভোঁতা হয়ে গেছে। অফিসে অভিযোগ দায়ের করার ইচ্ছেটাও নেই।

লাইন ধরে দু'চারজন পুলিশ ইঞ্জিনের দিকে এগোচ্ছো। কেউ কাটা পডলো নাকি? কামরার সামনে প্ল্যাটফর্মের ওপর ভারী জুতোর শব্দ। আমি গ্রাহ্য করি না। সহযাত্রীদের অনেকে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছে। মাঝে মাঝে সিগন্যাল পোস্টের দিকে তাকাচ্ছে। কি একটা পাখী টিট্রি টিট্রি আওয়াজ করে উড়ে গেল। আগামীকাল বিজয়ার জন্মদিন। গত চার বছর এই দিনটা আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। ওর সঙ্গে আলাপের এটা পঞ্চম বছর।

এইবারেই ফাঁক পডলো। সামনে ওর এম. এ. পরীক্ষা। সেটা চুকলে বিয়ে করবো। বিজয়ার ফর্সা ধারালো চেহারাটা এই খোলা মাঠে আকাশের নীচে দাঁড় করিয়ে বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে।

কামরার মধ্যে হঠাৎ ভারী বুটের শব্দ হয়। চমকে যাই। আমাদের কামরাটা পুলিস ঘিরে ফেলেছে। পাশাপাশি তারা দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখতে পাই না। হলুদ উর্দি ঢাকা কোমর, বুট আর চকচকে বেয়নেটের ফলা জানলা দিয়ে চোখে পড়ে। দু'জন অফিসার গোছের লোক এগিয়ে আসে। আমার সামনে দাঁড়ায়। সাধারণ পোষাকপরা। ওদের পেছনে জনা দশেক উর্দিপরা রাইফেলধারী। লম্বা চাওড়া একজন হঠাৎ একটা রিভলভার আমার কপালের দিকে তুলে ধরে। চীৎকার করে—হ্যাণ্ডস্ আপ।

প্রথমটা আমি বুঝতে পারি না। থতমত খাই। লোকটা আরো দু'পা এগিয়ে আসে। আমার কপালে কালো নলটা চেপে ধরে। একটা ঠাণ্ডা, হিলহিলে অনুভূতি আমার শরীরে ছড়িয়ে যায়। লোকটা আবার গর্জে ওঠে—হ্যাণ্ডস্ আপ। জানালা দিয়ে হালকা লাল আলো এসে ঢুকেছে। লোকটার রিভলভারটা লালচে দেখায়। এর পরণে প্যাণ্ট। বুশ সার্ট। চকচকে টেরিকাটা চুল। তেলতেলে মুখ। চোখের নীচে মাংসের

ভুমো। মোটা ঠোঁট। নীচের ঠোঁটটা একটু ঝোলা। দেখে বোঝা যায় কামুক, মেয়েদের চিবিয়ে চিবিয়ে পরখ করে।

দুটো হাত আস্তে আস্তে মাথার ওপর তুলি। কামরার মধ্যে থমথমে ভারী আবহাওয়া। কেউ সাড়া শব্দ করছে না।

চমকের ধাক্কাটা থিতোলে জিজ্ঞেস করি, কি ব্যাপার?

দ্বিতীয় অফিসারটি এগিয়ে আসে। খেঁচুরে রোগা চেহারা। ক্ষুদে চোখ। খাড়াখাড়া চুল। হাতের সবুজ শিরাগুলো চনচন করছে। গিরগিটির মতো চোখের দৃষ্টি। সে তাকায় আমার দিকে। বলে বানচোত। ন্যাকা…।

এ লোকটার জামাকাপড় থেকে একটা আঠালো পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। রাতজাগা, বজ্জাতির গন্ধ।

কি দেখছিলে—লোকটা জিজ্ঞেস করে।

আমার মাথার ওপর হাত তোলা। অস্বস্তিতে গলা শুকনো। বলি, চাষ আবাদ ফসল।

রোগা আর মোটা চোখাচোখি করে। ওদের মুখ আরো ভয়ংকর হয়। রোগার চোখ ঘুরতে থাকে। মোটার ঠোঁট আরো ঝুলে পড়ে।

'কি বুঝলে—ট্যারচা গলায় মোটা জানতে চায়।

'আপাততঃ ভালো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্বলে যেতে পারে।'

আমার কথা শেষ হওয়ায় আগেই রোগাটা লাফিয়ে ওঠে—শালা, বদমাস, তাহলে তোমাদের খুব সুবিধে? তাই না?

এদের এই বাজে আচরণ, খিস্তি, এতো সব প্রশ্নের কারণ আমি ধরতে পারি না। সবটাই মনে হয় জটিল এক ধাঁধা। তবু সেলসম্যানের চাকরী করি। বড়ো, নামজাদা কোম্পানী। কথার জবাব দেওয়াতে পাকা।

বলি, সুবিধে তো বটেই। ওটা আমাদের লাইন। তবে অকাল আমরা রুখতে চাই। মেহনতের ফসল গরীব মানুষ ঘরে তুলুক।

মোটা অফিসার এবার বাজের মতো ফেটে পড়ে—শালা আমাদের সামনেও রাজনীতি ঝাড়ছে। ওঠো, চলো আমাদের সঙ্গে।

রাজনীতি শব্দটা বরফের তীর হয়ে আমার মাথায় বেঁধে। একদল শালিক জানালার বাইরে ঘাসের ওপর কলরব করছে রাজনীতি, রাজনীতি, রাজনীতি। আমার গোটা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বুঝতে পারি, কিছু একটা ভুল হয়েছে। ফাঁদে পড়েছি।

'আপনারা ভুল করছেন—আমি করুণ গলায় বলি। মাথার ওপর দু'টো হাত টনটন করছে। রোগা মোটা পরস্পরের দিকে তাকায়।

রোগা বলে—কি নাম?

অবনী রায়।

মোটা হ্যাঃ হ্যাঃ হাসে।

এ নামটা আবার কবে হলো—রোগা লোকটা সেই পচা গন্ধটা হাওয়ায় ছড়িয়ে দেয়—শিবেন বসু, হাসান আলি, মণ্টু দাস এই তিন'টেই তো জানতুম।

তোদের বাবা ক'টা—রিভলভারের নলটা দিয়ে মোটা আমার মুখে সুড়সুড়ি দেয়।

ট্রেণের প্রায় সব যাত্রী তখন কামরার সামনে ভীড় করেছে। মজা দেখছে। একজন জিগ্যেস করলে—কি ব্যাপার মশায়? জবাব দিলো না কেউ।

বিরক্ত চোখে সকলে প্রশ্নকর্তাকে দেখলো।

একজন রাইফেলধারী বন্দুকের কুঁদো উঁচিয়ে দরজার ভীড় হটাচ্ছে।

ভাগ ভাগ।

শালারা লাটের বাঁট হে একজন খিস্তি ঝাড়লো।

আগে পেছনে পুলিস নিয়ে প্ল্যাটফর্মের লাল মাটির ওপর এসে দাঁড়ালুম। একজন সিপাই-এর হাতে আমার সুটকেশ। অফিসার দু'জন এর মধ্যে বার কয়েক নিজেদের নাম ধরে ডাকাডাকি করেছে। মোটার নাম গুরুপদ। রোগাকে ডাকছে দস্তিদার বলে।

রোগা লোকটা আমার গায়ের সঙ্গে ঘেঁষে আছে। অথচ আমি ওকে এড়াতে চাইছি। কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞেস করলুম।

থানায়।

প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে আমরা রাস্তায় এসে নামলুম। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। অনেকদূরে কালচে সবুজ অন্ধকার। ওখানে গ্রাম। হাওয়ার ফলন্ত খেতের ভারী শরীরে ঢেউ ওঠে।

'সখ সৌখিনতার জন্যে মারা পড়লে--দস্তিদার বলে—এই বাহারে দাড়ি কাল হলো।'

ছুঁচোলো চিবুকে ট্রিম করা ঘন দাড়িতে হাত বোলাই। পুরো

ব্যাপারটা এখনো রহস্যময়, ধোঁয়াটে। রোগা লোকটা আবার বলে—বুঝলে শিবেনবাবু, বিপ্লব করা অতো সোজা নয়। অনেক কিছু ছাড়তে হয়। তুমি এই ফালতু দাড়ির মায়া কাটাতে পারলে না। ছোঃ।

আমি সাড়া করি না। আমার মাথায় তখন অনেক চক্কর।

আমার, পরিষ্কার, সাদা মুখ, ছুঁচোলো চেয়ালে সাধ করে দাড়ি রাখিনি। একটা ঘটনায় ভয় পেয়েছিলুম। সেই শুরু। বিজয়া রাগ করেছে, বারবার বলেছে দাড়ি কামাতে। শুনি নি। আমার থুঁতনিটা ওর আদর করার প্রিয় জায়গা। দাড়ি থাকতে এখন অসুবিধে হয়।

মেঠো পথ ছেড়ে আমরা পীচের রাস্তায় উঠি। একজন গেঁয়ো লোক আসছিল। হাতে একজোড়া মুরগী। এতো পুলিস দেখে সে ভয় পায়। রোগা, কালো, শুকনো চেহারা। রাস্তা ছেড়ে সে তাড়াতাড়ি ধান ক্ষেতে নেমে পড়ে। গুরুপদ জিজ্ঞেস করে—কোথা থেকে?

'এঁজ্ঞে হাটে গিয়েছিলুম। মুরগী বেচতে।'

'আমায় দে। কাল দাম নিবি।'

লোকটা মুরগী জোড়াটা ধানক্ষেতের মধ্যে লুকোতে চাইছিলো। হলো না। কাঁপতে কাঁপতে পাখিদুটো সে গুরুপদর হাতে দিল।

গুরুপদ নীচু গলায় দফাদারকে বললো—চাটের ব্যবস্থা হলো।

পেছন ফিরে তাকাই। লোকটা রাস্তার শেষ সীমায় একটা কালো পোকার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে।

এতোক্ষণে আমার সত্যিকার ভয় করে। গা ছমছমানি, শীত শীত ভাব। কিছু একটা বলার জন্যে গলা উশখুশ করে। সামনে পেছনে বুটপরা, ভারী পায়ের শব্দ। আলোর লালচে রঙটা মিইয়ে যাচ্ছে। রাস্তার ধারে পুঁটলি পাকিয়ে দু'টো লোক বসে আছে। ধানক্ষেতের দিকে তাদের চোখ।

কি করছিস এখানে—গুরুপদ জিজ্ঞেস করে।

ওরা ঘাড় তোলে। বিষণ্ণ ফ্যাকাসে চোখ। একজন বলে—বড়ো বিপদ। ধান পাতায় সাদা আঁশ ফুটেছে। পোকা লেগেছে।

আমি ওদের চোখ লক্ষ্য করে মাঠের দিকে তাকাই। সবুজ শীষে পাতলা সাদা সর এখনো স্পষ্ট নয়। খোলা চোখে ধরা যাবে না। আমি বুঝতে পারি।

জিজ্ঞেস করি, মাজরা পোকা?

হ্যাঁ বাবু। সে রকমই মনে লাগে—একজন বলে।

ডেমিক্রন স্প্রে করো।

গুরুপদ খেঁকিয়ে ওঠে—চলো। চলো।

দফাদার আমার ঘাড়ে হাত দেয়।

আমার গলায় কাছে জমে থাকা কথার স্তূপে ঢল নামে। বলি—প্লীজ, ছেড়ে দিন আমাকে। ভয়ানক বিপদ। তিন চারটে এলাকার মাঠ উজাড় হয়ে যাবে। আমি পোকা মারার ওষুধ বিক্রী করি। কোম্পানীর নাম বলি। পরিচয় পত্র আছে, সে কথা জানাই।

'ওরা পাত্তা দেয় না! দফাদার বলে সব দেখবো। আগে থানায় চলো।'

অস্বতি বাড়ে। দাড়িতে হাত ঘসি। এই দাড়িটাই ফাঁদে ফেলছে। মাস দুয়েক আগের কথা। বোধহয় মার্চ কিংবা এপ্রিল মাস। মাথার ওপর সূর্য। ঠা ঠা রোদ। ভরদুপুরে মিউজিয়ামের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলুম। অফিসে একবার ঢুঁ দিয়ে বাড়ী ফিরবো।

সাত সকালে বেরিয়েছি। অফিসের কাজে। জামা ট্রাউজার্স ভিজে সপসপ করছে। মুখে চটচটে ধুলো। হঠাৎ ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিস অফিসারের মুখোমুখি। আমাকে একপলক সে দেখল। 'কবে বেরোলি জেল থেকে—জিজ্ঞেস করলো।'

আমি অবাক। রাগও হলো। কিন্তু যুৎসই একটা জবাব সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এলো না। এরকম হয়। পোকামারার বিষ নিয়ে ডিলার এজেন্টদের সঙ্গে অনর্গল কথা বলতে পারি। ওটা আমার নিজের বিষয়। তখন আমার কথায় ভয়ানক দাপট আর ধার। অন্য প্রসঙ্গে থিতিয়ে যাই। বুদ্ধি বেইমানি করে।

অফিসার আমার দিকে কড়া চোখে তাকায়। বলে—এই চত্বরে গাড়ী লোপাট হলে মাজা ভেঙ্গে দেবো।

আমার মাথায় রাগ চড়ে। জবাব দিই—কি আজেবাজে বকছেন? লোকটা ঠাণ্ডা চোখে আমাকে দেখে। আমার বুক কাঁপে। নীচু গলায় বলি—ভুল করছেন আপনি।

অফিসার কথা বাড়ায় না। চলে যায়। কিন্তু সেই দুটো ঠাণ্ডা চোখ আমার বুকের মধ্যে চেপে বসে থাকে। বাড়ী ফিরে অনেকক্ষণ হাপুস হুপুস

চান করি। তারপর আয়নায় নিজের মুখ দেখি। আমার চেহারা ভালো। মুখশ্রী সুন্দর। পাঁচজনে বলে। আমার মতো দেখতে একটা চোর আছে। সে মোটরগাড়ী চুরি করে বেড়ায়। বুকচাপা আতঙ্ক আর অস্বস্তিতে সারা বিকেল ছটফট করি। মুখটাকে বদলানো দরকার। সেই থেকে দাড়ি রাখছি। নিজেরও ভালো লাগে না। অফিসে ওপরওয়ালারা অখুশি, মাঝে মাঝে কুটকুটুনি। বিজয়া প্রায়ই ঠাট্টা করে, উকুন হলে মজা বুঝবে। সে ভয় আমারও। তবু হাসার চেষ্টা করি। বলি উকুন মারার ওষুধ আমার জানা আছে।

একজন সিপাই গুরুপদর মুরগী দু'টো বইছে। একটা হঠাৎ ডেকে ওঠে। ডানা ঝাপটায়। সিপাইটা ঠাস করে মুরগীর পেটে চড় মারে। সেটা অদ্ভুতভাবে ককিয়ে ওঠে।

দস্তিদার আমার কাঁধে হাত রেখেছে। গন্ধে গা গুলোয়, পেট পাক খায়। সে আমার কানের কাছে মুখে নিয়ে বলে—বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান। আমি লোকটার দিকে তাকাই। গুরুপদ বলে—'ব্যাণ্ডেলের বাড়ীটা থেকে তুমি পালালে কি করে? বেলেঘাটায় চোখে ধুলো দেওয়ার রহস্যটা আমরা ধরেছি। খাটা পায়খানা দিয়ে কেটেছিলে।' দস্তিদার জিজ্ঞেস করে—জগদীশ কোথায়?

আমি অবাক হই। কিছু বলার নেই। দস্তিদারের নাকের ডগা লাল হয়। 'বলবে বলবে। থানায় চলো সব বলবে।'

থানার কাছে পৌঁছই। আরো অনেক পুলিস, লোকজন। সাদা পোষাকের একজন ছুটে আসে। দস্তিদারকে বলে—স্যার জগদীশ আর সর্বেশ্বরকে ধরেছি। লক্ আপে আছে।

দস্তিদারের সাপের মতো চোখ ঝিলিক দেয়। গুরুপদ বলে—সাব্বাস।

বেশ কিছু আগে সূর্য ডুবেছে। অথচ গাছের পাতায় ধানের ক্ষেতে ছড়িয়ে থাকা আলো নেভে নি। চারপাশ এখনও পরিষ্কার দেখা যায়। অনেক দূরে কুবকুব করে একটা ডাহুক ডাকে।

তারপর শিবেনবাবু ওরফে হাসান আলি ওরফে মণ্টু দাস ওরফে অবনী রায়···

গুরুপদ কথা কেড়ে নেয়—ওরফে শুয়োরের বাচ্চা—

দস্তিদার শেষ করে—কোথায় যাচ্ছিলে?

আমি ককিয়ে উঠি, বিশ্বাস করুন, আপনারা যা ভেবেছেন ঠিক নয়। আমি সত্যিকার অবনী রায়। কোম্পানীর কাজে রৌরকেল্লা, রায়পুর যাচ্ছি। আমায় ছেড়ে দিন।

আইডেনটিটি কার্ড দেখি। গুরুপদ হাত বাড়ায়। ঘরের মধ্যে আবছা আলোয় গুরুপদর লোমওলা কালো হাতটা ভয়ানক দেখায়।

কোম্পানীর ছাপ দেওয়া একটুকরো পরিচয় পত্র মাণিব্যাগে আছে। তাতে আমার ছবি লাগানো। পকেট থেকে ব্যাগটা বার করি। তিনটে খাপ তন্নতন্ন খুঁজি। সেটা নেই। নিশ্চয়ই বাড়ীতে ড্রয়ারের মধ্যে আছে। ব্যাগের মধ্যে বিজয়ার ছবি। জলজ্বলে চোখ। ঠোঁট টেপা হাসি। বুকের ওপর বিনুনি। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। আমার কপাল ঘেমে ওঠে। ধকধক করে বুক।

কোথায়—দস্তিদার জিজ্ঞেস করে।

হ্যা·· হ্যা·· হ্যা···গুরুপদ হাসিতে ফেটে পড়ে—শালা ধড়িবাজ।

দস্তিদার চেরা গলায় বলে—শুধু ধড়িবাজ নয় মাগীবাজ। দস্তিদারের হাতে আমার মানিব্যাগ। বিজয়ার ছবিটা ও দেখছে। বিজয়া হাসছে।

এটা কে?—গুরুপদ জিজ্ঞেস করে। বিজয়ার বুকে ওর হাত।

আমার বান্ধবী। ঝাপসা গলায় বলি।

বান্ধবী। বাঃ বাঃ তোফা। নাম কি?

বিজয়া।

কি—দস্তিদার শুনতে না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করে।

আমি বলি।

'মেজারমেণ্ট কতো। —গুরুপদ জানতে চায়।'

প্রথমটা বুঝতে পারি না। গুরুপদ আবার জিজ্ঞেস করে—বুক, কোমর, পাছার মাপ কতো?

আমার মাথা ঝনঝন করে। কানের চারপাশে বুক, কোমর, পাছা. দুলতে থাকে।

শালা ন্যাকা। —দস্তিদার খিঁচোয়—রাজনীতির নাম করে মেয়েটাকে তো ঝরঝরে করে দিয়েছো।

কবার গর্ভপাত করিয়েছো। —গুরুপদ জিজ্ঞেস করে।

দস্তিদার আমার পাশে সেঁটে বসেছে। সেই পচা গন্ধটায় আমার নিঃশ্বাস

বন্ধ হওয়ার অবস্থা। গর্ভপাত, গর্ভপাত, গর্ভপাত—আমি নিজের মনে কথাটা আওড়াতে থাকি।

জানলার ওপাশে দিগন্ত ছোঁয়া ধানের মাঠ। লক্ষ লক্ষ তাজা রুপোলি হাত আকাশের দিকে মুঠো দোলাচ্ছে। সারাদিনের রোদ আলো এখনো তাদের শরীরে মাখামাখি। পাতায় পাতায় রঙের ফুলকি লাফিয়ে বেড়ায়। এই সব যুবতী গাছগুলো সাবাড় হয়ে যাবে। মৃত্যু ঢুকেছে। মাজরা পোকা। লেদা পোকা। কোলকাতায় আমাদের গুদোমে পেটি পেটি পোকামারার ওষুধ আছে। এই ট্যুর সেরে ফেরার পথে এখানে নামবো একবার। কথা বলবো এখানকার এজেন্টদের সঙ্গে। অনেক খাটুনির ফসল। বাঁচানো দরকার।

এই চিন্তাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে এদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার এক তীব্র আকুলতা বুকের মধ্যে ছটফট করে।

আমাদের ছেড়ে দিন। আমার অনেক কাজ। ভেঙ্গে পড়া ভঙ্গীতে কথাগুলো বলি।

ওরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। বাইরে ভারী বুটের একঘেযে শব্দ।

আমি খানিকটা সাহস ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করি। বলি—'আমার স্যুটকেশটা দিন। প্রমাণ হবে আমি কে, আমার কি পরিচয়।'

স্যুটকেশে কি আছে দস্তিদার জিজ্ঞেস করে।

জামাকাপড়। কোম্পানীর কাগজ আর বিষ।

বিষ। দু'জনে একসঙ্গে আঁতকে ওঠে। বিষ বিষ বিষ। নীরবতা চৌচির হয়।

বাইরে একটা মুরগী ধারালো গলায় আর্তনাদ করে। তাকাই। দরজার ঠিক ওপাশে একজন সিপাই। হাতে ঝকঝকে লম্বা ছুরি। মুরগীর মাথাটা গলা থেকে ঝুলছে, যেন একটা লাল ঝুমকো ফুল। গলগলিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। স্কন্ধকাটা মুরগীটা তার হাতের মুঠোয় কাঁপছে। পাশে আর একটা মুরগী। দু'টো ঠ্যাং কলাগাছের ছড়ে বাঁধা। অবাক চোখে সে দেখছে। কিছুটা দূরে পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে বসে আছে একটা কুকুর। হলুদ, সাদা রঙ, ল্যাজ নাড়ছে। ধুলো উড়ছে।

পাশের ঘর থেকে কে যেন যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো। শালা শুয়োরের বাচ্চা। খানকির ছেলে। তারপর মারের আওয়াজ আর ক্রমাগত গোঙানি।

আমার শরীর ঘামে ভিজে। পাশের ঘরে গলার আওয়াজ, ভীতি প্রদর্শন। ঠিকানা চাই। বলতেই হবে। আমরা ঠিক জানতে পারবো। ঠিকানা বল।

আমার স্নায়ুতে, মজ্জায় এক অসম্ভব কাঁপুনি। বাইরে থেকে হয়তো বোঝা যায় না। অথচ ভেতরটা তছনছ হয়।

গুরুপদ আর দস্তিদার এখন চিংড়ি মাছের বাজার দর নিয়ে কথা বলছে। শেষ কোন নেমন্তন্ন বাড়ীতে সাতাশটা এক বিঘৎ লম্বা লবস্টার খেয়েছে, গুরুপদ তার স্মৃতি রোমন্থন করছিল। পাশের ঘর থেকে একটা ট্যারা, লম্বা লোক এসে এর মধ্যে বার-দু'য়েক গুরুপদর কানে কানে কথা বলেছে। লোকটা যেন সাক্ষাৎ জহ্লাদ। দেখে মনে হয় মানুষের ঘিলু মেখে ভাত খায়। আমাকে খরচোখে দেখে। লোকটার চোখের মনিটা লাল।

লোকটা তৃতীয়বার ঘরে ঢুকলো। হারামির বাচ্চা ওই জগদীশটার জন্যে হচ্ছে না। সর্বেশ্বরকে কায়দা করতে আর দশ মিনিট—সে বলে—ওরা এখনো জানে না, ওদের এক নম্বর নেতা এই ঘরে বসে আছে। লোকটা একটা সিগারেট ধরায়। বলে সর্বেশ্বর অজ্ঞান। দু'বার হলো। জ্ঞান ফিরলে এ ঘরে ওদের একবার আনবো।

হারকিউলিসের বোতলটা কোথায়—গুরুপদ জিজ্ঞেস করে।

আমার ড্রয়ারে। লোকটা পাশের ঘরে চলে যায়।

নিতাই শালা আজ খুব টানবে—গুরুপদ বলে। লোকটার নাম নিতাই। পাশের ঘরে আবার খানিকটা কাতরানি, খিস্তি, পেটানোর আওয়াজ। আমাকে নিয়ে এরা কি করবে ভেবে পাই না। একটা অচেনা ভয় পাকে পাকে আমাকে জড়িয়ে ধরে। চেলাদের যদি এই অবস্থা হয়, নেতার কি হাল হবে। তখনি আমার মনে পড়ে কাগজের কিছু টুকরো খবর, ছবি। বন্যায় অজ্ঞাত পরিচয় লাস। মাঠ ময়দানে মুণ্ডুহীন দেহ। মাটির তলায় কঙ্কাল সাদা হাড়।

নিতাই ঘরে ঢোকে। বাঁ চোখের লাল মনিটা টসটস্ করে। দস্তি-দারকে বলে—ঠিকানাটা দরকার। পেতেই হবে। আরো জনা দুই রুই কাতলা ওখানে আছে। 'যাবো নাকি' গুরুপদ জানতে চায়।

নিতাই বলে—না। এখনি সাহেবের ফোন আসবে। তোমরা এখানে থাকো।

গুরুপদ আর দস্তিদার আলোচনা করছে পুরোনো দিনের কথা। বাড়ীতে একটা পঞ্চাশ বছরের আধবুড়ি ঝি ছিল। গুরুপদ তার বুকে কামড়ে দিয়েছিল। বুড়িটা তারপর রোজ রাতে ওর কামড় খেতে আসতো। গল্পটা শেষ করে গুরুপদ হ্যাঃ-হ্যাঃ হাসে।

আমার মাথায় চিন্তা গুলি লাফ খায়। অফিসে একটা খবর গেলে আমি বেঁচে যেতুম। বাঁচতুম কি! একটা দুপুরের ঘটনা মনে পড়ে। বিজয়ার এক মামাতো ভাই, নাম অমিতাভ। আসতো আমার অফিসে। কি যেন পার্টি করে। চাঁদা নিত। এ্যাকাউণ্টসের দাশ দেখেছিল একদিন। ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে ছিল। অমিতাভ চলে গেলে জিজ্ঞেস করেছিল, ওকে চেনেন? ভয়ংকর ছেলে। সেই থেকে দাশ এড়িয়ে চলে আমাকে। অফিসের আরো দু' পাঁচজনকে হয়তো বলেছিল। বিজয়ার মুখ চেয়ে অমিতাভকে না করিনি। অবশ্য কয়েক মাস অমিতাভ বে পাত্তা। আমার এই গ্রেপ্তারের একটা যোগসাজস খাড়া করার অসুবিধে নেই। বড়ো অসহায় বোধ করি।

ঘরটা এখন অন্ধকার। বাইরের আলো, রঙ নিভে গেছে। চারপাশে হাওয়ার সিরসির শব্দ। আকাশে গুটি কয়েক তারা জেগেছে।

পাশের ঘরে গলার শব্দ। প্যাণ্ট খুলে দে না। ওরকম রক্ত একটু বেরোয়। মুখে জল ঢাল্।

'দারুণ ছবি'—গুরুপদ বলে—মাগীর বুকটা কি! উফ্।

'আমাদের দেশে ওরকম সিনেমা হয় না'—সায় দেয় দস্তিদার।

ওরা একটা ইংরেজি ফিল্ম নিয়ে আলোচনা করছিল।

কি হে শিবেনবাবু, দেখেছো ছবিটা—জিজ্ঞেস করে গুরুপদ।

আমাকেই জিজ্ঞেস করছে। আমার নাম এখন শিবেন ওরফে আরো কতো কি! ঘাড় নাড়ি। দেখেছি।

'হট। শরীরের রস টেনে বার করে আনে'—গুরুপদ বলে। তার মোটা ঠোঁট গলে যায়। লালা জবজবে।

শেষ দৃশ্যটা কাপড় ভিজিয়ে দেয়—যোগ করে দস্তিদার। ওরা আমার দিকে তাকায়। মতামত জানতে চায়।

'শেষ দৃশ্যটা দেখি নি'—আমি বলি।

কেন? কেন? দু'জনে প্রশ্ন করে।

বমি পেয়েছিল।

ওদের মুখ গম্ভীর হয়। থমথম করে। দস্তিদারের জামা কাপড় ভিজে সপসপে। গন্ধে হাওয়া ঘুলিয়ে ওঠে। আমি বিপদে পড়ি।

'আসলে সিনেমা হলে ঢোকার মুখে এক বোতল দুধ খেয়েছিলুম। বোতলটা শেষ করার মুখে দেখি একটা মরা মাছি। মাছিটা গলে গিয়েছিল। খুব খারাপ লাগছিল শরীর। একটা পান খেয়ে ঢুকেছিলুম সিনেমায়। কিন্তু শেষের দিকে বেগটা সামলাতে পারছিলুম না।'

ওরা নড়েচড়ে বসে। পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। সামনে উঠোনেও একটা অল্প শক্তির আলো। এই ঘরের ভেতরে ফ্যাকাসে অন্ধকার। উঠোনের শেষে গোটা তিন-চার ঝাঁকড়া গাছ। অন্ধকারে ডালপাতায় জড়াজড়ি।

বমি হলো—গুরুপদ জিজ্ঞেস করে।

সামান্য।

তুমি শালা পোয়াতি প্রেগনান্ট। পেটটা দেখি। গুরুপদর লোমশ, কালো হাতটা আমার দিকে এগোয়। বুড়ো আঙুলে পেটে খোঁচা দেয়। জিজ্ঞেস করে—ক'মাস?

আমার কথা আটকে গেছে। গলা থেকে কোঁক করে একটা আওয়াজ বেরোয়।

কোন কোম্পানীর দুধ—দস্তিদার জানতে চায়।

বেলগাছিয়ার। সরকারী দুধ।

দু'জনে হঠাৎ পাথর হয়ে যায়। দস্তিদারের ভিজে জামাকাপড় থেকে সেই নোংরা গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ে। গুরুপদ ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে। ঘরের মধ্যে বোম ফাটার অবস্থা।

কতো রকমের অন্তর্ঘাত হয় দেখো। দস্তিদার কথাটা বলে। গুরুপদ দাঁতে দাঁত টিপে যোগ করে—বাস্টার্ড।

এদের প্রচার একটা মারাত্মক ব্যাপার।—দস্তিদার বিড়বিড় করে—যে কোনো জিনিস ধরে এরা এগোতে পারে। সরকারী দুধে মাছি। অব্যবস্থা, দুর্নীতি। ঘুনধরা প্রশাসন। শ্রেণী স্বার্থ। জোচ্চুরি। শোষনের যন্ত্র। ভাঙো এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

পাশের ঘরে এখন কোনো আওয়াজ নেই। হাওয়ায় মাংস রান্নার গন্ধ ছুটে আসে। গুরুপদ বলে—'নিতাই বোতলটা শুরু করে দিল নাকি?'

দস্তিদার জবাব দেয় না। 'বমি করে কোথায় গেলে'—সে জিজ্ঞেস করে। আমার কানের ভেতর ভোঁ ভোঁ শব্দ। মাথাটা ভোঁতা। আমার প্রত্যেকটা কথায় আমি নিজে জড়িয়ে যাচ্ছি। গলাটা কাঠ।

কি হলো জবাব দাও—দস্তিদার টেবিল চাপড়ায়।

বিজয়ার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল—আমি শুরু করি, কিন্তু হলো না।

'কেন—দস্তিদার সজাগ।'

রাস্তায় একদল ছেলে কি যেন ফ্ল্যাগ বিক্রী করছিল। কিনতে বললো। 'আমার ওসব ভালো লাগে না।'

'কি ফ্ল্যাগ?'

জানি না।

তারিখটা মনে আছে?

আমি একটু ভাবি। 'বলি বোধ হয় ছাব্বিশে জানুয়ারী।'

অন্ধকারে দুটো ধুমশো মানুষ তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। শালা, দেশদ্রোহী। তুমি জেনেশুনে জাতীয় পতাকার অপমান করছো। এড়িয়ে গেছো। বমি টমি ওসব বাজে কথা। সিনেমা হলে ছবি শেষ হওযার আগে কিছু লোক বেরিয়ে যায়। সে সব শুয়োরের বাচ্চাদের আমরা চিনি। জাতীয় সংগীত হয়। ইচ্ছে করে অশ্রদ্ধা, ঘেন্না ছড়াতে তোমরা এসব করো।' দস্তিদার উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকে।

আজ রাতে কপাল ফুটো করে দেবো—গুরুপদ তলাব ঠোঁটটা দাঁতে কামড়ায়।

বাইরে বিশাল মাঠ। শস্যে ভরে উঠছে। পরিষ্কার আকাশ। অনেক তারা ফুটেছে। ধূসর ছায়াপথে আলোর গুঁড়ো ওড়ে। কোথায যেন একটা বিশাল রঙমশাল জ্বলছে। অজস্র আলোর ফুলকি চাঁদ, তারা, সূর্য, পৃথিবী হয়ে ঝড়ে পড়েছে। আলোমাখা ধোঁয়ায় তৈরী হয় ছায়াপথ। পোকামাকড়, মড়কে ছড়িয়ে পড়ে রঙমশালের বালি আর ছাই। রঙমশালটা জ্বলে যায়। ফুরোয় না।

ঘরের আলোটা জ্বলে ওঠে। সামনে নিতাই। দস্তিদার আর গুরুপদ খাড়া হয়ে বসে।

ওদের দু'জনকে এঘরে আনছি—নিতাই বলে—চমকে যাক। তারপর ঠিকানা বলবে।

আমার বুকের মধ্যে একটানা গুরগুর শব্দ। দু'জন মানুষ, তাদের আমি চিনি না, জানি না। কিন্তু তারা আমায় চেনে। সনাক্ত করবে। আমাকে দেখে তারা চমকাবে, ভয় পাবে। সঙ্গে সঙ্গে শেষ বিচার হয়ে যাবে। আমার গুলি খাওয়া লাশ পোকাধরা নতুন ধানখেতের গভীরে পড়ে থাকবে। পচে গলে মাটি হয়ে যাবে। কেউ দেখবে না। জানবে না।

বড়ো সাহেব কখন আসবে—গুরুপদ জিজ্ঞেস করে।

কি জানি—দস্তিদার নীচু গলায় বলে—'হয়তো রাতে আসবে না, ফোন করে সারবে।' ঘরের আলোটা ম্যাটমেটে। সেটা ঘিরে ইতিমধ্যে কয়েকটা পোকা জুটেছে।

নিতাই এর সঙ্গে দু'জন ছেলে ঘরে ঢোকে। একজন দাঁড়াতে পারছে না। উর্দিপরা এক সেপাই তাকে ধরে আছে। দু'জনের খালি গা। একজন স্রেফ জাঙ্গিয়া পরে আছে। অন্যজনের কোমরে গামছা জড়ানো। এলো-মেলো মাথার চুল। জাঙ্গিয়া পরা ছেলেটার চোখ লাল। সারা শরীরে কালসিটে। গামছা পরার চোখের পাতা ভারী, আধবোজা। সিপাই-এর কাঁধে সে টলে টলে পড়ছে।

ওদের দেখে আমার বুকের রক্ত ঝলকে ওঠে। শরীরে কুলকুল ঘাম বয়। হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে আটকে থাকে। জাঙ্গিয়া পরা ছেলেটা আমার মুখের দিকে বড়ো বড়ো চো'খে তাকিয়ে থাকে।

নিতাই ধাক্কা দেয় গামছা জড়া'নো ছেলেটাকে—এই সর্বেশ্বর তাকিয়ে দেখ। চিনতে পারিস।

সর্বেশ্বর ধীরে ধীরে চোখ খোলে। আমাকে দেখে। ইলেকট্রিক শক খায়। 'মণ্টুদা'—একটা কাতরানি ওর গলায় ঠেলে ওঠে।

আমার দু'চোখ বেরিয়ে আসে। জাঙ্গিয়া পরার নাম জগদীশ। হঠাৎ সে বে-পরোয়া ভঙ্গীতে এগিয়ে আসে। ভালো করে আমায় দেখে। আমার গোটা শরীর কি এক প্রার্থনায় ফেটে পড়ে।

জগদীশ বলে—ইনি মণ্টুদা নয়।

সর্বেশ্বর ঠক ঠক করে কাঁপছে। তিনজন অফিসার একসঙ্গে ছিটকে ওঠে, সে কি?

'মণ্টুদা পরশুদিন দাড়ি কামিয়ে ফেলেছে—জগদীশ বলে—আমার সামনে। তাছাড়া মণ্টুদার চোখ থুঁতনি অন্যরকম।

গুরুপদ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে—'কল্‌স দাড়ি।' ও আমার দাড়ি মুঠোয় চেপে টান দেয়। কষ্টে আমি চেঁচিয়ে ওঠি।

মুখ জ্বলতে থাকে। কয়েকটা চুল হাতে গুরুপদ দাঁড়িয়ে থাকে।

নিতাই হঠাৎ পকেট থেকে রিভলভার বার করে। খতম করে দেবো, সে গর্জায়। সিপাইদের ইশারা করে। জগদীশ আর সর্বেশ্বরকে নিয়ে ওরা অন্ধকার উঠোনে নামে। ঝাঁকড়া গাছের অন্ধকারে পাখি ডানা ঝাপটায়।

বাইরে পায়ের আওয়াজ কমে আসে। দূরে হঠাৎ ভেজা গলায় কে যেন কেঁদে ওঠে—'বলবো। ঠিকানা বলবো।'

অন্ধকার ভেঙ্গে অনেকগুলো মানুষ ফিরে আসে। উঠোনে নিতাই আর তার দলবলদের দেখি। ওরা পাশের ঘরে ঢোকে। এর ফাঁকে নিতাই জানিয়ে যায়—সর্বেশ্বর বলেছে।

গুরুপদ আর দস্তিদারের মুখে চিন্তার ছাপ। ওরা এখন আমার দিকে তাকাচ্ছে না। আমি বেঁকে গেছি। তবু বুকের মধ্যে কি যেন এক ভার, কষ্ট।

টেলিফোন বাজে। দস্তিদার ছুটে যায়। 'ইয়েস স্যার, আমরাও শুনেছি। রাতারাতি দাড়ি কামিয়ে ফেলবে কে জানতো। ঠিক আছে স্যার। ছেড়ে দিচ্ছি।'

রাতটা এখানে থেকে যান মিঃ রায়। ফোন ছেড়ে দস্তিদার বলে। ভুল হয়ে গেছে। রাতে এখানেই খাবেন। মুরগী মেরেছি। মাল আছে। আরও কিছু চান? সে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নাচায়।

আমার ভয়ঙ্কর গা গুলোচ্ছে। পেট চেপে বলি, বমি করবো।

দস্তিদার আমাকে তুলে দাঁড় করাতে যায়। আমি ওকে ছুঁতে দিই না। বলি, এখনি যেতে হবে।

গুরুপদ বলে—থাকুন। আপনার মতো আর একজনকে দেখে যান।'

আমি ওদের কথায় কান দিই না। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াই। একজন সিপাই আমার স্যুটকেস দিয়ে যায়। পেটের নাড়ী ভুঁড়ি পাক খাচ্ছে। বাইরে নিথর অন্ধকার রাত। রাস্তায় এসে প্রথমে বমি করি। সামান্য তেঁতো জল নাকমুখ দিয়ে বেরোয়। একটা কালো গাড়ী হেডলাইট জ্বেলে ছুটে যায়। পুলিশ ভর্তি। আলোয় চোখ ধেঁধে যায়। জ্বালা করে।

সেই মুহূর্তে মাঠ, ঘাট, বনবাদাড় থেকে হাজার লক্ষ পোকা ঝাঁক বেঁধে ছুটে আসে। তাদের পাখার আওয়াজ, বিজবিজ ধ্বনিতে কানে তালা লাগে। তারা আমাকে ঘিরে ধরে। আমি হনহন করে হাঁটি। মাথার ওপর একটুকরো চাঁদ। হঠাৎ মনে হয়, আমার পেছনে আর একজন মানুষ। তাকে ঠিক আমার মতো দেখতে। হয়তো তার চোখদুটো একটু অন্যরকম, রঙমশালের ফুলকি ঝরছে। সেই মানুষটা নীচু গলায় বলে—গুদোম ভর্তি ওষুধ থাকতেও কেন মাঠে, খামারে, গোলায় রাশি রাশি তাজা ফসল নষ্ট হয়? কেন? কেন? দুহাতে পোকার ঢেউ সরিয়ে আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে পথ হাঁটি।

প্রবীর ঘোষ



চারজন

—তোমার কি একটুও বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই ?

—বলতে পার জ্যোতিষী নই।

—তোমার বুদ্ধি আছে ঘোড়ার ডিম।

—তোমারই বা কী বুদ্ধিটা আছে শুনি ?

—কেন ?

—তুমিই বা কি করে এলে ?

—আমি কি করে জানবো যে—

—আমারও তো সেই কথা।—কথাটা বলেই সুদর্শনের মনে পড়ে গেল অশ্বরায়ের কথাটা—উ-ফ্, বইটা যা হয়েছে না, রগরগে জিনিস।

সোমা তাকাল খোকার দিকে। খোকা হাত পা নেড়ে কি যেন বলে যাচ্ছে তনুকে। তনু হাসছে। জোরে জোরে দুলে দুলে হাসছে। তনু খোকার বয়সী প্রায়। খোকার যোল, তনুর বছর পনের।

—এ ছবি ছেলের পাশে বসে দেখি কি করে ?—সোমার স্বরে কিছুটা অস্বস্তি।

—ছেলের পাশে বসে দেখতে হবে না।

—তনুর পাশে বসেই বা দেখি কি করে ?

—তনুর পাশেও বসতে হবে না, আমার পাশে বোসো।

—আমার কিন্তু লজ্জা করছে।

—লজ্জা তো আমারও করছে।

—তবে টিকিট বিক্রি করে ফিরে যাই চলো।

—ক্ষেপেছো ?

—ক্ষেপার কি হলো ?

—খোকা, তনু কি ভাববে ?

—তনুকে তুমি না আনলেই ভাল করতে।

—কথাটা আগে মনে করলেই পারতে।

—আগে কি জানতাম ?

—তা-ও, তনু পরের মেয়ে।

—খোকার বন্ধুতো !

—বান্ধবী বলো।

—ওই বন্ধু, বান্ধবী একই ব্যাপার।

—খোকার সঙ্গে ওকে এই বই দেখালে—

—আরে ধুর—এইটুকু মেয়ে—।—সম্ভাবনাটুকু নিতান্ত অবহেলা ভরে উড়িয়ে দিল সুদর্শন।

—চল একটু চা খেয়ে নিই।—কথাটা বলেই ভারিক্কি গেজেটেড অফিসার সুদর্শন মুখার্জী মুখটা সোমার কানের কাছে নিয়ে এসে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বললো, বইটা দেখতে দেখতে আমারা না হয় বিশ টা বছর পিছিয়েই যাব। পিছিয়ে যাব আজ রাতে বিছানায়ও।

সোমা অস্বস্তি বোধ করলো। এদিক ওদিক তাকালো। কেউ ওদের কথা শুনছে বলে মনে হয়না। ভীষণ ভিড, সবাই ব্যস্ত। সুদর্শনের কথাটা সোমার ভালই লাগলো। সোমা হঠাৎ ছট্‌ফটিয়ে বললো, ওদের ডাকি, এক সাথেই খাব।

সোমা এগিয়ে গেল খোকা আর তনু'কে ডাকতে। সুদর্শন সিনেমা হলের দেওযালে আঁকা জিনতের বিরাট ছবিটার দিকে তাকাল। অতি স্বল্প বেশবাস। শরীরের চড়াই উৎরাইগুলো বড বেশী স্পৃষ্ট। দারুন একটা আবেদন আছে। তনু'র দিকে তাকাল। পরনে বেলবটস্ আর কুর্ত্তা। তনুর বুক, কোমর আর পাছা জিনত—জিনত। মাঝে মাঝে একটা ব্যনলনের গেঞ্জী পরে বেলবটসের সঙ্গে। বুক দুটো আরো ফুলে থাকে। দারুণ এট্র্যাকটিভ।

—চারটে চা।—সোমা বললো।

—না, তিনটে।—তনু বললো।

—কেন, তুই চা খাবি না ?—গলার ঘাম মোছা বন্ধ রেখে খোকা জিজ্ঞেস করলো।

—কোকাকোলা।—তনু খোকার দিকে তাকাল।

—আমিও।—খোকা তনুর দিকে তাকাল।

—তিনটে কোকাকোলা একটা চা।—সুদর্শন পর্যায়ক্রমে তনু, খোকা, সোমা আর স্টলের লোকটার দিকে তাকাল।

—বাঃ বাঃ তিনজনেই কোকাকোলা আর আমি—

—নেবে কোকাকোলা?—সুদর্শন সোমার দিকে ঝুঁকে প্রশ্ন করলো।

—যাই বলো চা'য়ে যা আরাম কোকাকোলায় তা—

—কোকাকোলায় যা দেয় চা'য়ে তা পাওয়া যায় না।—দাঁত ছড়িয়ে সুদর্শন সোমার দিকে চেয়ে হাসল।

—কোকাকোলায় একটা এনাসিন্ ফেলে খেলে দারুন মজা হয়।—মা বাবার কান বাঁচিয়ে তনুকে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বললো খোকা।

—জানি।

—কি হয় বলতো?

—বললাম তো জানি।

—কি করে জানলি?

—অমনি জেনেছি।

—খেয়েছিস?

—তুই খেয়েছিস?

—নাও ধর।—সুদর্শন কোকাকোলার বোতল এগিয়ে দেয় তনু আর খোকাকে।

—আমিও আরম্ভ করছি কি বল?

—কর।—সোমা সুদর্শনের দিকে চাইল। দেখলো খোকা আর তনু'কে। তনু বেশ বড়-সড় হয়ে উঠেছে। তনু'রা যখন এ বাড়ীতে ভাড়া আসে তখন ওর বয়স আর কত? ছয়—সাত হবে। বেশ লম্বা হয়েছে। ওর বাবার ধাত পেয়েছে। মা মাঝারি লম্বা। ওর মায়ের মতো গায়ের রঙটা পেলে ভাল হ'তো। খুব হাসি-খুশি, মিষ্টি স্বভাবের। খোকার সঙ্গেই ওর বেশী বন্ধুত্ব। খোকা ক্লাস ইলেভেনে উঠেছে। তনু ক্লাস টেনে। খোকাটা ব্রেক্সাণ্ট্, ভাল করলে ডাক্তারী পড়বে। বছর সাতেক লেগে যাবে ওর চাকরী পেতে। চাকরী পেলে তনুর মা'কে কথাটা পাড়লে মন্দ হয় না। তনুর বেশবাসগুলো একটু—; এই বেলবটস্ না পরে শাড়ি পরলে কত সুন্দর দেখাত।

চা'য়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়ে সোমা চুমুক দিল আয়েস করে।
সোমা হাসলো—তোমাদের কোকাকোলার চেয়ে অনেক ভাল।।

ওরা কোকাকোলা খাচ্ছে। তিনজনের ঠোঁটেই স্ট্র। সুদর্শন সোমার দিকে চাইল। স্ট্রটা ঠোঁট থেকে সরিয়ে দাঁত বার করে হাসলো।

ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং একটানা বেল বেজে চলেছে।

—চল ঢোকা যাক।—খালি বোতলটা ষ্টলের লোকটার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললো সুদর্শন।

—হ্যাঁ চল।—কাপটা এগিয়ে দিল সোমা।

—চল্। খোকা তনু'র হাত থেকে বোতলটা নিতে নিতে বললো।

তুই আগে ঢুকবি, আমি তোর পেছন পেছন যাব।—বলল তনু।

—কেন রে?

—না বাবা, অন্ধকারে আমি আগে ঢুকবো না।

-কেন?

—অন্ধকারে যার তার হাত এসে গা'য়ে পড়ে।

—পড়েছিল বুঝি?

—জেনে কি হবে?

—না; বলছিলাম আমার হাতটাও তো—

—একটি ল্যাং খাবি।—এগুতে এগুতে চোখ পাকাল তনু।

টর্চের আলোটা কয়েকটা সিটের ওপর লাফালাফি শেষ করতেই সোমা ফিস্‌ফিস্ করলো সুদর্শনের কানের কাছে, আমি পাপু খোকা বা তনুর পাশে বসে এইসব অসভ্য বই দেখতে পারবো না।

—খোকা ভেতরে ঢোক।—অন্ধকারে সুদর্শনের গলা শোনা গেল।

—খোকা ভেতরে ঢুকলো। খোকার পেছনে তনু, তারপর সুদর্শন, সবশেষে সোমা।

সুদর্শন নিবিষ্ট। জিনত খুব ফ্রি একটিং করছে। জিনতের পোষাক-আসাকগুলো খুব সংক্ষিপ্ত। জিনতের স্কার্টের নীচে জাঙ্গিয়া দেখা যাচ্ছে। জিনতের কলাগাছের থোরের মতো পুরুষ্টু ধব্‌ধবে সাদা উরু দেখা যাচ্ছে। তনু এমনি সর্ট স্কার্ট পরলে জিনতের মতোই দেখাবে। তনুর উরু'ও এমনি পুরুষ্টু এমনি মসৃণ। সুদর্শন তনুর দিকে তাকাল। তনু খোকার দিকে চেয়ে আছে। তনু যখন জোরে জোরে হাসে, তখন ও শরীরটা দোলায়। দুলে

ছলে হাসে। ওর হাসির সঙ্গে সঙ্গে ওর বুক দু'টো দোলে। জিনত স্তন দু'টো প্রায় অনাবৃত রাখা লেসের ব্রা পরেছে। জিনত হাসছে। জিনত দুলছে। জিনতের স্তন দুটো দুলছে। তনু'ও লেসের ব্রা পরলে ওকে'ও বোধহয় এমনিই লাগবে।

সোমা চিম্‌টি কাটলো সুদর্শনের উরুতে। সোমার চোখে চোখ রেখে হাসলো সুদর্শন। অন্ধকারেও সুদর্শনের সাদা দাঁতগুলো দেখতে পেল সোমা।

হাফ্ টাইম। সুদর্শন বেরুল। তল পেটটা খুব ভারী ঠেকছে। ক্যান্টিনটা ঘুরে চীনাবাদামের ঠোংঙা আর পটেটোচিপস্ নিয়ে ঢুকলো। 'সোমার কোলে রাখলো পটেটোচিপ্‌সের ঠোঙাটা। সোমা পটোটোচিপস্ ভাল খায়। বাদামের ঠোঙাটা তনুর কোলে। তনু ভালবাসে চীনাবাদাম।

হলের আলো নিবলো। অন্ধকারে তনু'র ঠোঙা থেকে একটি একটি করে বাদাম তুলে নিতে লাগলো সুদর্শন, খোকা আর তনু। কুট্‌কুট্ করে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে মুখে ছড়িয়ে দিতে লাগলো সুদর্শন, খোকা আর তনু। সুদর্শন কোলের ঠোঙাটায় এক সময় হাত দিয়ে বললো, ফুরিয়ে গেল। আরো আনলে হতো।

—না, না।—তনু প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো।

—বাবা মহা পেটুক।—খোকার গলা শোনা গেল।

সুদর্শন তনুর কোলে ডান হাতটা এলিয়ে দিয়ে ঠোঙাটা দলা পাকাল। জিনত নাইটি পরেছে। বড় বেশী স্বচ্ছ। ঠোঙাটা হাত থেকে গড়িয়ে দিল। পাশে নায়ক শুয়ে, খালি গা। এলিয়ে দেওয়া হাতটাকে টেনে নিয়ে তনুর উরুর ওপর রাখল সুদর্শন। বেলবটস্‌টা খসখসে; খাদির, টেরিলিনের হলে—

সোমা আবার চিমটি কাটলো। বাঁ হাত'টা দিয়ে সোমার হাতটাকে ধরে একটু চাপ দিল সুদর্শন। সোমা সুদর্শনের চোখের দিকে চেয়ে হাসছে। সুদর্শনও হাসলো। সুদর্শন আবার সোমার দিকে চাইলো।

খোকা বোধহয় কিছু বলেছে। তনু হাসছে। চাপা হাসি। ও নিশ্চয় দুলছে। ওর পিঠটা নিশ্চয় উঁচু হয়ে যাচ্ছে। বুকদুটো তলার দিকে ঝুলে পড়ছে। সুদর্শনের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো।

আলোগুলো জ্বলে উঠলো। সবাই উঠছে। সোমা এগুলো। পিছনে সুদর্শন, তনু আর খোকা।

খোকা ফিস্‌ফিস্‌ করলো,—বেশ জমাটি।

—ঘোড়ার ডিম।—তনু ভেঙচে উঠলো।

—তোর থাইয়ে হাত রাখলাম, তুই আমার হাতটা ধরলি না কেন?

—তুই ধরেছিলি ডান উরু, তোর বাবা বাঁ উরু। কোনটা ধরবো? ধু-র, তাই কোনটাই ধরিনি।

শচীন দাশ



কলকাতার দিকে রাস্তা

লক্ষ্মীকে সংগে নিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে নামতেই গুরুপদ দেখল, কলকাতা শহরে তখন বিকেল পালটে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে। ট্রেনটা লেট ছিল, দু'পাঁচ মিনিট নয়, পুরো আড়াই ঘণ্টা। কাঁকিনাড়া থেকে দমদম জংশনের ভেতরে কোথাও তার কাটা ছিল, ফলে তারটার জোড়ার পরে ট্রেন যখন আবার হুড়হুড় করে শেয়ালদা এসে পৌঁছল, তখন অনেকেরই অনেক কাজে দেরী হয়ে গেছে। বাবুদেরই গজগজানি বেশী। একেই ভেপসে ওঠা, গরম, ভাদরের ঘাম গড়াচ্ছে দরদরিয়ে, তার উপর অনেকক্ষণ পরে ট্রেন এলে যা হয়, সুতরাং ভীড়ের ঝাঁপড়ে গুরুপদ অসহায় বোধ করল। প্রথমে কিছুক্ষণ বউয়ের টিঙটিঙে দু'টো কালো হাত ধরে সেই ভীড়ের ভেতরে দাঁড়িয়ে রইল বোকা-হাবার মত, তারপর হঠাৎ বউয়ের হাতটা ওর হাতের মুঠো থেকে খসে যেতেই চোখে পড়ল, তেলচিটানো নোংরা প্ল্যাটফর্মের উপর লক্ষ্মী মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়, ওর চাদ্দিকে পাঁশুটে অন্ধকার, মাজা থেকে বের দেয়া হাড়কালচে শাড়ীটা বুক থেকে নেমে যাচ্ছে সরসরিয়ে আর একটা রোগাটে দুর্বল হাত মুখ চিতিয়ে পড়ে আছে বাস্‌টে জলকাদার ভেতরে।

গুরুপদ প্রথমে ভয় পেল, তারপরই ভীষণ চমকে উঠে লক্ষ্য করল, লক্ষ্মীর যে-হাতটা প্ল্যাটফর্মে শুয়েছিল একটা ভারী পায়ের নীচে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল সেটা। ময়লা রুলিটা ভেঙে দু'তিন টুকরো হয়ে গেল, বুকের কানিটা সরে যেতেই অপুষ্ট স্তনটা পিটপিটিয়ে উঁকি মারল বেরিয়ে এসে, আর একটু ভাল ক'রে দেখতে গিয়েই সে টের পেল, তার চাদ্দিকে ছোটখাট একটা ভীড় জমকে উঠছে এখন।

—ইস-স-স্ লোকটার আক্কেল দেখলেন মশাই। কে একজন বলে উঠল।

আর একজন উত্তর দিল, আর বলবেন না, কেউ কাউকে মানুষ বলেই ভাবে না এখন।

ভাববেটা কি অ্যাঁ, সব ব'খোত যে এখন বেজন্মা হয়ে যাচ্ছে, বলি ভাববেটা কি?

গুরুপদ ঘাড় কাতিয়ে দেখে, উলকো'ঝুলকো এক যুবক। কাঁধের বাঁ-পাশে ঝোলাব্যাগ থেকে মুখ বাড়ানো একটা লজেন্সের বোয়ম, একটু দূরেই প্ল্যাটফর্মে ঢুকে বোধহয় ট্রেনের অপেক্ষায় ছিল, এতক্ষণে ভীড়ের ভেতরে নাক গলিয়ে সে বলে উঠল, আরে আপনারা ভীড়টা ছাড়ুন না, ভীড়টা ছেড়ে দিন দেখি—এর গায়ে এখন একটু হাওয়া লাগা দরকার, দেখছেন না সেন্সলেস হয়ে পড়েছে।

ভয়ত্রাসে গুরুপদ তখনো লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে, অথচ কি করবো বা এখন কি করা উচিত, তা এই মুহূর্তে সে নিজে ঠিক করতে পারল না। ইতিমধ্যে কে একজন জল নিয়ে আসে। লক্ষ্মীর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতেই সে ফ্যাকাসে চোখে তাকায়। কিন্তু বাঁ'হাতটা তুলতে গিয়েই বোঝে, অসহ্য যন্ত্রণা, চিনচিনিয়ে আঙুলের মাথা থেকে ব্যস্তসমস্তভাবে কাঁধের দিকে উঠে আসছে ক্রমশঃ। গুরুপদ ওর বুকের কানিটা টেনে দিয়ে আস্তে আস্তে বুকে তুলে বেঞ্চিতে বসিয়ে দিল। লক্ষ্মীর তখনো ভাল হুঁশ নেই, ততক্ষণে আশেপাশের ভীড়টা একটু পাতলা, সুযোগ বুঝে যে-যার মত কেটে পড়েছে, তবে কিনা তা ট্রেন ধরা বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক না কেন দু'চারজন ইতস্তত: তখনো দলবেঁধে দাঁড়িয়ে। ছাতা হাতে এক মাঝ-বয়সী তখন থেকেই ওদের লক্ষ্য করছিলেন, তিনি এখন জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা যাবে কোথায়?

বোকার মত হলদে দাঁত দেখিয়ে গুরুপদ বলল, আইজ্ঞে কলকেতা কলকেতা! মাঝবয়েসী অবাক হলেন। কাছাকাছি আরো একজন দাঁড়িয়েছিলেন। বুড়ো মানুষ, চোখে ভাল দেখেন না, সুতো বাঁধা চশমাটা অনেকটা নাকের ডগায় এসে ঝুঁকে পড়েছে, আগের লোকটার দিকে তাকিয়ে এবার তিনি বললেন, অবাক হইলেন ক্যান, আরো আইবো, আরো অনেক, এই কইলকাত্তায় আইয়া বেবাকডি একারে পাষাণ হইয়া যাইবো—দ্যাখেন নাই, মাইনষে কেমন খাওন লইয়া কুত্তার লগে মারামারি করে—

বাঁহাতের কব্জির উপরে মাথা রেখে লক্ষ্মী তখনো ধুঁকছে, ওর চোখের কোলে পুরু কালি, হাতের কালচে শিরাগুলো স্পষ্ট আর গালের হাড়দুটোও এমন উঁচু হয়ে যাচ্ছে যে মেচেতাপড়া চামড়া ফুঁড়ে যেকোন সময়েই তা বেরিয়ে আসতে পারে।

গুরুপদ জিজ্ঞেস করল, এহন্ হাঁটতি পারবিনে—

লক্ষ্মী মাথা নাড়তেই তারপর ওকে নিয়ে বাইরে এসে গুরুপদ-র চোখে পড়ল, ষ্টেশনের আশেপাশে এখন জমকে ওঠা ভীড়। উত্তর আর দক্ষিণ দিকে মানুষ যাচ্ছে ঝাকে ঝাঁকে। ওপাশে কালো পোকার মত থিকথিক করছে ভিখিরি বাচ্চাগুলো, পাছা উঁচু করা এক ড্যাকরা যুবতী ইঁটের ফাঁকে ফুঁ-দিয়ে এখন আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত। এদিকটায় ফ্লাড লাইটের নীচে ভীড় আরো বেশী। একটু আড়ালে এক বিবস্ত্রা বুড়ী পড়ে আছে। শরীরে ন্যাতা রাখারও জায়গা নেই। সারাদেহে রসমাখানো পচপচে ঘা। মাছি উড়ছে সমানে।

ওরা অনেকটা এগিয়ে গে'ল। কিছুক্ষণ এদিকে-ওদিকে, আলো-অন্ধকারের ভেতর হেঁটে হেঁটে দু'জনেই একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ক্লান্ত হয়ে একজন আর একজনের দিকে তাকাল। গুরুপদ তখনো কি করবে বা কোথায় যাবে এখন ইত্যাদি ভাবছিল। লক্ষ্মী তাকিয়েছিল ও'পাশে অন্ধকারের দিকে।

এদিকটায় রাস্তার অবস্থা খারাপ, রোঁয়া ওঠা দিশি কুকুরের মত। মাঝে মাঝেই খোদল হয়ে থাকা গর্তের ভেতরে আলগা বর্ষার জল আর আলোহীন ফুটপাথের উপরে একটা গুমসানো দুর্গন্ধ। তাছাড়া ফুটপাত বলতেও তেমন কিছু নেই, যা-ও আছে ছোট হতে ভিখিরিদের পেটের ভেতরে তা সেঁধিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। শুধু এখানেই নয়, ঐদিকে শেয়ালদা, মানিকতলা, রাজাবাজার থেকে এগিয়ে আরো উত্তরে আর ওদিকে মৌলালি, এন্টালি, পার্কসার্কাস হয়ে ক্রমে আরো দক্ষিণে এই একই দশা। পার্ক আর ফুটপাথগুলো ভিখিরিতে ঠাসা, হেগে-মুতে নোংরা ক'রে রেখেছে, তার উপর কোথাও ভাঙাচোরা দরমা, কোথাও পুরোনো চাটাই, আবার কোথাও বা ম্যাড়ম্যাড়ে নোংরা পলিথিনের উপরে ভাঙা টিনের টুকরো, ছেঁড়া চট বা ইট-কাঠ দিয়ে চাপানো ছাঁদছিরিহীন এই দেড়হাতি ঝুপড়িগুলোর ভেতরেই ধিক ধিকিয়ে জ্বলছে জীবন, যে-কোন সময়ে নিভে গেলেই অন্ধকার, তবু সেই

অন্ধকারেই আবার নতুন ক'রে জন্ম নিচ্ছে মানুষ, থকথকে কিঃটানো পোকার মত।

গুরুপদ ক্রমে অসহায় হয়ে পড়েছিল। পা দুটো পাথরের মত ভারী হয়ে আসায় লক্ষ্মীও আর দাঁড়াতে পারছিল না, বাঁ-হাতের যন্ত্রণাটা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছিল ওর, তাই সে প্রথমে বসে পড়ল সেখানে। অগত্যা গুরুপদও কোন উপায় দেখল না. ভেবেছিল এতবড় শহর, একটা না একটা আশ্রয় পেয়ে যাবেই। কিন্তু ট্রেণটা দেরীতে এসেই সব মাটি ক'রে দিলে। সুতরাং আজ রাতটা এখানেই কাটিয়ে দিতে হবে, তারপর ভেবেচিন্তে কাল যা হোক কিছু করা যাবে। এইসব ভেবে গুরুপদও লক্ষ্মীর পাশাপাশি বসে পড়ল। আর তারপর আস্তে আস্তে দেহটা বিছিয়ে দেবার আগেই সে দেখল, শহরে এখন রাত ঘন হচ্ছে, অন্ধকার জমকে উঠেছে ফুটপাথের চারপাশে।

সে রাতে ওদের চোখে আর ঘুম এল না। একেই সেই সকালে বেরিয়ে এপর্যন্ত কিছুই খাওয়া হয়নি ওদের, তার উপর নানারকম দুশ্চিন্তা ও ভয়ে বুকটা ভারী হয়ে উঠেছিল, তবু সেই ফুটপাথেই কাটিয়ে দিল ওরা পরের দিন ভোর না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু পরের সকালেই অবাক হয়ে গেল শহরের দিকে তাকিয়ে। আর যত না বেশী অবাক হল তার চেয়ে বেশী ভয় পেয়ে গেল কলকাতার চেহারা দেখে। তাছাড়া গুরুপদ শুনেছিল, কলকাতার হাওয়ায় নাকি পয়সা ওড়ে, হাত বাড়িয়ে ঠিকমত ধরে নিলেই হ'ল। কিন্তু সে পয়সা উড়তে দেখল না কোথাও, তবু বুঝল বেঁচে থাকাটা এখানে বড় শক্ত ব্যাপার।

তবু সেবাঁচার জন্যই একসময় শহরে না এসে আর উপায় ছিল না গুরুপদ-র। সেই আকালের দিনেই চুনহাগা অসুখে মুরগীর মত ছটফট করতে করতে অমন জোয়ান ছেলেটা মারা গেল। সাত পুরুষের পড়ে থাকা ছিঁটে-ফোঁটা জমি আগেই বন্ধকী পড়েছিল, তার উপর পালবাবুদের ভাগীজমির কাজটাও চলে যাওয়ায় চোখে-মুখে অন্ধকার নেমে এল ওর কর্তাদের পা জড়িয়ে ধরেছিল গুরুপদ, আর ক'টা দিন বাঁচায়ে রাখেন গো কত্তা, এ-বয়সে আর কোথা যেতি পারি বলেন। কিন্তু তাতেও কর্তাদের মন ভেজেনি. সুতরাং আর কোন উপায় না দেখে কালীপুরের চটকলে গিয়ে কাজের ধান্ধা করল সে, লাইন পার হয়ে বীরনগরের ধানকলেও হত্যা

দিয়ে পড়েছিল দু-চারদিন, কিন্তু কোথাও কিছু না হওয়ায় অগত্যা কলকাতার দিকে পা বাড়াতে হ'ল একদিন।

আর এই প্রথম ওর শহরে আসা। সেকারণে লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে প্রথম দু-চারদিন শহরটা চুঁড়ে বেড়াল সে, গোপন গলি ঘুঁপচি, স্যাঁতসেঁতে চল্লখানা, ঠুমকিদের ড্যারা আর বাবুদের আপিস-কাছারি ও বাজার-রেঁস্তরা চিনে নিল, কেননা সে বুঝেছিল, এখানে বেঁচে থাকতে হলে পয়সা চাই আর পয়সার জন্য প্রয়োজন কাজ। কিন্তু কাজের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে দু-তিনদিনের ভেতরই ক্রমশঃ হতাশ হয়ে যাচ্ছিল সে।—নাঃ এহানে কিছু মিলবে না মনি হচ্ছে—গুরুপদ মনে মনে ভাবে। কারণ, এখানে কোন চাষ-আবাদের কাজ নেই, থাকার ভেতরে আছে হোটেল রেস্তোরায় বয়-বেয়ারা অথবা কুলীকামিন, ঝাঁকা-মুটের কাজ, তাও সেখানে এত ভীড় যে গুরুপদ-র মত হাড়-হাভাতে মাইন্দারের ঠেকনা পাওয়া মুশকিল। তবু প্রথম দিকে হতাশ হয়ে পড়লেও কথনো ওরা উৎসাহ হারাত না, বরং পাগলের মত রাস্তায় ও ফুটপাথে সারাদিন ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত ওদের। অথচ এভাবে ঘুরে ঘুরে একসময় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ারই কথা, আর হল-ও তাই। পেটের ভেতরে জ্বলে উঠল খিদে, বুকটা মুচড়ে উঠল যন্ত্রণায় আর চোখের ভেতরটা যেন কয়েক'শ বছরের খিদেয় শান দেয়া ছুরি, জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলজ্বল করে উঠছে। লক্ষ্মী ভাবে, তারচেয়ে গাঁয়েই ছিল ভাল, না খেয়ে মরত বটে, তবু দু'পাঁচজন চেনাজানা মানুষের কাছাকাছি তো থাকা যেত। কিন্তু এখানে মানুষের কোন দয়ামায়া নেই গো, কেমন দেখিয়ে ভালমন্দ খায়, চাইলে খেঁকিয়ে ওঠে, তাছাড়া ছুটছে দেখ না, পায়ের নীচে মানুষ পড়ল, কি ইঁদুর পড়ল সে খেয়ালও নেই। —বাবুগুলোন মজা মারে কোথেহে—গুরুপদ-র চোখ জ্বলে ওঠে, পকিটে পয়সা থাকলি সগ্‌গেও উড়াল দেয়া যায়। লক্ষ্মী বলে, তার চেয়ে মোরা গাঁয়ে ফিরে যাই। গুরুপদ চমকে ওঠে নিশ্চুপ ভেবে যায়, নাঃ, সে-রাস্তা ও এখন বন্ধ। সুতরাং বেঁচে থাকতে হলে এখানে ভিক্ষে করেই বেঁচে থাকতে হবে এখন।

শেষ পর্যন্ত সেই ভিক্ষেয় নেমে আসা ছাড়া কোন উপায় রইল না ওদের। প্রথম প্রথম ওরা একসঙ্গেই থাকত। তারপর আস্তে আস্তে সকাল থেকেই আলাদা, দেখা হ'ত আবার বিকেলে কিংবা সন্ধ্যের দিকে। তখন দু'জনের

পয়সায় আলাদা হিস্তে, আলাদা হিসেব। হিসেব মেলাত গুরুপদ, পা ছড়িয়ে বসে সুদখোর মহাজনের মত, মাঝে মাঝে ডানহাতের মুঠোয় জ্বলন্ত বিড়িতে হুঁশহুঁশ করে টান উঠত, টান উঠলে পলকা আগুনে দেখা যেত ওর চোখের মনিটা জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠছে।

প্রথমদিকে লক্ষ্মীর এতো লজ্জা হত। একেই হাড়-হাভাতে শরীর, তার উপর না খেয়ে আর অপুষ্টির কারণে বয়সকাল থাকতেই দেহ ভেঙে পড়েছে, তবু সে দেহের দিকেই বাবুরা এমন ড্যাবডেবিয়ে তাকায় যে মাথা নীচু করে নিশ্চুপ হাতটা বাড়িয়ে দেয়া ছাড়া আর রাস্তা থাকে না। কিন্তু তাতেও পয়সা মিলত না। ফলে রোজই ওকে ফিরে আসতে হত খালি হাতে। গুরুপদ খেঁকিয়ে উঠত, মেয়েমানুষডার বুদ্ধি ছ্যাখ্, অমন সতীলক্ষ্মী হয়ি থাকলি কি পয়সা ফেল্ দে যাবে। বাবুদের নজরে পড়তি হয়।

তা গুরুপদ চালাক ছিল। কেননা সে দেখেছিল, এখানে ভিক্ষের বাজারেও জালিয়াতি, আসলে, যে যত চালাক হবে তার তত বাজার। আর সে চালাকি খাটিয়েই ছলচাতুরি করে সে বাবুদের কাছ থেকে পয়সা কামিয়ে আনত। ততদিনে লক্ষ্মীও অনেক পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে। সুযোগমত ঝোপ বুঝে কখনো কোমড় ভেঙে, কখনো কুঁজো হয়ে আবার কখনো বা বুকের কানিটা ফেলে দিয়ে পরণের ন্যাতাটা উরু পর্যন্ত তুলে ধরলেই সে জানে, বাবুদের নীচটা টনটনিয়ে ওঠে, বাবুরা তখন ড্যাবডেবিয়ে তাকায় আর তাকাবার সুযোগ নেয় দু'একটা পয়সা ফেলে দিয়ে।

এভাবেই উঞ্ছবৃত্তি ক'রে কাটিয়ে দিচ্ছিল ওরা। কিন্তু সবদিন সমান যায় না। ক্রমে ভিক্ষের বাজারও আঁকাড়া হয়ে ওঠে। এক একদিন এমনও হয়ে যায় যে দু'জনের কেউ কিছুই পায় না। আর দেবেই বা কে, দিন-কালের যা চেহারা, মানুষের বেঁচে থাকাই এখন মুশকিল। তার উপর গাঁয়ের মানুষ যেন ভেঙে পড়েছে শহরের দিকে, সবার লক্ষ্য এখন কলকাতা, কলকাতায় গেলে নাকি বেঁচে থাকা যায়, অন্তত ভুখা পেটে কিছু দানা পড়ে, তাই ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-মরদ দলে দলে চলে আসছে এখন কলকাতায়। শ্যালদা আর হাওড়ার দিকে তাকানো যায় না, পায়ে হাড়-কালচে মানুষ জড়িয়ে যায়, বাচ্চাগুলো দূষিত কৃমির মত ঘুরে বেড়ায়। বাবুরা নাক সিঁটকে ওঠে, হাঁটতে গিয়ে রুমাল চাপা দেয় নাকে।

গুরুপদ-রা চিন্তায় পড়ে যায়। অথচ কি উপায় ভেবে উঠতে পারে না।

এদিকে খিদের জ্বালায় পেটের নাড়িভুঁড়ি যেন ধকধকিয়ে ওঠে। কচলায়। তবু ভিক্ষের আশায় কুকুরের মত হন্তে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু সারাদিন ঘুরেটুরে সন্ধ্যের দিকে হতাশা আর জ্বালাযন্ত্রণা ছাড়া কিছুই কুড়িয়ে পায় না। বিরক্তি আর রাগে দু'জনেই তখন ঝাঁঝিয়ে থাকে। এ'ভাবেই দিন কাটে। ক্রমে এমন হয় যে দু'জনের কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। তারপর আস্তে আস্তে একদিন ওদের ভেতরে সন্দেহ ঢুকে যায়। অদ্ধেক খাওয়া কানের পোড়া বিড়িটা ধরিয়ে গুরুপদ ত্যারচা চোখে তাকায়। সন্দেহ বাড়ে চোখে চে খে। পাশাপাশি শুয়ে থাকলেও দূরত্বটা যেন কয়েক'শ গজ দূরের, তাছাড়া এ বয়েসেও লক্ষ্মীর বেলুনের মত তলপেটটা দেখে চমকে ওঠে, তবু তাতে ওর কিন্তু আসে যায় না। আসলে ও অন্য জিনিস ছাখে, লক্ষ্মীর কোমরের গোছটায় শকুনের মত নজর রাখে, ঘুমের ঘোরে একদিন ওর শাড়ীর নীচে হাত চালিয়েও দেয়, পয়সা লুকানো আছে কিনা পরীক্ষা করে। লক্ষ্মী চমকে জেগে যায়, ক্রুদ্ধ সাপিনীর মত ছল্‌কে ওঠে, আরে ঢামনা মরদ, লজ্জা হয় না তুমার—গুরুপদ ও ধম্‌কে জ্বলন্ত বিড়িটা ছুঁড়ে মারে, চোপ শালা ভাতারখাঁকি মাগী—

এমনি করেই আরো কয়েকটা মাস চলে যায়। এদিকে বর্ষা গিয়ে শীত আসে, শীত গিয়ে আবার গ্রীষ্ম। সীসে রঙের আকাশটায় রোদের তেজ বাড়ে। ভ্যাপসা গরম ওঠে রোদের চারপাশে। অনাহারে আর সর্দিগর্মিতে ফুটপাথে, রেলষ্টেশনের আশেপাশে মানুষ মরতে থাকে পটাপট। তারপর গ্রীষ্ম শেষ হয়ে হয়ে আসার মুখেই ফুটপাথের অস্থায়ী বাসিন্দারা বর্ষার হাত থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় খোঁজে। ষ্টেশনের ভেতরে, ট্রাম গুমটির আশে-পাশে যে যেখানে পারে, কেননা এই দু'তিনটে মাস এখন তাদের টিকে থাকা মুশকিল। তাই গুরুপদরাও হাঁটতে হাঁটতে সরে আসে আরো অনেকটা দূরে লেভেলক্রসিং পেরিয়ে প্রায় শহরের উপকণ্ঠে।

ততদিনে গুরুপদ আরো বুড়ো হয়ে গেছে। আর যত না বেশী বুড়ো, তারচেয়ে না খেয়ে খেয়ে আরো বেশী দুর্বল। ভেঙে যাওয়া মুখটা ফ্যাকাশে ও ক্ষয় রোগীর মত হলদে হয়ে উঠেছিল। ও কথা বলতে পারত না, কথা বলতে গেলেই কাশত আর চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ত। তার উপর গায়ের চামড়া যেন গিরগিটির মত কর্কশ হয়ে উঠেছিল, আর সে কর্কশ চামড়ার উপরে পচপচে কিটোনো ঘা। এ'ছাড়া কোমর থেকে পায়ের

আঙুল পর্যন্ত ফুলো ফুলো, গাঁটে গাঁটে তীব্র যন্ত্রণা, এবং খসখসে চামড়ার উপরে এমন সব চুলের মত ফাটার দাগ যে গুরুপদ-র নডতে চড়তে কষ্ট হয়, চলতে ফিরতে গেলেই একধরণের আঠালো লালচে রস গড়ায়। মাঝে মাঝে তাই ওর মেজাজটা খিটখিটে হয়ে যায়, বিরক্তি আর ঝাঁঝাল ক্রোধে মুখটা বেঁকে ওঠে, অনর্গল খিস্তিখেউর বেরিয়ে আসে তখন মুখ থেকে।

তারপর একদিন সেই ভয়ংকর রাতটা আসে। দু'দিনের এক-নাগাড়ে বৃষ্টি তিনদিনের মাথায় এসেও থামার লক্ষণ নেই। বাইরে শোঁ শোঁ বাতাসের ক্রুদ্ধ গর্জন, অপ্রতুল বৃষ্টির সংগে ঝড়ো হাওয়া। মাঝেমধ্যে অবশ্য বৃষ্টির চাপটা বাড়ছে, তা ও মুহূর্তের জন্য মাত্র, তারপরেই আবার বাতাসের বেগের সংগে একটানা হুংকার।

লেভেলক্রসিং পার হ'য়ে এদিকে পাঁশুটে অন্ধকার। রাস্তায় প্রায়ই আলো থাকে না। মাঝে মাঝে ল্যাম্পপোষ্ট থেকে দু'একটা করে আলো জ্বলছে বটে, তা ও আলো এত অস্পষ্ট যে তেমন রাস্তাঘাট স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। তবে দিনের বেলা এখানে আলো প্রচুর আর তাতেই দেখা যায়, লাইনের দু'ধারে বস্তী, বস্তীর পেছন থেকেই আবার শুরু হয়েছে বড বড আকাশমুখো বাড়ী।

বাইরে আকাশের রঙ বোঝা যায় না এখন। শুধু চাপা গর্জন। যেন একটা হিংস্র সাপ ছোবল মেরে যাচ্ছে অনবরত। ঝড়ের চাপ ক্রমশঃ বাড়ছে। আর ঝোড়ো বাতাসের সংগে সংগে উড়ে আসছে প্রবল বৃষ্টির ছাট।

গুরুপদ-র শীত পেয়ে যায় ঠকঠকিয়ে কাঁপতে থাকে বুকের ভেতরটা। মাঝে মাঝে বৃষ্টির ছাট উড়ে এলে দেহটা বেঁকে যাচ্ছে ধনুকের মত। কিন্তু কোন হুঁশ নেই। হুঁশ থাকবেই বা কি করে, একেই লদপদে ঘেঁয়ো শরীর তায় উপর দু'দিন ধরে এই গাড়ী-বারান্দার নীচে বন্দী। অন্যান্য দিন তবু দু'একটা কিছু পেয়ে যায়। কিন্তু এ দু'দিন ধরে বেরোতেই পারছে না একদম। ফলে দেহটা বারবার দমকে উঠছে ক্রমশঃ আর একটা প্রবল যন্ত্রণা যেন নাভি থেকে বুক চিতিয়ে উঁকি দিচ্ছে।

হঠাৎ একটা ছপছপে আওয়াজ ওঠে কে, লক্ষ্মী বোধায়,—গুরুপদ মাথা তুলতে গিয়েও পারে না। তারপরেই ভাবে, লক্ষ্মী তো ক'দিন ধরেই নেই। কোথায়-কোথায় যে থাকে তা ও নিজেই জানে। মাঝে মাঝে অবশ্য দয়াদাক্ষিণ্য করে দু'এক-টুকরো খাবার ওকে ছুঁড়ে দিয়ে যায়।

কিন্তু তাতে গুরুপদ-র বেন্নাই হয়, তবে না খেয়েও পারে না। শালা চ্যামনা মাগী, ভাতারখাঁকি—গুরুপদ থুথু ফেলতে গিয়েও থুথু বেরোয় না মুখ থেকে। সকালবেলা একমুখ নোনা গ্যাঁজলা বেরিয়েছিল। এখন তা ও নেই। বুকটা শুকনো।

ছপ ছপে আওয়াজটা এবার কাছাকাছি এসে থেমে যায়। বাইরের ল্যাম্পপোষ্টের তেরচা আলোটা গাড়ীবারান্দার ভেতরে এসে খানিকটা দেহ বিছিয়ে দিযেছে আর তারই আলোয় কোনরকমে মাথা তুলেই গুরুপদ চমকে উঠল, খানিকটা আগেই একটা ভিজে শপ্‌শপে উলঙ্গ দেহ যেন বসে পড়েছে। মাথার উকুন বিজবিজে চুল থেকে জল গড়াচ্ছে টপ্‌টপ্‌ করে, পিঠের মেরু-দণ্ডটা সামনের দিকে বাঁক নেয়া। সামনে ঝুঁকে পড়ে কোমরের গোঁজ থেকে কি যেন একটা সাদা মত জিনিস বের করল। আর তারপরেই সেই উলঙ্গ দেহটা খুব সন্তর্পণে মুখ ফেরাতেই গুরুপদ-র বুকের মাঝখানে হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল।

আর লক্ষ্মী ও ততক্ষণে লম্বা পাঁউরুটিটা বুকের উপরে আঁকড়ে ধরেছে। বাইরে প্রবল বৃষ্টি। ঝড়ো হাওয়ার চাপ বাড়ছে। লক্ষ্মী অসহায়ের মত বাইরে তাকাল।

গুরুপদও থরথর করে লদপদে দেহটা নিয়ে উঠে বসেছে তখন। ওর শরীরে কাঁপ ধরেছে, জিভটা নড়ছে খাবারের সন্ধান পেয়ে, বুকের ভেতরে বিদ্যুতের ঝলকানি আর ধকধকানো জুলজুলে চোখে যেন হাজার বছরের খিদে শন্‌শনিয়ে উঠেছে। শালা চ্যামনা ভাতারখাঁকি—গুরুপদ বিড়বিড়িয়ে ওঠে। একটু সময় নিয়ে স্থির তাকায় তারপরই এগিয়ে যায়। অনেকটা লেংচে, হিংস্র বাঘের মত থাবা বাড়িয়ে।

ওদিকে তখন লক্ষ্মীর চোখেও আগুন জ্বলে ওঠে। ক্রুদ্ধ চোখের পাতা পড়ে না। রুটিটা আরো চেপে স্তনের ভাঁজে জড়িয়ে নেয়। দু'চারদিন পরে আজ এই প্রথম খাবার, তা ও চেয়েচিন্তে আনেনি, চুরি করেছে। কি করবে খিদের পেট টনটনিয়ে ওঠে তার উপর আবার তলার দিকে দেহের ভেতরে আর একটা চ্যামনা পিটপিটিয়ে বাড়ছে।

লক্ষ্মী তাকায়। গুরুপদ খুব কাছাকাছি। একবার ছোবল মারলেই হল। তাড়াতাড়ি একটু সরে যায় ও। রুটিটাকে তলপেটের গেঁজে ঢুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই একটা পতনের শব্দ। কিছুক্ষণ

ঝাপ্‌টা-ঝাপ্‌টি। একবার লক্ষ্মী উপরে, গুরুপদ নীচে আর একবার গুরুপদ উপরে লক্ষ্মী নীচে। এবং তারপরেই আবার পতন। এ'বার লক্ষ্মীর উঠতে একটু সময় লাগে, আর সেই মুহূর্তেই ওর তলপেটের ভেতরে নখঅলা হাতটা ঢুকিয়ে দেয় গুরুপদ। একটা সুতীক্ষ্ণ চীৎকার ওঠে আকাশ ফাটিয়ে। গুরুপদ-র হাত গড়িয়ে গলগল করে রক্ত নামে, আর সঙ্গে সঙ্গেই ওর বুকের খাঁজে কি যেন একটা কামড় অনুভব করে হঠাৎ। তারপরেই আর কোন শব্দ নয়।

শুধু পরের দিন বৃষ্টি ধ'রে এলে যারা নতুন ক'রে আবার কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে তাদের অনেকেরই চোখে পড়ে, দু' দু'টো হাড়কালটে উদোম নরনারী পরস্পরকে জড়িয়ে মরে পড়ে আছে, তাদের সামনে একটা লদলদে ভেজা রুটি আর একটা সরু কালচে রক্তের রেখা তখনো তাদের গা চুঁইয়ে ক্রমশঃ শহরের ভেতরে এগিয়ে যাচ্ছে।

রাধানাথ মণ্ডল



যন্ত্রত্রয়

১

একজন শরীর নিয়ে চিন্তিত মানুষ বুলওয়ার্কারে ব্যায়াম করার সময় একদিন হঠাৎ একটি স্প্রিং ছিঁড়ে ফেলে। তার আগে পর্যন্ত তার জীবনধারা অন্যরকম ছিল—যার বিবৃতি এভাবে সাজানো যায়।

যেমন ধরা যাক ঘড়িতে ছ'টা বাজে। এসময় সে রোজ ছোলা খায়। তারপর ছ'টা-পাঁচে সে ঐ যন্ত্রটা তুলে নেয়, যার নাম বুলওয়ার্কার। সম্প্রতিকালে একটি কোম্পানি তৈরী করেছে, ওই ক্ষুদ্রাকৃতি ব্যায়ামের যন্ত্রটির কাছে নিজেকে কিছুক্ষণ সমর্পণ করে। প্রথমে দু'দিকে হাত প্রসারিত করে, তারপর ভিতরের স্প্রিংয়ের অস্তিত্ব অনুভব ক'রে চাপ দেয়। দু'হাতের পেশী ফুলে উঠতে উঠতে একটা গোল এবং লম্বাটে আকার ধারণ করে। একটুও মুখ বিকৃত না করে সে দিকে সে তাকায়। দু'দিকের স্প্রিং ধরে টানে। কতটা বেশি টানতে পারল ডায়ালের সংখ্যায় দেখে নেয়। রোজ একটু একটু করে তার ভাল লাগা এসে যায়। এবার সে পিছনে নিয়ে পিঠের ব্যায়াম এবং চেয়ারে ব'সে পায়ের ব্যায়াম সারে।

তার রোজকার জীবনে কোন বোধের অসুখ থাকে না। সে সকালে ওই ভাবে ব্যায়াম করে, তারপর স্ত্রীর হাত থেকে সরষের তেলের বাটি নিয়ে ভাল ক'রে তেল মাখে, স্নান করে, দশটায় স্কুলে যায়। ছেলেদের সামনে হাজির হয়, একেক-দিন ছটা পর্যন্ত ক্লাস নেয়, একজন সাধারণ ডেলি প্যাসেঞ্জারের মতো বাড়ি ফিরে আসে। সন্ধ্যেবেলা বউয়ের সঙ্গে গল্প করে ও রাত্রে ন'খানা রুটি খায়। শোবার আগে একগ্লাস বোর্নভিটা খেয়ে সপ্তাহে তিনদিন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ঘুমোয়।

সে ছোটবেলায় পড়েছিল, যা ছাত্রদের কাছে প্রায়ই বলে যে স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্যহীন মানুষ কোনও প্রাচুর্যেই সুখী হয় না নাকি? এই সত্যে

পা রেখে সে আর্থিক অভাবকে তুচ্ছ করে। এবং সে স্বল্প মাইনের ভেতর থেকেই প্রতি রবি ও বুধবারে মাংস খায়, শীতকালে রোজ একটা মুরগির ডিম, গ্রীষ্মকালে পেস্তা- বাদামের সরবৎ খেয়ে রোজ ব্যায়াম করে।

সে জানে শরীরের মতো সাংসারিক স্বাস্থ্যেরও নীরোগ ও প্রাণচঞ্চল হওয়া প্রয়োজন। এবং সেই কারণে সে যাবতীয় কর্তব্য পালনে কখনও অবহেলা করে না। সে স্ত্রীকে বিকেলে নিয়ম করে বেড়িয়ে মন ভালো রাখার পরামর্শ দেয়, শনিবারে এ্যাডভান্স-টিকেট কিনে রোববারে সিনেমা দেখায়, রোজ কমপক্ষে একটিও চুমু খেয়ে থাকে, একেক-দিন সকালে খোলা চুলে তার স্ত্রী যখন এক আকাশব্যাপী স্নিগ্ধতা হয়ে দাঁড়ায়, সে তখন যথারীতি ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে যায়।

সে বছরে দু'বার বেড়াতেও গিয়ে থাকে। কোনও পাহাড় কিংবা সমুদ্রে গিয়ে সে নিজেদের সুখী দম্পতি ভাবে। 'ছাখো, এখানে না-এলে শরৎকালটা ঠিক চেনা যায় না, অথবা 'তোমাকে এরকম পরিবেশে ঢের বেশি ক'রে পাচ্ছি' ইত্যাদি সংলাপ কোনও উদাসী চরিত্রের মতো সে নিজের মুখে বসিয়ে নেয়। সকালে সূর্যের দিকে তাকিয়ে সে বউকে বড় করে টিপ পরার অন্য পিড়াপিড়ী করে। এতদূর পর্যন্ত ঠিকঠিক থাকে। একটি নীরোগ সুস্থ মানুষ তার বেঁচে-থাকার জন্য একটি পৃথিবী তৈরী করে ফেলে। সেখানে একটি সূর্যোদয় থেকে আরেকটি প্রভাত পর্যন্ত তাব সমীপস্থ বস্তু-গুলির সঙ্গে নিজের স্থানটিও ঠিক করে রাখে। সে সার্থকতা ইত্যাদি শব্দে কাতর হয় না, কোনও পীড়ন তাকে অস্থির করে না।

কিন্তু ইদানীং কেমন যেন সে ক্লান্ত বোধ করে। সকালে উঠে ব্যায়াম ক'রে, স্কুলে গিয়ে ফিরে এসে পরের দিনের জন্যে অপেক্ষা করতে যেন ভাল লাগে না। একেক-দিন তিনটে ক্লাশ নিয়েই সে হাঁপিয়ে পড়ে। কোনও ছাত্রের শরীরে চরম অযত্নের ছাপ দেখেও তার 'স্বাস্থ্যই সব সুখের মূল' পুনরাবৃত্তি করতে উৎসাহ বোধ হয় না।

কোনো কোনো দিন সকালে তার বুলওয়ার্কার হাতে নিতেও ইচ্ছে করে না। এই যন্ত্রটিকে আর তত প্রিয় মনে হয় না।

এইসব খণ্ডবিখণ্ড ক্লান্তি যখন তাকে একটু সংশয়াচ্ছন্ন করে ফেলেছে সে-সময় একদিন সকালে ব্যায়াম করতে গিয়ে হঠাৎ একটা স্প্রিং ছিঁড়ে যায়।

আকস্মিক এই ঘটনায় সে দারুণ বিস্মিত হয়। সেখানেই সে আঘাত প্রাপ্তের মতো বসে পড়ে। অনেক, অনেক দিন ধরে এই যন্ত্র বিকল হয়ে গিয়েছিল, সে বুঝতে পারে। এভাবে একটি যন্ত্র ভিতরে ভিতরে গোলমাল, হয়ে থাকে—এই আবিষ্কারে সে প্রথমে বিমূঢ় হয়ে যায়, পরে একটি নতুন যন্ত্রের প্রয়োজন অনুভব করে। বুলওয়ার্কারের গ্যারান্টি-কার্ড বের করে এনে সে কোম্পানিতে চিঠি লিখবে ভাবে। অন্যান্য দিনের মতো তার স্ত্রী তেল নিয়ে আসে। তার দিকেও তাকিয়ে সে চমকে ওঠে। ঐ ঈষৎ পুরু ঠোঁট, স্তনদ্বয়, নাভি-নিম্নের গর্ত সবগুলির সে যথাসম্মত ব্যবহার করে এসেছে। সব কিছুর সঙ্গে তার স্ত্রীও যদি বুলওয়ার্কারের মতো বিকল হয়ে গিয়ে থাকে? কোনও রাত্রে যদি সে দেখে শরীরে বিভিন্ন প্রদেশে ঠিক আগের স্পর্শ নেই! সে এখনই অন্য একটি স্ত্রীর জন্য ব্যাকুল হয়।

তখন তার নিজের কথাও মনে হয়। এই সমস্ত শরীরটিকে বহু বহু দিন ধরে ব্যবহার করে এসেছে। এই জিভ দিয়ে স্বাদ নিয়েছে, এই নাকের সাহায্যে ঘ্রাণ, এই আঙুল দিয়ে ছুঁয়েছে যাবতীয় সুখ। হাঁটুর জয়েণ্টকে কাজে লাগিয়ে সে হেঁটেছে ছাব্বিশটি বছর, মুখস্থ করার ক্ষমতায় সে ছাত্রদের কাছে পঠিত বই থেকে রিলে করে গেছে, সহযাত্রীদের সঙ্গে কোট করেছে সংবাদপত্রের হেড্‌লাইন।

কিন্তু তাদের ত্রয়ী অবস্থানের তৃতীয়টিও যদি অকেজো হয়ে পড়ে! এই শিরা-উপশিরা, এই ত্বক আসলে যদি জংধরা হয় কিংবা কুঞ্চিত! এই পুরোনো শরীর তারও বদলে ফেলা দরকার। সে কী করবে স্থির করে ফেলে।

তার ভিতরে যা যা আছে সে কিনে আনবে ভাবে। দুশো ছ'খানা হাড়ের একটা ঝকঝকে সেট, কয়েক মিটার নমনীয় চামড়া, কয়েক বোতল তাজা রক্ত সে পৃথক পৃথক দোকান থেকে কিনবে। তারপর একজন যন্ত্রীর কাছে যাবে সেগুলো জোড়া লাগিয়ে দেওয়ার জন্য।

তার আশা করতে ইচ্ছে করে পিতৃসদৃশ সেই যন্ত্রীর সাক্ষাত হয়তো বা সে পেয়ে যাবে।

অমর মিত্র



অরণ্যপর্ব

অন্ধকার প্রগাঢ় হ'য়ে নামার বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে, আশ্বিনের অস্থির-মতি অপরাহ্নে শরীর ভাসিয়ে যে তিনটি মানুষ তাড়া ক'রে নিয়ে চলেছিল ঐ রক্তঝুটি মোরগটাকে, সে-তিনজনের নাম যা হোক কিছু ধরা যেতে পারে, যেমন রাম শ্যাম যদু। আর ঐ ডাকবাংলোর ঘাসবিছানো মাঠে যে-তিন রমণী থমকে দাঁড়িয়ে ওদের কাণ্ড দেখছিল, তারা হ'তে পারে রাম শ্যাম যদুর বউ। কোন্‌জন রাম কোন্‌জন শ্যাম আর কেই বা যদু তা বোঝা কষ্টকর। উল্টে-পাল্টে সবাই যেন একরকম। রামকে অনায়াসে শ্যাম বা যদু বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

এই রাম শ্যাম যদুরা, পুজোর মুখোমুখি শহর ছেড়ে বেরিয়ে বিজন কোথাও আস্তানা নিয়ে ফুর্তিফার্তায় দিন কাটাতে এসে এক উটকো বিপত্তির ভিতর জড়িয়ে পড়ে।

গতকাল বিকেলে স্টেশান-সংলগ্ন হাটে গিয়েছিলো তিনজন। ছোট্ট স্টেশান, সারাদিনে চারটে গাড়ি দাঁড়ায় আর বেশ কয়েটা মেল ট্রেন তীব্র হুইস্‌ল দিয়ে দুরন্ত গতিতে বেরিয়ে যায়। গত পরশু তিন রমণী আর তিন পুরুষ ঐ ট্রেন থেকে নেমে আলস্য ছাড়িয়েছিলো লাল কাঁকর ঢালা প্ল্যাটফর্মে। কোলকাতার বাতাসে হাঁপ ধ'রে গিয়েছিলো, ক-টা দিন কাটবে বেশ—রাম শ্যাম যদুর যে-কোনো একজন চারদিক দেখে বলেছিলো। এরপর ডাকবাংলোয় পৌছানো, ক'দিনের জন্য সংসার পেতে বসা। পরের দিন ঘুরতে-ঘুরতে এই হাটে এসে পৌছানো। ছোট্ট হাট. মহুয়ার গন্ধে বাতাস ভারী। কোণের

বটতলায় যে মানুষটি বসেছিলো তার সর্বাঙ্গে ক্ষুধার আতঙ্ক। ঘোলাটে নিষ্প্রাণ চোখ ঢুকেছে কোন্ অতলে। ভাবলেশহীন মুখ। মাটিতে এক জোড়া পুষ্ট মোরগ-মুরগী পরস্পরের পায়ে দড়ি বেঁধে ফেলা আছে। এই ছোট্ট সাঁওতালি হাটে ওরা তিনজনই পোশাক- পরিচ্ছদে বাবু। তারিয়ে-তারিয়ে হাট দেখছিলো, আদিবাসী যুবতী, রমণী ইত্যাদি। বটের নীচে জোড়া মোরগ-মুরগি দেখে স্বাভাবিক প্রবণতায় ওরা সেখানে চ'লে যায়—বিক্রেতার চোখ-মুখ, যে-কোনো উপায়ে জীবদুটোকে বিক্রির কথা বলছে। সস্তায় পাওয়া যাবে, 'কত নিবি দুটো ?'

ঝকঝকে পোষাকের তিনবাবু। কোনো বিদেশ থেকে এসেছে। বড় মানুষ নিশ্চয়ই। দরাদরি করবে না। সুতরাং সে দামটা চড়িয়ে বসে, 'এঁজ্ঞে পাঁচ পাঁচ দশ ট্যাকা, মাংস হব্যা পাঁচ পুয়া পাঁচ পুয়া।' চমকে ওঠে রাম শ্যাম ইত্যাদিরা, এত সস্তা! চোখে চোখে কথা হয়ে যায় ওদের এবং তারপরই তিনপুরুষের সমস্বর হাসি মুরগি-বেচিয়েকে অপ্রতিভ ক'রে দেয়। এখন রাম শ্যাম যদু আর সেই দেহাতি মানুষটার দর কষাকষি চলে। হেঁচকা টানে ওরা দর নামিয়ে দেয় অর্ধেকের কমে, 'দেব চারটাকা, দিবি দুটো ?' আশ্বিনের দিন, মাঠে ফসল দাঁড়িয়ে। ঘর শূন্য, তবু এই দামেই-বা বিকোয় কীভাবে! সবার হাঁড়ি ঠং ঠং, পকেট হা-হা। মানুষটা দু'হাতে পণ্য দুটো তুলে ধ'রে বলে, 'অষ্ট আনা আরো দিয়ে দে বাবু।' সুতরাং তিনজন যথেষ্ট লাভবান। যে-কোনো একজনের বদান্যতায় মোরগ-মুরগি কেনা হয় সাড়ে চার-এ। একেবারে জলের দর।

এরপর ওরা ঘরে ফেরে, চুনার সেই মুরগি বিক্রেতা সাঁওতাল চলে সঙ্গে। কোমরে সদ্য হাতে। পাওয়া টাকায় কেনা চাল, হাতে সেই মুরগি-মোরগ। চুনার ও-দুটোকে পৌঁছে দেবে রাম শ্যাম যদুর আস্তানায়। আস্তানা অর্থে সেই ডাকবাংলো, যার চারিদিকটা এই রকম বলা যায়: পুবে টুকরো শস্যক্ষেত্র চটাই-উৎরাই, স্বল্প জঙ্গলে ঢাকা, কোথাও দু'একটা ভাঙাচোরা ঘরের চিহ্ন; পশ্চিমও অনেকটা এমন; দক্ষিণে কম্পাউণ্ড ছাড়িয়ে কয়েক-পা এগোলেই বালুকাময় শীর্ণ এক জঙ্গলোদ্ভূত খাল আর তা পার হয়ে ঘন কাঁটা বাঁশের ঝোপ অতঃপর শস্যক্ষেত্র—যা ছাড়িয়ে দূরে দেখা যায় টিলার সার, ক্রমে ঘন হয়ে-আসা শালবন ইত্যাদি; উত্তরে লালমাটির পথ সর্পিলাকার, চলে গেছে স্টেশনের দিকে—ঐ পথে রাম শ্যাম যদুরা ফিরছে, সঙ্গে চুনার

সাঁওতাল। এ-অঞ্চলে মানুষের বাস অল্প, যা আছে ঘন চুল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের মানুষ, আদিবাসী সাঁওতাল মুণ্ডা ইত্যাদি।

চুনার চ'লে যাবে ঐ টিলার দিকে, ডাহিজমির পিছনে ওর ঘর। মোরগ-মুরগি জুটো রেখে একপা এগিয়ে এসে দাঁড়ায়, 'হাঁ বাবু, কাল সাঁঝবিলায় আসবু, আর যদি লাগে মুরে বলতে পারিস।'

—'নেব, তবে হ্যাঁ, দাম বাড়াবি না বুঝলি।'

এরা তিনজনে যথেষ্ট হিসেবী এবং সঞ্চয়ী। কেউ ব্যাঙ্কের কেরাণী কেউ সরকারী অফিসের জুনিয়র আমলা এই রকম আর কী। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে সকলেই আপাত সুখী এমন মনে হয়।

আশ্বিনের অন্ধকারে চুনার কোথায় চলে যায়। চারদিক ডুবে যায় অদ্ভুত আঁধারে। উপরে রাতের আকাশ, ঐ আকাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সংখ্যাহীন নক্ষত্র ফোটে। দূরে জঙ্গলে বেজে উঠছে ধামসা, আশ্চর্য বাঁশি বাজিয়ে ঝুমঝুম নূপুরের সঙ্গে রাত ভাসিয়ে কারা যেন চলে যায়। অন্ধকার গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের নয়; এই অন্ধকার, গাঢ় ছাইরঙা শূন্যতা যেন বিভিন্ন বর্ণের সামান্যতম মিশ্রণে মাখামাখি। অন্ধকারে মায়া। কোলকাতায় বসে রাতকে এমন মোহময় মনে হয় না। এই সন্ধ্যায় আবেগে ভরপুর হয়ে ওঠে কোনো এক রমণী। সামনের টুকরো মাঠে এলায়িত শরীরে সে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। আকাশ নক্ষত্র কথা বলে, কথা বলে তার শৈশবের। সে-সব স্মরণে এলে বুকের ভিতরটা কেমন করে ওঠে। শৈশবের চাঞ্চল্য গভীরভাবে অনুভূত হয়। এলোমেলো হয়ে আকাশ নক্ষত্রের দিকে ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়। সে একা বসে আছে। একা থাকতে এখন বেশ লাগে। এমন অন্ধকারে কে আসে। শব্দহীন পায়ে গনগনে চোখ নিয়ে কে আসে যেন। মাথায় হাত পড়তেই চমকে উঠে শৈশব সরে যায়, 'কে?'

—'কী করছ, কতক্ষণ ধরে খুঁজছি।' পুরুষটির কণ্ঠস্বর অসংলগ্ন।

—'এমনি বসে আছি, বেশ লাগছে।' সে স'রে বসে।

বাতাস গন্ধ ছড়ায়। গন্ধ অসংলগ্নতায়। হাত নেমে আসছে মাথার উপর থেকে।

—'চার্মিং, তোমাকে এই রকম দেখায় না তো কোনোদিন।'

—'কী করছ, ভাল লাগছে না, সরো।' ঝিঁকিয়ে ওঠে রমণী।

হা-হা ক'রে হেসে ওঠে অন্যজন। সমস্ত নৈঃশব্দ ভেঙে চৌচির হয়ে যায়,

'আমার তো লাগছে।' রমণী সজাগ চোখ মেলে। পুরুষটি ততক্ষণে ঘন হয়ে এসেছে। সে উঠে পড়তে চায়, পুরুষটি আর সময় না দিয়ে শক্ত ক'রে ধরে ফেলেছে কব্জি। সে হাত ছাড়িয়ে ঝরে যেতে চায়, পুরুষটি ততক্ষণে হিসিয়ে উঠেছে, বাতাসে উষ্ণতা নামে, 'যাচ্ছ কোথায়, আমার যে—' কথার মধ্যেই আচমকা একটানে মাটিতে শুয়ে যায় ঘন যৌবনা রমণী। পুরুষটি হামলে পড়ে তার দেহে।

পিঁহি পিঁহি করুণ চিৎকারে অন্ধকার কাঁপে। ওপাশে কে মুরগিটাকে কাটা-ছেঁড়া করছে।

তিনপুরুষের দাঁত আছে। রাতে ক'জন মাংস চিবোয়। নরম হাড়, দাঁতে ভাঙতে-ভাঙতে কে একজন হঠাৎ বলে, 'অ্যাই ও ঘরের মোরগটাকে কিছু খেতে দেওয়া উচিত ভাত-টাত।' একমুখ মাংস গিলতে-গিলতে একজনের হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল বউটিকে ছুঁয়ে দেখবে, তার পাঁচটা আঙুল উরু খামচে ধরছিল রমণীর, সে হড়বড়িয়ে বলে, 'কেন এই মাংস দু'এক টুকরো দিয়ে আয়-না, দেখ-না কেমন তারিয়ে-তারিয়ে খাবে, হা-হা।' পাঁচটা আঙুল রমণী দেহে ফণা তুলে পিচ্ছিল সাপের মতো কী যেন খুঁজে বেড়ায়।

মাংস আর মহুয়ার মদে আকণ্ঠ ডুবে থেকে তিনপুরুষের কারোরই বুঝি তর সয় না। আঁচলে টান পড়ে। উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তিনপুরুষে। রমণীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। এক একজন খামচে ধরেছে নরম শরীর। তাই রমণীরা মধ্যরাতের আকাশ দেখতে পায় না, পৃথিবীর কিনারায় চাঁদ ঝুলে মাটির গায়ে যে-জ্যোৎস্না জড়িয়েছে তা দেখতে পায় না। তিন রমণীর কারোই বুঝি শৈশবে ফেরা হয় না। পৃথিবীর আমছা অন্ধকার বেয়ে হাঁটা হয় না। তাদের আর কিছুই করার থাকে না; বদ্ধ ঘর, মোলায়েম বিছানায় চারপাশটা শহর হয়ে ওঠে।

তারপর রাত্রির এক এক প্রহরে রাম শ্যাম যদুর নেশা কাটতে থাকে। জানালা' দিয়ে দেখা যাচ্ছে মায়াময় পৃথিবী, দূরে ইউক্যালিপটাস-শীর্ষে ঝুলেছে চাঁদ। হঠাৎ কোন্ এক পাখি ডেকে যায়। বুকের ভিতরে ঝড় আসছে যেন। পৃথিবীটা এই রকমও হয় নাকি! বিছানায় ধ্বস্ত মানবীরা এলায়িত। মুখ ঢেকে দিয়েছে বালিশে। এখন নেশা কাটার পর কেমন কষ্ট হয়, উদ্দামতা খসতে খসতে ক্লান্তিতে এসে ঠেকে, বিষণ্ণতা গ্রাস করছে তিনপুরুষকে। সব কিছু আর একাকার হয়ে যাচ্ছে না। বিবস্ত্রা রমণীদের দেখে এক-একজন

চাপা চিৎকারে স'রে যায়। মাথা নুয়ে পড়েছে অদ্ভুত এক বেদনায়। দূরে ইউক্যালিপটাসের মাথা থেকে চাঁদ নেমে যায় মাটির দিকে।

সে-রাত পার হয়ে সকাল হয়। রাম শ্যাম যদুর যে-কোন একজন মোরগটাকে কাটার কথা বলেছিল, অন্যজনের আপত্তিতে তা হয়নি। কেননা চুনার আজ আসে কিনা ঠিক নেই। মাংস ছাড়া রাত কাটে না ভাল। অতঃপর এই দুপুর। সারাটা দুপুর অঘোর ঘুম ঘুমিয়ে শেষদুপুরে মোরগটার গাঁক-গাঁক চিৎকারে বিরক্ত হয়ে ওরা বেরিয়ে এসে দেখে ওদের তিনটে বউ বাইরের ঘাসে পা মেলেছে। সে তো এই আশ্বিনের দুপুর, আকাশে যখন তখন আলটপকা মেঘ এসে ঝমঝম ক'রে মাটি ভিজিয়ে চ'লে যায়। তারপর ঘন নীল আকাশ, নরম মেঘ। বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগে। কেননা আকাশ আর পৃথিবী এখন রৌদ্রময়। নীলাভ আকাশে বকের পালক ভাসছে।

বন্দীরা ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে নরম মাটিতে হাঁটছিল। দূরের শালবন ফুঁড়ে টিলার দিকে চেয়ে কথা বলছিল। দূর পথের আদিবাসী পুরুষ-নারীরা তাদের কেমন যেন আবেশপ্রবণ ক'রে তুলছিল ক্রমশ।

আদিম পৃথিবীর যুথবদ্ধ মানুষ ছিল অনেকটা এই রকম। মানবজাতির বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক গঠনের পরিপূর্ণতা আসছিল। ক্রমে মানুষ শিখল পাথরের ব্যবহার, আগুনের ব্যবহার, অস্ত্রের ব্যবহার। ধাতব অস্ত্র-নির্মাণের পর মানুষ হ'ল চলমান। দ্রিমি দ্রিমি মাদল বাজিয়ে শিঙা ফুঁকে দেয় কোনো মানুষ, আকাশের গায়ে ঝলসে ওঠে অস্ত্র যার ভ[illegible] অরণ্যপালিত পশু তৃণক্ষেত্র অরণ্যঅঞ্চলে পালায়...

—'ওকী, ওটা যে পালায়!'

আশ্বিনের এই অস্থিরমতি অপরাহ্নে শরীর ভাসিয়ে যে-তিনটি মানুষ মাঠময় তাড়া ক'রে নিয়ে চলেছে ঐ রক্তঝুঁটি মোরগটাকে, সে-তিনজনের নাম যা হোক কিছু ধরা যেতে পারে, যেমন রাম শ্যাম যদু। আর নিশ্চুপ থমকে দাঁড়িয়ে যে-তিনরমণী মোরগটার দিকে চেয়ে, তারা হ'তে পারে রাম শ্যাম যদুর বউ। ওরা তিনজন মোরগটার পিছনে দৌড়চ্ছে।

হ্যাঁ, মোরগটা পালাচ্ছে। তিনমানুষ ছুটছে। পায়ের দড়িটা কাটা ছিল খেয়াল হয়নি। এখন মোরগটা বাগানে। তিনজন তিনদিক থেকে

খেরে। হৃষ্টপুষ্ট মোরগটা লাফাচ্ছে। তিনটে মানুষ প্রায় ঘিরেছে ওকে, আর একটু হ'লেই · মোরগটা চিৎকার করতে-করতে এক ফাঁক দিয়ে তীর বেগে ছুটে যায় খোলা গেটের দিকে অতঃপর চৌহদ্দির বাইরে।—'এই তুই ওদিকে যা, তুই বাঁয়ে, পালায় না যেন।'

জীবটা হঠাৎ লাল রাস্তা বেয়ে ছুটতে-ছুটতে ঘুরে ডানদিকের মাঠে নেমে আল বেয়ে এক পাক খেয়ে এখন দক্ষিণমুখী। কক্কর-কঁ চিৎকার করতে-করতে হঠাৎ ডানা ঝাপটিয়ে রৌদ্রে সাদা দেহটা ভাসাতে গিয়ে ভাসায় কয়েক ফুট তারপর দু'ধারে টুকরো-টাকরা ফণীমনসার ঝোপ রেখে লাফাতে-লাফাতে শীর্ণ বালুকাচ্ছন্ন খাল পার হয়ে যায়। পিছনে রাম শ্যাম যদু। এরপর শূন্য পতিত জমি ঝোপঝাড় হাল্কা। মোরগটা দাঁড়ায় না, তীরবেগে সামান্য ঘন বাঁশবনে ঢুকে পড়ে, ফলত রাম শ্যামেরা হতভম্ব। হঠাৎ সব নিথর। বেয়াড়া বাতাসে গাছগাছালি নড়ে-চড়ে, অতি সূক্ষ্ম শব্দেরা শূন্যে ভাসে। তিনমানুষে নিশ্চুপ এগোয়। ঝোপঝাড় বাঁশবনে ঢুকে পড়ে। এই মাটিকে রোদ পড়ে না, বর্ষা অতিক্রান্ত সময়, মাটি কঠিন নয়। চারপাশে পচা লতাগুল্মের গন্ধ স্পষ্ট।

—'উফ্, বিকেলটা মাটি করল শালাহ্।' কে একজন ক্রোধে নরম মাটি থেতলে দেয়।

অতঃপর সেই স্তব্ধতা। নিঃশব্দে তিনমানুষে এগিয়ে যাচ্ছে। ছোট জঙ্গল কাঁটা বাঁশের ঝাড় ক্রমশ ঘন। পায়ের নীচে থেতলে যাচ্ছে লতাগুল্ম, মোরগটা কোথায়! বাঁশবনে বাতাস চলার শব্দ ফ্যাসফ্যাসে—ছ'টা চোখ এদিক ওদিক দ্রুত ঘুরতে থাকে। গেল কোথায়! এমনি ক'রে অতি সন্তর্পণে একটা দুটো কাঁটা কঞ্চি মাড়িয়ে এড়িয়ে তিনজনে আস্তে-আস্তে পা ফেলে। ধনুকের মতো দেহ বাঁকিয়ে তিনজন আস্তে-আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। আপাত বক্র তিনজনের সন্ধানী চোখ কোন গভীরে ঢুকে যাচ্ছে! এইভাবে সামান্যক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখ স্থির হয়ে সে-মুহূর্তে। দপ ক'রে জ্বলে উঠছে ছ'টা চোখ। সে-চোখের পলক পড়ে না। এক এক পা এগিয়ে যাচ্ছে তিনজন যেন-বা নখের ঘায়ে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে মাটির পৃথিবী। লাল ঝুটি উজ্জ্বল সাদা মোরগটা কাঁপছে, তুলতুলে পেট উঠছে নামছে। এখন তিনমানুষ স্থির, অসীম প্রত্যাশায় ওরা চেয়ে আছে মোরগটার দিকে—মোরগটা কেমন নিশ্চিন্ত! দু'জন নীচু হয়ে একটু ঘুরে দুই দিকে চ'লে যায়, একজন পিছনে। তারা নিঃশব্দে সরে

যায়, কথা হয়ে যায় চোখে চোখে। মোরগটার পিছনে শিকারীর হাত ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে আর তখনই লাফ দিয়ে সরে দাঁড়ানোয়, নৈঃশব্দ্য ভেঙে যায়। কক্কর-কঁ চিৎকারে মোরগটা ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে পথ ক'রে নেয়—দীর্ঘ হলুদ কালো সাপটা শ্লথ গতিতে পাশের ঝোপে ঢুকে যাচ্ছে। একজন থিরথিরিয়ে কাঁপছে।

—'জলের সাপ ভয়ের কী আছে, খালের দিকে যাচ্ছে।'

পরক্ষণেই মোরগটার কথা মনে পড়ায় তিনজন ছুটছে। মোরগটা পালাচ্ছে। বাঁশবন পার হয়ে ধানবনে নেমে আল বেয়ে ছুটছে। এখন সে যায় শাল-মহুয়ার বনের দিকে সঠিক দক্ষিণে। তিনজনে এ-মুহূর্তে স্থির-প্রতিজ্ঞ। হা-হা ক'রে উজ্জল সাদা দেহের উপর আকাশ রেখে ছুটছে মোরগটা। কখনো-বা ডানা ঝাপটিয়ে কয়েক ফুট শূন্যে ভেসে আবার পা নামিয়েছে মাটিতে। ধানক্ষেতের আলপথ যখন-তখন ঘুরেছে এদিক-সেদিক। মোরগটার ক্ষণে-ক্ষণে এই দিক পরিবর্তনে মানুষ ক-জনা দিশাহারা। ক্রমশ ক্রুদ্ধ। 'সাপটা শেষমুহূর্তে অদ্ভুত শয়তানি ক'রে বাঁচিয়ে দিল মোরগটাকে।' একজন দাঁতে দাঁত চিপে বলে। অন্য দু'জন মন্তব্য করে না।

সরু আল মোটা আল মোরগের পলায়নে তেমন প্রতিবন্ধক নয় অথচ তিনমানুষের গতিবেগ কখনো কমায় কখনো বাড়ায়। তিনটে মানুষ সমান্তরালে দৌড়তে পারে না, এখন রাম শ্যাম যদু, একটু থেমে, তখন শ্যাম যদু রাম এইভাবে পরস্পরের পিছনে দৌড়য়। এই দ্রুতগতির মধ্যে ভাবনা চলে কীভাবে মোরগটাকে আলপথ থেকে ঘন শস্যক্ষেত্রে ফেলে দেওয়া যায়—একবার ভুল ক'রে পড়লেই হ'ল।

অথচ এই মোরগটা পথ হারায় না। সরল রেখায় দৌড়য়। আলের বাঁকের সঙ্গে নিপুণভাবে দেহটাকে ভাসিয়ে বেঁকে যায়। ছোট্ট দেহটা কখনো-বা দীর্ঘ ধানের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। একটু বাঁক ঘুরে তিনজন আবার মোরগটাকে দেখতে পায়। সামনে দু'পাশে তিনদিকে দেখা যায় হরিদ্রাভ শস্যক্ষেত্র। ওদের সামনেটা অর্থাৎ দক্ষিণে শালবনের আরম্ভ, আর একটু এগিয়েই। এতক্ষণে পশ্চিমে সূর্য নেমেছে অনেক। রৌদ্রে নেমেছে বিষণ্ণতা। যদিও সময়টা আশ্বিন, দূরলোকালয়ে উৎসবের বন্যা ঘন, তথাপি এ-তল্লাটে তার চিহ্ন নেই। বেলাশেষে পৃথিবীটা থমকে থাকে। মানুষের চিহ্ন নেই এখানে কোথাও। শুধুমাত্র একটি প্রাণী প্রাণের দায়ে ছুটছে, ছুটছে আর

তিনটে মানুষ, ছ'টা হাত পা চোখ নিয়ে হা-হা ক'রে দৌড়ে আসছে, ভীত চিৎকারে মোরগটা আকাশশূন্যতা ভাঙছে। ওরা চলে অনেকটা। লোকালয় প'ড়ে আছে সেই কোথায়! তিরতিরিয়ে আসছে বুক বেয়ে নাভির দিকে। শিকার শিকারীর দূরত্ব ক্রমশ রৌদ্র মেখে উজ্জ্বল সাদা রক্তঝুটি মোরগটা লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটছে।

এই রকম বেশ কিছুক্ষণ ছোটার পর ওরা এখন সেই কাছাকাছি। এই অরণ্য যেন-বা স্তূপ অন্ধকার। দূরে ওই কোণে ছোট-ছোট টিলা যার গায়ে দু'চারটে ঝুপড়ি চিত্রবৎ ভাস- এখন জঙ্গলে ঢুকে যাবার মুখে।

—'জঙ্গলে গিয়ে পেলম, মোরাগটা বেঁচে যাবে।' এখন এই কথা

—'এতটা যখন এসেছি শেষ না দেখে যাব না।'

—'যাঃ—!' মোরগটা ঢুকে পড়েছে জঙ্গলে। তিনজন পরস্পরকে ডানা-ঝাপটিয়ে মোরগটা ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। তিনটে মানুষ একে অপরের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। ছ'টা চোখ পরস্পর করতে থাকে। সূর্যটা দমকে-দমকে নেমে আসছে নিচের দিকে। ...রপা... নির্বিকার রক্তাল্পতা। ধানের গোড়ায় জমা কালছায়া গাঢ়। তি...মানুষের ছায়া শস্যক্ষেত্রের বঙ্কিম স্রোতে দীর্ঘ। পৃথিবীটা দুমড়ে-মুচড়ে নিঃসঙ্গতা চারপাশকে ক'রে তুলছে ভীতিপ্রদ। এখন চারদিকে এই প্রাণ ব্যতীত জীবন কোথায়! ওরা পরস্পরকে অদ্ভুত চোখে দেখে।

—'জঙ্গলে ঢুকবি না ফিরে যাবি?' এখন এই প্রশ্ন হয়।

—'শেষবারের মতো দেখতে চাই, ঢুকে পড়।

সুতরাং আলোময় পৃথিবী ছেড়ে তিনটে মানুষ ভয়াল চোখ-মুখ ঢুকে পড়েছে জঙ্গলে। ক্ষেত-খামার লোকালয় রয়ে যাচ্ছে দূরের জঙ্গলের পাতায়-পাতায় জড়িয়ে যাচ্ছে অন্ধকার। এখন জঙ্গলে খোঁজা, জঙ্গলের ভিতরে পলায়ন। কোথায় কোন গহীনে গাছগাছালি আড়ালে আলো মরে-যাওয়া অন্ধকারে সেই প্রাণীটা প্রাণের ভয়ে থিরথির ...কাঁপছে। তিনশিকারী ঘুরছে এদিক-সেদিক। ঝোপঝাড়ে ... ... দপ্‌দপিয়ে মাথার শিরা কাঁপছে, ঘাম জড়িয়ে ... ...হে। হাত-পা হয়ে উঠছে শক্ত পাথর। চারপাশে নৈঃশব্দ্য ... যদিও সেই ... পাখ-পাখালির চিৎকার জঙ্গলে জড়িয়ে যাচ্ছিল, সর্বত্র,